Boighar.com

রোকন

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

বখতিয়ারের তিন ইয়ার

শফীউদ্দীন সরদার

বইঘর

বখতিয়ারের তিন ইয়ার

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১`/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৮১৭০৮৭৬৩৪

বখতিয়ারের তিন ইয়ার
শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

দ্বিতীয় মুদ্রণ
নভেম্বর ২০১৩

প্রথম প্রকাশ www.boighar.com
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২

প্রচ্ছদ
নাজমুল হায়দার

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৮০ টাকা মাত্র

ISBN 984-70168-0035-1
www.boighar.com

BAKHTIAR ER TIN YAR : By Shafi Uddin Sarder
Published by : S M Aminul Islam, **BhoiGhor :** 43 Islami Tower
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 **First Edition :** February 2012 © by the publisher

Price : 180 Taka only

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ভূমিকা

বাংলাদেশের সুলতানী আমল মুসলমান শাসনের এক অবিস্মরণীয় ও ঐতিহ্যময় ইতিহাস। ইংরেজ ও তাদের সহযোগীদের কারসাজিতে এই ঐতিহ্যময় ইতিহাস দীর্ঘদিন মানুষকে জানতে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ এ ইতিহাস জনসমক্ষে আসেনি। www.boighar.com

বাংলা মুলুকে সুলতানী আমল প্রতিষ্ঠা করেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি। তিনিই বাংলার প্রথম সুলতান। তাঁর ছিলেন তিন বন্ধু বা তিন ইয়ার, যাঁরা আগাগোড়া বখতিয়ার খলজির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বখতিয়ার খলজির সালতানাত্ প্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ সুলতান হওয়ার পেছনে কমবেশি তাঁর এই তিন ইয়ারেরই অবদান ছিল। বখতিয়ার খলজির পরে তাঁর এই তিন ইয়ারই পর পর সুলতান হন। এরা হলেন মোহাম্মদ শিরান খলজি, আলী মর্দান খলজি ও হুসামউদ্দীন ইওজ খলজি।

ROKON

দীর্ঘদিন জনসমক্ষে না আসা সুলতানী আমলের মতো এই তিন জনের আমলও জনসমক্ষে আসেনি। তাই **'বখতিয়ারের তিন ইয়ার'** উপন্যাসটির মাধ্যমে এদের তিন জনের আমলও জনসমক্ষে আনার প্রয়াস পেয়েছি। উপন্যাসটি সম্মানিত পাঠকমণ্ডলীর ভাল লাগলে তবেই আমার এই প্রয়াস সার্থক হবে।

শফীউদ্দীন সরদার

২১/০১/২০১২

আমাদের কথা

শফীউদ্দীন সরদারের অগণিত পাঠকের মতো আমিও অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় ছিলাম তাঁর আর কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাস আসে কি না। অবশেষে এলো এবং বাংলার মুসলমানদের অহংকার বঙ্গবিজয়ী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজিকে সঙ্গে নিয়েই এলো। বঙ্গবিজয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে *বখতিয়ারের তলোয়ার* অনেক আগেই আমরা পড়েছি। কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা কেবল বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়ের ঘটনা সম্পর্কেই অবহিত হয়েছি; তাঁর এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ তিন বন্ধুর মাধ্যমে বাংলায় কিভাবে সুলতানী আমলের গোড়াপত্তন হয়েছিল সে সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়নি। অথচ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের মুসলিমবিদ্বেষী শাসনের ফলে বাংলার সুলতানী আমলের সত্যিকার ইতিহাস দীর্ঘদিন চাপা পড়ে থাকে বিকৃত-ইতিহাসের কংক্রিট আবরণে। www.boighar.com

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুই পরবর্তীতে বাংলা শাসন করেছেন। সে শাসনামলের ঘটনা প্রবাহকে লেখক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তুলে এনেছেন বক্ষ্যমাণ *বখতিয়ারের তিন ইয়ার* উপন্যাসে। এ উপন্যাস পড়ে পাঠকগণ বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরের ইতিহাস সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাবেন। পাশাপাশি উপন্যাসে গল্পের মাধ্যমে মানবিক প্রেম-বিরহ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, লড়াই-সংগ্রাম, ত্যাগ-কুরবানী, সাহসিকতা, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার বিশাল সবক তো থাকছেই। এক কথায়, উপন্যাসের রস আস্বাদনের পাশাপাশি নিজের অজ্ঞাতেই পাঠক বাংলার সুলতানী আমলের ইতিহাসের বারিতে স্নাত হয়ে ওঠবেন।

বখতিয়ারের তিন ইয়ার

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN & EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

শেকড়সন্ধানী ঔপন্যাসিক শফীউদ্দীন সরদার যে কেবল একজন বড় মাপের লেখক তাই নয়; বরং তিনি একজন বড় মনের মানুষও। তিনি আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক আবদারও সয়ে যান নীরবে। নইলে এ বয়সে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার মতো কষ্ট সইবেন কেনো? বার্ধক্যজনিত দুর্বলতাকে দূরে ঠেলে তিনি এখনও কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালার কাছে আমাদের প্রার্থনা– জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এভাবেই যেন তিনি জাতির খেদমতে কলম চালিয়ে যেতে পারেন।

রাজনন্দিনী'র পর এবার ঐতিহাসিক উপন্যাস *বখতিয়ারের তিন ইয়ার* প্রকাশের সুযোগ পেলো বইঘর। আমরা আমাদের সীমিত সামর্থ নিয়ে নির্ভুল এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর করে পাঠকের হাতে এটি তুলে দেয়ার চেষ্টা করেছি। তারপরও কারো চোখে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ রইলো। আমাদের প্রকাশনার ব্যাপারে যে কারও গঠনমূলক পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের মঙ্গল করুন।

তারিখ
২২ জানুয়ারি ২০১২ ঈ.

সমর ইসলাম
পরিচালক (সার্বিক)
বইঘর

www.boighar.com

১

জনৈক নওজোয়ান বাগড়া দেয়ায় বাড়িয়ে দেয়া হাত গুটিয়ে নিলো আজরাইল। টাংগা চেপে না পড়ে রাস্তা পেচে পড়লো গোড়াকাটা তালগাছ। সাক্ষাৎ মওত থেকে মুক্তি পেলো তিন তিনজন ইনসান।

সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ!! www.boighar.com

রাস্তা বেয়ে আসছিলো এই অশ্বারোহী নওজোয়ান। আসতে আসতে সে লক্ষ্য করলো, বিশাল এক তালগাছের গোড়া কাটা হচ্ছে আর শেষ হয়েছে গোড়া কাটা। পতনোন্মুখ তালগাছটি ঝুঁকে পড়েছে রাস্তা-লম্বা। চমকে উঠে নওজোয়ান রাস্তা থেকে নেমে রাস্তার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে অশ্ব চালাতে লাগলো। এরপরই সে লক্ষ্য করলো তালগাছটি পড়ে যাচ্ছে রাস্তা বরাবর। একই সঙ্গে সে আঁতকে উঠে লক্ষ্য করলো, দ্রুত ছুটে এলো একটা টাংগা, আর টাংগাটা চলে এলো পতনোন্মুখ তালগাছটার একদম পেটের তলে।

'ওয়া আল্লাহ!' বলে ক্ষীণ একটা আওয়াজ দিলো নওজোয়ান। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে লাগাম টানলো অশ্বের। পোষমানা অশ্বটি তার লাগামের টান পেয়েই লাফিয়ে উঠলো রাস্তার উপর আর চলে এলো টাংগার কাছে। নওজোয়ানটি সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে টাংগার অশ্বের লাগাম ধরে অন্য হাতে জোর টান দিলো নিজের অশ্বের লাগামে। মড় মড় করে উঠলো তালগাছের কাটা গোড়া। পুনরায় টান পেয়ে নওজোয়ানটির অশ্ব এক লাফে নেমে এলো রাস্তা থেকে। অশ্বের সেই টানে টাংগার অশ্ব আর টাংগা চলে এলো রাস্তার কিনারে। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের ভূমি প্রকম্পিত করে বিকট শব্দে রাস্তা বরাবর ধপাটপাট পড়ে গেল তালগাছটা। এক সেকেন্ড সময়ের ব্যবধানে তালগাছটা টাংগার উপর না পড়ে টাংগার একদম কোল ঘেঁষে পড়লো। পড়ার সময় তালগাছের বাতাসে উড়ে উঠলো টাংগার আরোহীদের পোশাক পরিচ্ছদ এবং নিশ্চিত মওত থেকে বেঁচে গেল ভাগ্যবান আরোহীরা।

তালগাছ কাটতে আসা লোকজনসহ রাস্তার ও রাস্তার চারপাশের লোকজন দম বন্ধ করে এদিকে তাকিয়ে ছিল। টাংগার আরোহীরা বেঁচে গেল দেখে তারা বুক খালি করে দম ছেড়ে 'আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!' আওয়াজ দিয়ে উঠলো। সেই সাথে সকলে সমস্বরে শুরু করলো অশ্বারোহী নওজোয়ানটির মহানুভবতা আর তার সাহসের তারিফ। সবাই ছুটে এলো নওজোয়ানটির কাছে। তা দেখে অশ্বারোহী নওজোয়ানটিও নেমে এলো অশ্ব থেকে।

www.boighar.com

টাংগার আরোহীরা প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। তাল গাছটি যখন তাদের টাংগার একদম কোলঘেঁষে পড়লো, তখন তারা বুঝতে পারলেন, তাদের জান কবজ করতে এসে এইমাত্র ফিরে গেলেন আজরাইল। সঙ্গে সঙ্গে তারা এটাও উপলব্ধি করলেন যে, বাঁচা মরার মালিক যদিও আল্লাহ, তাদের এই বেঁচে যাওয়ার উপলক্ষ ঐ অশ্বারোহী নওজোয়ানটি। রাস্তায় উঠে সে তাদের অশ্বের লাগাম ধরে জোরে টান দিয়েছিল বলেই তাদের অশ্ব আর টাংগা সরে এসেছিল তাল গাছটির তলে পড়া থেকে।

এটা উপলব্ধি করেই তারা দ্রুত নেমে এলেন টাংগা থেকে এবং ঘিরে ধরলেন নওজোয়ানটিকে। টাংগার আরোহী তিন জন। একজন সহিস আর বাকী দু'জনের একজন বছর সত্তর বয়সের এক রাজপুরুষ আর অপরজন ঐ বংশের অষ্টাদশী মেয়ে। অপরূপা সুন্দরী এক যুবতী। ঐ বয়স্ক প্রৌঢ়টি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন নওজোয়ানটিকে এবং তার গা-মাথা নেড়ে তাকে দোয়া আশীর্বাদ করতে লাগলেন। নওজোয়ানটি ছিল বছর চব্বিশেক বয়সের এক দর্শনধারী অশ্বারোহী।

দোয়া আশীর্বাদ ও প্রশংসা অন্তে অন্যান্য লোকেরা আস্তে আস্তে সবাই চলে গেলেন নিজ নিজ পথে ও কাজে। ভীড় কমে গেলে প্রৌঢ় রাজপুরুষটি নওজোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনার নাম কি জনাব? আপনার এ ঋণ শোধ করার সাধ্য আমাদের নেই। তবু নাম পরিচয় জানা থাকলে হয়তো আপনার কোন কাজেও লাগতে পারি আমরা।

নওজোয়ানটি বিনয়ের সঙ্গে বললো– আপনি একজন সম্ভ্রান্ত প্রবীণ ব্যক্তি। আমি একজন প্রায় ছেলে মানুষ। আপনার নাতীর বয়সী। 'আপনি আপনি' করে আমাকে শরমিন্দা করবেন না জনাব। দয়া করে আপনি আমাকে 'তুমি' করে বলুন।

 বইঘর ও রোকন

এ কথায় প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি খুবই খুশি হলেন। বললেন– সাব্বাশ! তা, ভাই সাহেবের নামটা? মানে আমার এই নাতীর নামটা?

নওজোয়ানটি বললো– আমার নাম সেলিম মালিক, সেলিম মালিক খলজি। সংক্ষেপে সেলিম খলজি।

মারহাবা, মারহাবা! তুমিও খলজি?

জি দাদু সাহেব। আমি আফগানিস্তান মুলুকের লোক।

তোমার পরিচয় মানে বর্তমান স্থান-ঠিকানা?

ঠিকানা বলতে আমি এখন এক রাহাগীর। নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা এখন নেই। পরিচয় বলতে আমি একজন সেপাই।

মাশাআল্লাহ! তুমি সেপাই? তা এক্ষণে যাচ্ছো কোথায়?

যাচ্ছি সুলতান হুশামউদ্দীন, তওবা গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি বাহাদুরের দরবারে। তাঁর সেনাবাহিনীতে কাজ করার জন্যে তিনি আমাকে আহ্বান করেছেন।

www.boighar.com

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন প্রৌঢ়টি। বললেন– কেয়া খোশ্ কেয়া খোশ্! আমরাও তো সুলতান ইওজ খলজি বাহাদুরের দরবারের লোক।

অতঃপর তরুণীটির দিকে ইংগিত করে বললেন– এই যে এটি আমার নাতনী। এর আব্বা সুলতান বাহাদুরের অন্যতম বিশ্বস্ত অমাত্য। মানে উজির।

এবার সেলিম মালিক তথা সেলিম খলজিও পুলকিত হয়ে উঠে বললো– সুবহান আল্লাহ! আপনারাও সুলতান বাহাদুরের দরবারের লোক! তা জনাবের নাম?

প্রৌঢ়টি বললেন– আমার নাম ইয়ারউদ্দীন খলজি। আমার এই নাতনীর আব্বার নাম শাহাবুদ্দীন খলজি।

আর আপনার এই নাতনী?

আমার ছেলে শাহাবুদ্দীনের মেয়ে এটা। এর নাম সেলিনা বানু বেগম।

বহুত খুব, বহুত খুব!

আচ্ছা আচ্ছা, এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর নয় ভায়া। এবার এসো আমাদের সাথে।

জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে সেলিম মালিক বললো– কোথায়?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– শাহী-মহলে? আর আপাতত আমাদের বাসায়।

আপনাদের বাসায়?

হ্যাঁ, আমাদের বাসায়। রাহাগীর মানুষ তুমি। রাস্তার উপরই আছো। দু'চার দিন আমাদের বাসায় থেকে বিশ্রাম নাও। তারপর সুলতান বাহাদুরের সাথে সাক্ষাৎ করে সেনাবাহিনীর কাজে যোগ দেবে।

তার পরে?

জি। আমার ছেলে শাহাবুদ্দীনই সব ব্যবস্থা করে দেবে। সেনা বাহিনীর দেখভালের ভারটা তো তার উপরই।

এ্যাঁ! তাই নাকি?

বিলকুল। কাজে যোগ দেয়ার পরে তুমি আমাদের বাসায় থাকবে না সেনা ছাউনিতে থাকবে, সেটা তুমি স্থির করবে।

জনাব!

জনাব নয়, দাদু। তুমি আমাদের যে উপকার করেছো, তা শুনলে আমার ছেলে আমাদের বাসা ছাড়া তোমাকে সেনা ছাউনিতে থাকতে দেবে– আমার মনে হয় না।

দাদু!

আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। এবার চলো, রওনা হই!

অতঃপর টাংগা আর অশ্বারোহী পাশাপাশি চলতে লাগলো।

সেলিম মালিক তথা সেলিম খলজি ও নাতনী সেলিনা বানু বেগমকে নিয়ে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব যথা সময়ে রাজধানী লাখ্নৌতির বাসায় এসে পৌঁছলেন। লাখ্নৌতির পরিবর্তে বখতিয়ার খলজির অসুস্থ ও মৃত্যু-স্থান দেবকোট দিনে দিনে রাজধানীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হুশামউদ্দীন ওরফে গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি সুলতান হওয়ার পরে রাজধানী আবার লাখ্নৌতিতে স্থানান্তর করেন। শুধু স্থানান্তর করাই নয়, লাখ্নৌতির শাহীমহল সুরম্য অট্টালিকায় সুশোভিত করেন এবং শাহীমহলের চারপাশে অমাত্যদের জন্যে কয়েকটি মনোরম বাসস্থান বা বাসা নির্মাণ করেন। সুলতানের অত্যন্ত বিশ্বস্ত অমাত্য শাহাবুদ্দীন খলজির বাসাও ঐ মনোরম বাসা

কয়টির একটি। শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব পিতা ইয়ারউদ্দীন খলজি ও কন্যা নিয়ে এই বাসায় বাস করেন।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবের সাথে এসে বাসা দেখে সেলিম মালিক মুগ্ধ হয়ে গেল। বহু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট বাগবাগিচা ও পুকুর পুষ্করিণী সম্বলিত মনোরম বাসা। বাসায় প্রবেশ করে সেলিম মালিক ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবকে মুগ্ধকণ্ঠে বললেন– বা-বা-বা! বড়ই মনোমুগ্ধকর বাসা তো আপনাদের দাদু! দেবকোটে এমন বাসা একটিও দেখিনি। আপনাদের এ বাসা অতুলনীয় মনোরম ও অসাধারণ।

কিঞ্চিৎ মলিন হাসি হেসে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– জনসাধারণের পয়সায় গড়া ভায়া, অসাধারণ তো হবেই। নিজের কামাই করা পয়সা দিয়ে এমনটি কে কয়টি গড়তে পারে?

দাদু!

জনসাধারণের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা জোর জবরদস্তি করে কর বা খাজনা হিসাবে আদায় করে নিলেই সেটা সরকারী পয়সা হয়ে যায়। 'কোম্পানি কা মাল দরিয়া মে ঢাল!' সরকারের লোকেরা ঐ সরকারী পয়সা বাপের সম্পত্তি মনে করে যদেচ্ছা যেখানে সেখানে ঢালে। তাতে করে ভাল কাজের চেয়ে মন্দটাই হয় বেশি।

তা ঠিক, তা ঠিক।

তবে আমাদের এই সুলতান ইওজ খলজি বাহাদুর সরকারী এ পয়সা যেখানে সেখানে ঢালেননি বা তাঁর সরকারের লোকেরা এ পয়সা অপচয় বা তসরুফ করার সাহস করেননি।

তাই কি?

হ্যাঁ, তাই। এর ফলে এই সরকারের আমলে যা কিছু হয়েছে, সবই জনকল্যাণমূলক ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধিমূলক কাজ। এই মনোরম বাসা কয়টিও তার নিদর্শন। অমাত্যদের এই মনোরম পরিবেশে রাখার উদ্দেশ্যই হলো, তারা সুলতানের প্রতি প্রীত থাকবে বিশ্বস্ত থাকবে আর সরকারী পয়সা তসরুফ বা অপচয় করা থেকে নিশ্চেষ্ট থাকবে।

দাদু!

এই সুলতান বাহাদুরের ব্যাপারটা অন্য রকম। তাঁর ধ্যান-ধারণা হলো–

নিম্ন পর্যায়ের সরকারী লোকেরা নিয়তই সরকারী পয়সা তসরুফ করে। সরকারের অতি উচ্চ পর্যায়ের অর্থাৎ বড় বড় কয়েকজন উজির পর্যায়ের লোকের বর্তমান ও পরবর্তী জীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ নিশ্চিত করা গেলে, দু'একজন খন্নাস প্রকৃতির লোক ছাড়া, তারা সাধারণত সরকারী পয়সা তসরুফ করবে না। উজিরেরা তসরুফ করলে একশ'জন নিম্ন পর্যায়ের লোক সর্বমোট যে পয়সা তসরুফ করে, একজন উজির একাই তসরুফ করবে ঐ সর্বমোট পয়সার দশগুণ পয়সা। অথচ এই ক'জন উজির তসরুফ করা থেকে বিরত থাকলে নিম্ন পর্যায়ের লোকদের তসরুফ করার প্রবণতার মুখে আপছে আপ লাগাম পড়বে।

কি বলছেন দাদু! বড় তাজ্জব ব্যাপার তো!

নতুন এসেছো, তাই কিছু বুঝতে পারছো না। পরে সব কিছু দেখলেই বুঝতে পারবে– এই ঈমানদার সুলতান জনগণের পয়সা সম্পূর্ণটাই শুধু জনকল্যাণের অসংখ্য কাজে ব্যয় করেছেন আর করছেন।

এবার মুখ খুললো সেলিনা বানু বেগম। সে উষ্মার সঙ্গে বললো– আহ্ দাদু! এত ক্লান্ত হয়ে আসার পর এই মেহমান কি শুধু আপনার বক্তৃতাই শুনবেন? তাঁর কি নাওয়া খাওয়া আর আরাম আয়েশের কোন প্রয়োজন নেই?

হুঁশে এসে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– এ্যাঁ! কি বললে?

সেলিনা বানু বললো– আরাম-আয়েশের প্রয়োজন তো আমাদেরও কিছু কিছু আছে!

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই তো! যাও, মেহমানকে পাশের এই সুন্দর কক্ষটিতে নিয়ে যাও! আর ঝি-চাকরানীদের ডেকে বলো, মেহমানের বিছানা আর আসবাবপত্র সুন্দর করে ঝেড়ে মুছে দিক। সেই সাথে তার নাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থাটা জলদি জলদি করুক।

আর আপনার?

আমি আমার কক্ষে যাচ্ছি। গিয়েই খোসবুর আম্মাকে আমার নাওয়া খাওয়ার কাজে লাগতে বলছি।

তো যান। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

: না বলছি–

ফের বলছি? এই বুড়ো শরীর নিয়ে এত বলার শখ? যান, যান শিগ্‌গির!

ইয়ারউদ্দীন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন– যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। বাপ্‌রে, মেয়ে তো নয়, একদম সেপাই! এটা যার ঘাড়ে পড়বে তার কম্মকাবার।

: তবেরে–

তেড়ে এলো সেলিনা বানু। হাসতে হাসতে হাঁটা দিলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব।

তিন চার দিন তাঁদের বাসায় বিশ্রাম করার জন্যে পথশ্রান্ত রাহাগীর সেলিম মালিককে নিজেদের বাসায় নিয়ে এলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব। কিন্তু তার সেই বিশ্রামের মেয়াদ তিন-চার দিনকে বাড়িয়ে বারো চৌদ্দ দিনে নিয়ে গেলেন তদীয় পুত্র শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব। পিতা ও কন্যাকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচানোর ঘটনা শুনে সেলিম মালিকের উপর যার পর নেই খুশি হলেন শাহাবুদ্দীন সাহেব। তিনি জানালেন, সেনা-সৈন্যর দেখভাল করার ভার তাঁর উপর। সুতরাং সেনাবাহিনীতে যে কাজেই লাগান না কেন সুলতান বাহাদুর, সেলিম মালিককে তাঁর বাসাতেই রাখবেন তিনি। সেনা ছাউনিতে পাঠাবেন না। সেই সাথে আরো জানালেন, সুলতান বাহাদুর বর্তমানে লাখনৌতি থেকে দেবকোট পর্যন্ত পাকা রাজপথ তৈরির কাজে ব্যস্ত আছেন। সেনা বাহিনীর দিকে নজর দেয়ার ফুরসত নেই তাঁর। তাই তিনি বলেছেন, বারো চৌদ্দ দিনের আগে সেলিম মালিককে কোন কাজে লাগাতে পারছেন না। এই বারো চৌদ্দ দিন বিশ্রাম নিক সেলিম মালিক।

সেলিম মালিকের তাই এখন দীর্ঘ অবসর। লম্বা বিশ্রাম। কাজের মধ্যে তার একমাত্র কাজ এখন শাহাবুদ্দীন সাহেবের বাসায় শুয়ে বসে থাকা।

সেলিনা বানু দু'একদিন এই নতুন মেহমানের কিছুটা দূরে থেকে থেকে কাটালো। বলা যায় না, কোন মানুষের নৈতিক চরিত্র কতটা মজবুত। কিন্তু এই দেড় দুই দিন দেখেই সে বুঝলো, সেলিম মালিক একজন অত্যন্ত সৎচরিত্রের লোক। সে নিজে একজন সুন্দরী যুবতী হওয়া সত্ত্বেও সেলিম মালিকের তার প্রতি কোনই আগ্রহ নেই। দু'একটা কথা বলার সময়ও সেলিম মালিক চোখ তুলে তাকায় না তার দিকে। কথা বলে মাটির দিকে নজর রেখে।

সেলিম মালিকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য প্রথম দিন থেকেই সেলিনা বানুর মন উন্মুখ হয়েছিল। অচেনা লোক বোধেই খোলাখুলি কথা বলার জন্যে তার কাছে আসতে সংকোচ বোধ করছিল সেলিনা বানু। এক্ষণে তার মনের

 বইঘর ও রোকন

নির্মলতার পরিচয় পেয়ে সেলিনা শঙ্কামুক্ত হলো এবং স্থির করলো সেলিম মালিকের ঘরে যাওয়া। সরাসরি যাওয়াটা দৃষ্টিকটু হয় বুঝে বিকেলের নাশতাটা ঝিয়ের পরিবর্তে সে নিজে নিয়ে সেলিম মালিকের ঘরে প্রবেশ করলো।

সেলিম মালিক খাটের উপর বসেছিল। মানুষের পদশব্দে চোখ তুলেই সেলিনা বানুকে নাশতা হাতে দেখে সেলিম মালিক অবাক হয়ে গেল। সসম্ভ্রমে সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো– এ কি! আপনি!

সেলিনা বানু স্মিতকণ্ঠে বললো– আপনার নাশতা।

সেলিম মালিক বললো– তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি কেন? ঝি-চাকরানী থাকতে আপনি কষ্ট করতে গেলেন কেন?

সেলিনা বানু এবার গলা ঝেড়ে বললো– সে প্রশ্নের উত্তরটা পরে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমার অনুরোধ, বয়সে আমি আপনার ছোট। দয়া করে আমাকে 'আপনি' বলবেন না। 'তুমি' বলবেন। নইলে খুবই বেমানান দেখায়।

বেমানান?

জি। শ্রুতিকটুও বটে। আর সে শিক্ষা তো আপনিই দিয়েছেন।

আমি দিয়েছি!

জি! প্রথম দিনই আপনি আমার দাদুকে 'আপনি' বলতে দেননি। বেমানান বোধে 'তুমি' বলিয়ে ছেড়েছেন। কারণ আপনি বয়সে ছোট। আমিও তো বয়সে ছোট। তাহলে আমার বেলায় ভিন্ন নিয়ম কেন?

সেলিম মালিক হেসে বললো– বাব্বা! দেখতে তুমি ছেলে মানুষ হলেও জ্ঞানবুদ্ধি দেখছি একদম পাকা। খুবই জ্ঞানী মেয়ে দেখছি তুমি!

সেলিনা বানুও ঈষৎ হেসে বললো– তাই কি? সত্যিই কি আপনার মনে হয়, তাই?

একদম সত্যি। বিদূষী মেয়ে বলতে যা বুঝায়, তাই তুমি।

আমার তা মেনে নেয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু দেখতে কি আমি এতটাই কুৎসিত?

চমকে উঠে সেলিম মালিক বললো– কেন-কেন? একথা বলছো কেন?

সেলিনা বানু বললো– নইলে বরাবর মাটির দিকে চোখ রেখে কথা বলছেন কেন? ঘরে ঢোকার সময় চোখ তুলে এক ঝলক দেখার পর থেকেই সেই যে

চোখ নামিয়েছেন আপনি, আর চোখ তুলেননি আমার দিকে। দেখতে আমি কুৎসিত বলেই কি ঘেন্নায়...

কথা শেষ করতে না দিয়ে সেলিম মালিক বলে উঠলো– দোহাই- দোহাই! এভাবে বলে লজ্জা দেবে না আমাকে। কুৎসিত কি বলছো? প্রথম দিন দেখেই তোমার রূপ-লাবণ্যে বিস্মিত হয়েছি আমি। বিন্দুমাত্র মিথ্যাচার না করে বলছি, তোমার মতো এতটা রূপবতী মেয়ে আগে আমি কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। তোমার সৌন্দর্য এক ধেয়ানে চেয়ে দেখার মতো। কুৎসিত বলে আমার ঘেন্না হচ্ছে– এ তুমি কি বলছো?

নইলে আমার দিকে চোখ না তুলে সেই থেকেই মাটির দিকে চেয়ে থেকে কথা বলছেন কেন?

বলছি এই কারণে যে, তুমি একজন বেগানা যুবতী। আমার মা বহিন নও। আমিও একজন বেগানা যুবক। বেগানা যুবক হয়ে বেগানা যুবতীর দিকে অপ্রয়োজনে চেয়ে থাকা গুনাহ।

ওমা! চেয়ে থাকলে গুনাহ হবে?

হ্যাঁ, তাই হয়। তোমার মতো জ্ঞানবতী মেয়ের তো এটা না বুঝার কথা নয়।

সেলিনা বানু হাসিমুখে বললো– শাব্বাশ!

সেলিম মালিক কিঞ্চিৎ গম্ভীরকণ্ঠে বললো– এসব কথা থাক। এত ঝি-চাকরানী থাকতে এতবড় একজন সম্ভ্রান্ত মেয়ে হয়ে কষ্ট করে তুমি আমাকে নাশতা-পানি খাওয়াতে এলে কেন? এ প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু এখনো আমি পাইনি।

সেলিনা বানু বললো– জবাবটা হলো, আপনার সামান্য একটু খেদমত করার সুযোগ নেয়ার জন্যে আমি নাশতা খাওয়াতে এসেছি।

আমার খেদমত! আমার খেদমত করার সুযোগ নেয়ার জন্যে?

বিলকুল তাই। আমার এ প্রাণটা তো আপনারই দান। আপনার জন্যেই আজ বেঁচে আছি আমি। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, অর্থাৎ প্রাণটা উৎসর্গ করতে উদ্যোগী হয়ে আমার আর অপর দু'জনের প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনি। আপনার এত বড় উপকারের বিনিময়ে আপনার কিঞ্চিৎ খেদমত করার সুযোগটাও কি দেবেন না আপনি? কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিঞ্চিৎ মওকাটাও দেবেন না?

ও, সেই কথা?

জি হ্যাঁ। আমাদের বাঁচাতে গিয়ে আপনি তো নিজেও মারা যেতে পারতেন। পারতেন না?

হ্যাঁ, তা অবশ্য পারতাম।

সেটা কি বুঝতে পারেননি তখন?

অবশ্যই বুঝতে পেরেছি।

: তবুও আমাদের বাঁচাতে গেলেন কেন?

এতগুলো প্রাণ চোখের উপর শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখেও কি আমি স্থির থাকতে পারি? মানবতাবোধ বলে কি আমার কিছু নেই?

তাহলে ঐ মানবতার কারণেই এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন আপনি, এটা তো ঠিক?

হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই।

তাহলে? এর পরেও আর মানুষ মহানুভব হয় কিসে? এর পরেও আর কি করলে তবে মানুষ মহামানব বা মহানুভব হয়?

সোবহান আল্লাহ! আমাকে একদম মহামানব বানিয়ে ফেললে?

আমি বানাবার কে? আপনি যে মহানুভব সে পরিচয় তো নিজেই আপনি দিয়েছেন।

মারহাবা! সত্য মিথ্যা যা-ই হোক, একটা খেতাব আজ পেলাম আমি।

শুধু আজ নয়, আপনার মতো মানুষেরা বরাবরই এ খেতাব পেয়ে থাকে। এবার আসুন দেখি, আপনার নাশতা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এই খাবার টেবিলে এসে বসুন।

খাবার টেবিলে বসবো?

জি বসুন। দয়া করে এগুলো একটু মুখে দিলে আমি বড়ই খুশি হবো।

সেলিম মালিক গিয়ে খাবার টেবিলে বসলো আর সেলিনা বানু খোশদিলে নাশতা-পানি পরিবেশন করতে লাগলো।

২

দিনে দিনে সেলিম মালিকের সাথে সেলিনা বানু বেগমের মেলামেশা খুব সহজ হয়ে গেছে। বোরকা দিয়ে খানিকটা আব্রু করে এখন সে হামেশাই সেলিম মালিকের কাছে যায়, নাশতা-পানি খাওয়ায়, গল্প-গুজব করে, হাসি-ঠাট্টা করে– কোন সংকোচবোধ করে না। এমনই এক হাসি ঠাট্টার মাঝে সেলিনা বানু একদিন সেলিম মালিককে প্রশ্ন করলো– এই যে সাহেব! এমন হাসিখুশি আর নরম মন নিয়ে আপনি এতটা নির্দয় হলেন কি করে?

বুঝতে না পেরে সেলিম মালিক পাল্টা প্রশ্ন করলো– নির্দয় হলাম মানে? কার উপর নির্দয় হলাম?

সেলিনা বানু নিঃসংকোচে বললো– কার উপর আবার! বউ-বাচ্চার উপর!

বিস্মিত হয়ে সেলিম মালিক বললো– বউ-বাচ্চার উপর! কার বউ-বাচ্চার উপর?

নিজের বউ-বাচ্চার উপর। নিজের.ছাড়া আর কার বউ-বাচ্চার উপর মানুষ নির্দয় হতে পারে?

সর্বনাশ! তার মানে?

খুব সহজ। দিনের পরদিন এই যে আপনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ মুলুক থেকে ওই মুলুকে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরছেন, আপনার বউ-বাচ্চা কি হালে আছে, কোথায় আছে, কি খাচ্ছে– এসব খবর কি কিছু রাখেন? রাখেন না। কারণ, আপনার সময় নেই। সময় থাকে না কিসে, বলুন তো? বউ-বাচ্চাদের সুখ-সাচ্ছন্দ বিধান করার অধিক আর কি কোন বড় কাজ থাকে বিবাহিত মানুষের?

এক নিমেষ দম ধরে থাকার পর সেলিম মালিক হেসে উঠলো হো-হো করে। সুর করে বললো– 'হরি আপনি নাচো, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে।'

এবার বিস্মিত হলো সেলিনা বানু। বললো– এর মানে?

সেলিম মালিক বললো– বোরেগী সন্ন্যাসীদের গান। কথাটা এভাবেও বলা যায়– 'মাওলা চোরকে তুমি চুরি করাও, তুমিই আবার ফাটক খাটাও, তোমার লীলা বুঝা ভার।'

সেলিনা বানু উষ্মার সাথে বললো– এসব কথার অর্থ কি?

সেটা তুমিই ভাল জানো। কারণ, তুমিই আমাকে শাদি দিচ্ছো, বাল-বাচ্চাদের বাপ বানাচ্ছো, আবার তুমিই তাদের কষ্ট দেয়ার অপরাধে আমাকে অপরাধী করছো।

সেকি! আমিই আপনাকে শাদি দিচ্ছি মানে? পরিষ্কার করে বলুন, শাদি আপনি করেননি? বয়সটা তো কম হয়নি?

বয়সটা কম বেশি যাই হোক, কেউ আমাকে শাদি করলে তো? আমার পছন্দ হলেই তো হবে না। যাকে শাদি করবো তার তো পছন্দ হওয়া চাই। পছন্দ তো কেউ আজও করলো না।

তাজ্জব! পছন্দ করলো না কি রকম? কেউ আপনাকে পছন্দ করেনি?

কে করবে? এই ভবঘুরে উড়বংকে কে পছন্দ করবে? বাড়ি নেই, ঘর নেই, বিষয় নেই, আশ্রয় নেই– তাকে কি কেউ পছন্দ করে?

আলবত করে। কিছু না থাকলেও আপনার চেহারা দেখলে যে কোন সুলতানজাদীও আপনাকে পছন্দ করে ফেলবে। চেহারা তো নয়, আসমানী জৌলস। সাক্ষাৎ ফেরেশতা। এমন চোখ ধাঁধানো চেহারা মাথাকুটেও কি কেউ কোথাও পাবে? আপনি ধরা দিলে, সুলতানজাদী, সম্রাটজাদী– সবাই লুফে নেবে আপনাকে।

বিনয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিল সেলিম মালিক। বললো– তাই কি কেউ নেয়? শুধু রূপ থাকলেই তো হয় না, গুণ থাকা চাই। ইউসুফের রূপ-গুণ দুটোই ছিল বলে জুলেখা বিবি তাকে লুফে নিয়েছিল। ঐ যে বলে– কোন গুণই নেই যার, কপালে আগুন। আমার সেই অবস্থা। আমার কি কোন গুণ আছে! আমি তো বে-গুণ।

ওম্মা! বলে কিরে! আপনি তো গুণের আধার। কোন গুণটা নেই আপনার শুনি?

তা, রূপ-গুণ যদিও কিছু থাকে, তাতেই বা কি? বিষয়-বিত্ত না থাকলে, শুধু

রূপ-গুণ দেখে কি কোন মেয়ে শাদি করে কাউকে? খাবে কি? থাকবে কোথায়?

থাকবে রাজপ্রাসাদে। খাবে রাজখানা। যার সামর্থ আছে, কিছু না থাকলেও তার স্ত্রীর কি খাওয়া-থাকার চিন্তা থাকে?

সেলিম মালিক বললো– থাকে না?

সেলিনা বানু বললো– না, থাকে না। আমাদের এই সুলতানদের দেখুন না, তাঁরা নাকি সবাই ছিলেন পথের মানুষ। কারো কিছুই ছিল না। তবু তাঁদের স্ত্রীরা তো সবাই রাজরানী বনে গেছেন। যাননি?

গিয়েছেন। কারণ, তাঁদের স্বামীরা সবাই সামর্থবান পুরুষ। করিৎকর্মা লোক।

আপনারই বা সামর্থটা কম কিসে? গাছের তলে পড়ে নিশ্চিত মরার মুখ থেকে যে লোক এক লাফে গিয়ে বাঁচিয়ে আনে মানুষ, তার সামর্থটা কি কারো থেকে এতটুকু কম?

যাব্-বাবা! আমাকে যে রূপবান, গুণবান, সামর্থবান– সবই একসাথে বানিয়ে দিলে তুমি!

আমি বানিয়ে দেবো কেন? সত্যিই যে আপনি সব কিছুরই অধিকারী। অথচ বিষয়-বিত্ত নেই বলে আজও শাদি করেননি আপনি। আপনার প্রতি আমার করুণা হয়।

আচ্ছা!

www.boighar.com

অথচ দেখুন, আপনার মতো এত রূপ না থাকা সত্ত্বেও শুধু সামর্থের জোরে সবাই তাঁরা কেমন সুলতান বনে গিয়েছেন আর গিয়েছিলেন। সুলতান বখতিয়ার খলজি শুনেছি দেখতে মোটেই সুশ্রী ছিলেন না। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে খাটোও ছিলেন অনেকখানি। তবু তাঁর সামর্থ দেখে গজনী সাম্রাজ্যের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের অমাত্য-কন্যা মহব্বতে পড়ে গিয়েছিলো তাঁর। ওদিকে আবার বখতিয়ার খলজি সাহেবও তাঁর সামর্থের জন্যে সুলতান বনে গিয়েছিলেন বিশাল এই বাঙ্গালা মুলুকের। আমি সবই শুনেছি।

তাই নাকি?

শুধু বখতিয়ার সাহেব কেন, তাঁর পরে তাঁর তিন তিনজন ইয়ারও পথের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও শুধুই মনোবল আর কর্মতৎপরতার গুণে সুলতান বনে

 বইঘর ও রোকন

গিয়েছিলেন। আমাদের এই বর্তমান সুলতানও তাই।

তাজ্জব! আপনি সবই এসব জানেন?

না, জানিনে। শুনিনি সবটা। দাদুর কাছে একটু একটু শুনেছি– এইমাত্র। দাদু আমাকে সবই বিস্তারিত শুনাতে চেয়েছেন। উনি সবই জানেন।

তাই?

জি-জি! চেপে ধরলে আপনিও দাদুর কাছে জানতে পারেন তাঁদের সবার জীবনী। শুনবেন?

হ্যাঁ! কিছু কিছু আমিও জানি। তবু উনি বললে অবশ্যই তা শুনবো।

এই সময় সেখানে এসে হাজির হলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব। বললেন– কি শুনবেরে ভাই? কার জীবন কথা শুনবে?

সেলিম মালিক জবাব দেয়ার আগেই কথা বললো সেলিনা বানু। বললো– সুলতান বখতিয়ার খলজির তিন ইয়ারের জীবন কথা দাদু। আপনি তো শুনাতে চেয়েছেন।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– বখতিয়ারের তিন ইয়ার?

জি, জি। বখতিয়াতের তিন ইয়ার। তাঁদের জীবন কথা আপনি যে শুনাতে চেয়েছিলেন। আজ শুনান।

ও আচ্ছা। তা শুধু ঐ তিন ইয়ারের কথা কেন? বখতিয়ারের কথা শুনবে না? তাঁর জীবন তো আরো বিচিত্র।

এবার সেলিম মালিক বললো– সেটা আমি মোটামুটি অনেকখানি জানি দাদু। একই জায়গার মানে উনার জন্মস্থান গরমশিরের লোক তো আমি। অনেক কিছু শুনেছি আর সরাসরি দেখেছি। তাঁর কথা আমিই সেলিনা বেগম সাহেবাকে শুনাতে পারবো। কিন্তু অপর তিনজনের জীবনী উড়ো উড়ো ছাড়া আমার সঠিক জানা নেই। আপনি দয়া করে শুনালে, সেলিনা বানু বেগম সাহেবার সাথে আমিও শুনতাম।

এবার সেলিনা বানু জিদ ধরে বললো– শোনান দাদু। কথা যখন উঠলোই, ওদের তিন জনের কথা এখনই আমাদের শোনান।

এখনই?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখনই। আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই দাদু! আজ আপনাকে শুনাতেই হবে।

 বইঘর ও রোকন

আরে পাগল! এখনই বললে কি এখনই শুনানো যায়? একি দু'চারটে কথা? ঐ তিনজনের একজনের জীবনী শোনাতে গেলেও কয়েক প্রহর লাগবে। কাজেই সময় করে নিয়ে বসতে হবে শুনানো আর শোনার জন্যে।

তাহলে আজই সময় করে নিন। আপনার হাতে তো কোন জরুরী কাজ থাকে না। অসুবিধে কোথায়?

না, অসুবিধে নেই। ঠিক আছে, আজ রাতে এশার নামাযের পর এসে বসবো। তোমরা সেইভাবে প্রস্তুত থেকো।

সেলিনা বানু উৎফুল্লকণ্ঠে বললো— প্রস্তুত দাদু, প্রস্তুত। আমরা সব সময়ই প্রস্তুত।

সেদিন এশার নামায অন্তে চলে এলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব। ওদের দু'জনকে নিয়ে ফরাশে বসে শুরু করলেন কাহিনী। বললেন— বখতিয়ার খলজি সাহেব যখন ইন্তেকাল করলেন অর্থাৎ নিহত হলেন, তখন তাঁর তিন ইয়ার তাঁর সাম্রাজ্যের তিন ইকতার, মানে তিন অঞ্চলের শাসক ছিলেন। ইজ্জউদ্দীন মোহাম্মাদ শিরান খলজি ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের, হুসামউদ্দীন ইওজ খলজি ছিলেন পশ্চিম অঞ্চলের আর আলী মর্দান খলজি ছিলেন উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের শাসক। আজ ইজ্জউদ্দীন মোহাম্মাদ শিরান খলজির কথা বলি, শুনো।

ঈজ্জউদ্দীন মোহাম্মাদ শিরান খলজির কথা

বখতিয়ার খলজি যখন কোনই প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি, প্রতিষ্ঠালাভের সংগ্রামে লিপ্ত আছেন শুধু, সেই সময় তার প্রথম সঙ্গী ঈজ্জউদ্দীন মোহাম্মদ শিরান খলজি। বখতিয়ারের তিনি তখন একমাত্র ইয়ার বা বন্ধু এবং বখতিয়ারের সংগ্রামের একমাত্র দোসর ও ডান হাত। বখতিয়ারের সাথে তার পরিচয়টা ঘটে অতি আচানকভাবেই।

সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি ও দিল্লীর অধিকর্তা কুতুবউদ্দীন আইবকের রাজস্ব বিভাগের দপ্তরটা এ সময় সাময়িকভাবে অবস্থিত ছিল আজমীর শহরে। গজনী সাম্রাজ্যের আরিজ সাহেব (সেনা-সৈন্যের নিয়োগকারী ও বেতনদাতা) এই সময় দিল্লীর রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান হিসাবে আজমীরে বদলী হয়ে আসেন। গজনীর এই আরিজ সাহেবের কন্যার তথা বখতিয়ারের মেহবুবার (প্রণয়ীর) পত্র পেয়ে বখতিয়ার খলজি আরিজ কন্যার খোঁজে

ভারতবর্ষে এসে হাজির হন। নানা স্থানে খুঁজে আরিজ-কন্যার সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি বাদাউনের শাসক মালিক হিজবরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। এই মালিক হিজবর সাহেব রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু নির্দেশ আনতে বখতিয়ারকে আজমীর পাঠান। আর আজমীরে এসেই বখতিয়ারের সাক্ষাৎ ঘটে তার প্রিয়তমার (আরিজ কন্যার) সাথে। এতে করে আরিজ-কন্যা যারপর নেই খুশি হয় এবং বাদাউনে ফিরে আসার কালে আরিজ-কন্যা অনেকগুলো মুদ্রা, অর্থাৎ অর্থ, বখতিয়ারকে উপহার দেয়।

জেবে (পকেটে) এই মুদ্রাগুলো নিয়ে বাদাউনের দিকে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে চলেছেন বখতিয়ার। পিঠে ঢাল, হাতে বল্লম, কোমরে বাঁধা কোষবদ্ধ তলোয়ার। একের পর এক বন-জঙ্গল ও মাঠ-ময়দান অতিক্রম করে ছুটে চলেছে তাঁর অশ্ব। এসব কোন দিকেই তেমন একটা নজর নেই বখতিয়ার খলজির। তাঁর মনজুরে আছে তখন একমাত্র ঐ আরিজ-কন্যা। তার ধ্যানেই তখন তিনি মশগুল। এ অবস্থায় হঠাৎ 'হালুম'! বাঘের বিকট গর্জন কানে এলো বখতিয়ারের।

চমকে উঠলেন বখতিয়ার। সজাগ হয়ে দেখেন, তিনি তখন একটা বনপথ অতিক্রম করে যাচ্ছেন। গর্জনটা তাঁর খানিকপাশেই। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে চাইতেই দেখেন অবাক কাণ্ড! বাঘে মানুষে লড়াই!

হিংস্র এক বাঘের সাথে কুঠার হাতে লড়াই করছে এক মানুষ। বাঘ এসে লাফিয়ে লাফিয়ে মানুষটির উপর পড়তে চাইছে। বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে কুঠার দিয়ে বাঘের মুখে আঘাত করার চেষ্টা করছেন মানুষটা।

বখতিয়ার তাঁর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরতেই বাঘটা এসে লোকটার একদম বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক কদম পিছিয়ে গিয়ে কুঠার দিয়ে বাঘের মাথায় সজোরে আঘাত করলেন লোকটা। বাঘের মাথার মাঝখানে অনেকখানি বসে গেল কুড়াল। বাঘের মাথা রক্তাক্ত হয়ে গেল। বিকট গর্জন করে লাফিয়ে উঠলো বাঘটা এবং তৎক্ষণাৎ বনের মধ্যে দৌড় দিলো।

লোকটার হিম্মত দেখে তাজ্জব হলেন বখতিয়ার খলজি। তার চেয়ে আরো বেশি তাজ্জব হলেন লোকটার আচরণ দেখে। বাঘটা পালিয়ে গেল কিন্তু লোকটা একটুও নড়লেন না। বাঘের ভয়ে পালানো তো দূরের কথা, এত বড় একটা ঘটনার পরও তিনি ওখানেই দাঁড়িয়ে থেকে কপালের ঘাম আঙ্গুল দিয়ে

মুছে ফেলে একটা কুকুর তাড়িয়ে দেয়া মাফিক মামুলি এক ঘটনার মতো একটা মরা গাছ কুপিয়ে কুপিয়ে কাটতে লাগলেন।

বখতিয়ার খলজি তাজ্জব। দুরন্ত সাহসী বলে বখতিয়ারের বিরাট একটা আত্মবিশ্বাস আছে। কিন্তু এ লোকটা তাঁকে বিলকুল বোবা বানিয়ে দিলেন। হিম্মতের এ কি বিচিত্র নজীর!

অশ্বের লাগাম টেনে ধরে কিয়ৎকাল নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর বখতিয়ারের খেয়াল হলো, লোকটা যে প্রচণ্ড সাহসী, এ নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটার বুদ্ধিমত্তা আর কাণ্ডজ্ঞানের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে যথেষ্ট। বাঘ বাঘই, মানুষ মানুষই। বাঘ যতটা মানুষের কাছে আতংকের বস্তু, মানুষ ততটা বাঘের কাছে নয়। বেকায়দায় পড়ে পালিয়ে গেছে বলেই সে ভয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দেয়নি। যেভাবে এ লোকটা এক ধিয়ানে কাঠ কোপাচ্ছে এখন এই মুহূর্তে আহত বাঘটা যদি ফিরে এসে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর উপর তাহলে তাঁর নিশ্চিত মৃত্যু তিনি রোধ করতে পারবেন না। বীরত্ব গৌরবের, সাহস প্রশংসার। কিন্তু নির্বুদ্ধিতার জন্যে কোনই মান ইজ্জত নেই। ওটা ধিক্কারের।

কৌতূহল তিনি সম্বরণ করতে পারলেন না। লাগামে টান দিয়ে তিনি ঘোড়ার গতি ঘুরিয়ে নিলেন। এর পর গিয়ে সরাসরি লোকটার কাছে হাজির হলেন। পেছনে শব্দ শুনে কুঠার হাতে লাফিয়ে উঠলেন লোকটি। বাঘের বদলে মানুষ দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন। প্রশ্ন করলেন– আপনি! আপনি কে?

জবাবে বখতিয়ার খলজি বললেন– আমি কে সে পরিচয় পরে দেবো। আপাতত আমি একজন রাহাগীর।

রাহাগীর?

জি, জি।

এখানে? এখানে কি মনে করে?

আপনাকে আমি দু'একটি প্রশ্ন করতে চাই।

হাতের কাজ বন্ধ করে সে লোকটি বললেন– বলুন, কি আপনার প্রশ্ন?

জলজ্যান্ত একটা বাঘের সাথে এখনই লড়াই করলেন। বাঘটা পালিয়ে গেল। আপনি তবু এখানেই রয়ে গেলেন কোন সাহসে?

ও, এই কথা? তা কাজ তো আমার শেষ হয়নি। যাই কি করে?

ও বাঘটা তো ফের আসতে পারে! পারে না?

পারে বৈ কি! বরং ঘা খেলে ওরা আরো ক্ষেপে যায়। সেই জন্যেই তো হাড়াহুড়া করছি আমি।

তাড়াহুড়া করছেন?

জি। গাছের এই অংশটা কেটে নিয়েই সরে পড়বো।

গাছের প্রতি ইংগিত করলেন লোকটি। বখতিয়ার সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন– অন্য বাঘও তো থাকতে পারে আশপাশে?

থাকতে পারে মানে? অনেক বাঘ আছে এখানে।

তারা মানুষ খায় না?

খুব খায়। সুযোগ পেলেই ধরে ফেলে। এই কয়দিন আগেই তো আমার মতো এক কাঠকাটা লোককে ধরে নিয়ে গেল।

ধরে নিয়ে গেল?

জি।

সে লোক আর ফেরেনি?

না।

বলেন কি!

কেন, এতে তাজ্জব হবার কি আছে? এই কয় বছরে এখানকার বেশ কিছুলোক বাঘের হাতে জান দিয়েছে।

বখতিয়ার খলজির চোখ দুটো কপালে উঠলো। বললেন– তবু আপনারা আসেন এখানে? আর এখনই এই এত বড় একটা দুর্ঘটনার পরও আপনি এখানে কাঠ কাটছেন? আপনার জানের কোন ভয়ই নেই?

লোকটির মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন– ভয় আবার কম বেশি কার দিলে না থাকে? ভয়ে তো আমাদের বস্তির অনেকেই এই বনে আসাই ছেড়ে দিয়েছে। অথচ এখানকার মতো ভাল কাঠ আর অন্য বনে নেই।

আপনি এখনও ছাড়েননি কেন? নাকি ভয় আপনার...

আছে। ওদের মতো অতখানি না হলেও, ভয় আমার দিলেও আছে। কিন্তু কি করবো, বলুন? গরীব কাঙাল মানুষ। ভয় করে ঘরে থাকলে পেট চলবে কেমন করে?

তার মানে? এই কাঠ...

হ্যাঁ, কাঠমিস্ত্রিকে নিয়ে গিয়ে দিতে পারলে তবেই আমি পয়সা পাবো।

তারপর? সে পয়সা ফুরিয়ে গেলে?

আবার আমাকে কাঠের তালাশে আসতে হবে এখানে।

এবং আবার আপনাকে বাঘের খপ্পড়েও পড়তে হতে পারে?

পারেই তো। এখানে যারা হামেশা আসে, তাদের দু'একবার এমন খপ্পড়ে পড়তেই হয়। তাই বলে সবাই তো আর ভয়ের কাছে জিন্দেগীটা বিকিয়ে দিতে পারে না!

আপনি তো তা পারেনই না, কি বলেন?

না, তা পারিনে। মরতে তো হবেই একদিন। সুতরাং ঐ ভয়-ভীতিকে আশ্কারা দিয়ে ঘরে বসে না খেয়ে মরা আমার পক্ষে অসম্ভব।

বখতিয়ার খলজির মস্তিষ্ক চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বাস্তবায়নে এমন লোকই চাই তাঁর। এই কিসিমের দুঃসাহসী কয়েকজন সাথী পেলেই তিনি সত্যি সত্যিই একটা কিছু করতে পারবেন। একটু চিন্তা করেই তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন– আচ্ছা ভাই! এই কাঠ কেটে যা পাবেন, সে পয়সাটা আমি যদি দেই আপনাকে, তাহলে কি এই বনের বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করতে পারি?

লোকটি বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন– তার মানে? গল্প করে পয়সা? গল্প করে পয়সা দিবেন?

হ্যাঁ, দেবো। বিশ্বাস না হয় এই নিন্!

জেবে রাখা আরিজ-কন্যার মুদ্রাগুলোর কিয়দংশ মুঠি করে বের করে মেলে ধরলেন বখতিয়ার। বললেন– হবে না এতে?

এতগুলো মুদ্রা দেখে সে লোকটির দুই চোখ ফুটে উঠলো। বললেন– হবে না মানে? ঐ মুদ্রার একটাই তো এই গোটা গাছের দাম নয়। এই রকম দুটো গাছের যে কাঠ হবে, সেই তামাম কাঠ এই একটা মুদ্রায় পাওয়া যায়।

তাহলে নিন একটা।

লোকটি তবুও ইতস্তত করতে লাগলেন। বখতিয়ার ফের বললেন– তবু আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না? তাহলে আমিই তুলে দিচ্ছি নিন।

লোকটি এবার নড়াচড়ে উঠে বললেন– আচ্ছা-আচ্ছা, ঠিক আছে। দেবেন বলে জবান দিয়েছেন যখন, তখন আর কথা কি? চলুন এবার বাইরে যাই।

বন থেকে বেরিয়ে লোকালয়ের কাছে এক নিরাপদ ময়দানে এসে মুখোমুখি বসলেন দু'জন। বেলা তখন অনেকখানি পড়ে গেছে। বখতিয়ার খলজি হিসাব করে দেখলেন, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। সূর্যাস্তের আগেই তিনি নিকটবর্তী সরাইতে পৌঁছতে পারবেন। তাই ধীরেসুস্থে প্রশ্ন করলেন– ভাই সাহেবের নামটা?

লোকটি জবাব দিলেন– ইজ্জউদ্দীন মোহাম্মদ শিরান খলজি।

ব্যস্তভাবে চোখ তুললেন বখতিয়ার। বললেন– কি বললেন? শিরান খলজি?

হ্যাঁ, সবাই আমাকে শিরান খলজিই বলে। আমার এক ভাই আছে। তার নাম আহম্মদ শিরান খলজি। তাকে বলে, আহম্মদ খলজি।

: আপনি খলজি সম্প্রদায়ের লোক?

জি-হাঁ।

মকান?

আপাতত ঐ যে দেখছেন, ঐ বস্তিতে। এর আগে ছিল কুজ্জগিরি বন্দরে।

কুজ্জগিরি!

জি। আজমীর থেকে দক্ষিণ-পূর্বে অনেক দূরের এক নদী বন্দরে।

ওটাই আপনাদের আদি বাসস্থান?

জি-না। বাড়ি আমাদের তুর্কিস্তানে। ঐ কুজ্জগিরিতে তেজারতি করতে এসে এই যে আজ এই পথে এসে বসেছি।

বলেন কি! আমাদেরও তো আদি বাস ঐ তুর্কিস্তানে। আমিও ঐ খলজি সম্প্রদায়ের লোক। কয়েক পুরুষ আগে আমরা আফগানিস্তানের গরমশিরে এসেছি।

তাই নাকি? এক গোত্রের লোক আমরা?

শিরান খলজিও অবাক হলেন। ফের প্রশ্ন করলেন– তাহলে কি এখন ঐ গরমশিরেই...

না। এখন আছি বাদাউনে। আমি বাদাউনের এক সেপাই।

শিরান খলজির দু'চোখ ফের মেলে গেল। অস্ত্রশস্ত্র দেখে এমনটিই তাঁর মনে

 বইঘর ও রোকন

হয়েছিল। সাগ্রহে তিনি প্রশ্ন করলেন– আপনি একজন সেপাই?

জি-হ্যাঁ।

শিরান খলজি নীরব হলেন। একটু পরে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন– আমাদের বংশটাও সেপাইয়েরই বংশ ছিল।

তা লক্ষ্য করে বখতিয়ার খলজি বললেন– সেপাইয়ের বংশ ছিল মানে?

সে অনেক কথা।

www.boighar.com

মেহেরবানী করে সব কথাই বলুন আমাকে। সেই বংশের আপনার কি হলো? এখন এই কাঠ কাটছেন কেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিরান খলজি বলতে শুরু করলেন– আমাদের পরিবার তুর্কিস্তানের পুরাতন পরিবার। বংশানুক্রমে আমার বাপ-দাদুরা সেপাই। অধিকাংশই ফৌজে চাকরি করতেন। বাদবাকিরা দেশ-বিদেশে ব্যবসা করে বেড়াতেন। মোহম্মদ ঘোরীর হিন্দুস্তান জয়ের আগে থেকেই আমার বংশের অনেকে হিন্দুস্তানের এই কুজগিরিতে ব্যবসা করতে আসতেন। সেই সুবাদে এই বন্দরে মালামাল নিয়ে আমরা দুই ভাইও আসি আর ওখানেই বসতি স্থাপন করি।

কেন, তুর্কিস্তান ফেলে আপনারা এখানে এলেন কেন?

তুর্কিস্তানে কেউ আর এখন নেই আমাদের। আমার বাপ-চাচারা সকলেই ইরাকের সরকারী ফৌজে নকরী করতেন। কয়েক বছর আগে এক লড়াইয়ে সবাই তাঁরা শাহাদাত বরণ করলেন। আমার দাদু আর আম্মা সেই শোকে পর পর দু'জনই ইন্তেকাল করলেন। আমাদের দুই ভাইয়ের বেজায় আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের কিছুতেই ফৌজে যেতে দেননি। তাঁদের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে আমরা তেজারতিতে আত্মনিয়োগ করি। দাদু আর আম্মাজানের ইন্তেকালের পর সংসারে আমরা কেউই মন বসাতে পারলাম না। তুর্কিস্তান আমাদের কাছে খাঁ খাঁ করতে লাগলো। শেষে প্রতিবেশী এক ব্যবসায়ীর উৎসাহে তুর্কিস্তানের তামাম কিছু বেচে দিয়ে মালামাল নিয়ে আমরা দুই ভাই সপরিবার এই হিন্দুস্তানে ব্যবসা করতে আসি আর ঐ কুজগিরিতে বসতি স্থাপন করি।

এই পর্যন্ত বলেই শিবান খলজি থামলেন। তিনি উদাস নেত্রে আসমানের দিকে চেয়ে রইলেন। বখতিয়ার খলজি ফের প্রশ্ন করলেন– তারপর?

ফের শিরান খলজি বলতে শুরু করলেন– ইতোমধ্যেই হিন্দুস্তানে সুলতানে আলা মোহাম্মদ ঘোরীর আধিপত্য কায়েম হয়েছে। তাঁর প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন আইবেকের উপর শাসনভার ন্যস্ত করা হয়েছে। হিন্দুস্তানের এক বিরাট এলাকা তখন মুসলমানদের মুলুক। আমাদের ঐ কুন্জগিরি এই মুসলমান মুলুকের অন্তর্ভুক্তই ছিল। কিন্তু একেবারেই সীমান্ত এলাকা। তার পাশেই হিন্দুরাজ্য। মুসলমানদের হাতে হিন্দুস্তান চলে যাওয়ায়, হিন্দুরা সেরেফ নাখোশই নয়; ফৌজের সামনে দাঁড়ানোর হিম্মত না থাকায়, মওকা পেলেই নিরীহ মুসলমান মেরে এখন তার বদলা নিচ্ছে।

তারপর?

কিছু দিন আগে পার্শ্ববর্তী এক হিন্দু রাজার ফৌজ গভীর রাতে অতর্কিতে চড়াও হলো ঐ কুন্জগিরির মুসলমান বাসিন্দাদের উপর। তারা মুসলমানদের আদমী আওরাত বাল-বাচ্চাদের সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলো। তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে মালপত্র লুট করতে লাগলো। আমাদের বাড়ি ছিল ঐ বন্দরের এক কিনারে। হইচই শুনেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আমরা গিয়ে পাশেই এক ঝোপের মধ্যে লুকালাম। একটু পরেই হাতিয়ারধারী দুশমনেরা এসে আমাদের মালপত্র লুট করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। জানে আমরা বেঁচে গেলাম এটুকুই যা লাভ। সারা রাত ঝোপের মধ্যে কাটালাম। সকালে দেখি, অধিকাংশই মরেছে আর বাদ-বাকিরা রাতারাতি পালিয়েছে।

কি সর্বনাশ! তারপর?

আশপাশের হিন্দুরাজা আর জঙ্গী হিন্দুরা এমন ঘটনা আরো অনেক জায়গায় ঘটিয়ে যাচ্ছে– এ খবর হামেশাই কানে এসে এসে পড়ছিলো। ওখান থেকে সরি সরি করতেই এই ঘটনা ঘটে গেল। এখন একেবারে কপর্দকহীন হয়ে ঐ বস্তিতে এসে উঠেছি।

বড়ই দুঃখের ব্যাপার। তা এলেন তো এই কাঠ কাটছেন কেন?

না কাটলে এতগুলো পেট চলবে কি করে?

কেন, এই তো বললেন, আপনার বংশের সকলেই সেপাই ছিলেন। আপনাদেরও সেপাই হওয়ার খাহেশ ছিল। তেজারতি পয়মাল হলো, সদরে গিয়ে সেপাই হবেন। চেহারা তো পুরোদস্তুর ফৌজি লোকের চেহারা! কাঠ কাটবেন কেন?

 বইঘর ও রোকন

এবার শিরান খলজি হাসলেন। হেসে বললেন– ভাই সাহেব ফৌজি লোক হলেও দেখছি, ফৌজে ঢোকার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে একেবারেই বেখেয়াল!

অর্থাৎ!?

সেপাই হবার পূর্বশর্ত– নিজস্ব অশ্ব আর প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এগুলো না থাকলে ফৌজে ঢোকার মওকা নেই। রুটির সংস্থানই নেই আমাদের, ওসব কিনবো কি দিয়ে?

ফৌজে ঢোকার পূর্বশর্ত সম্বন্ধে বখতিয়ার যে কতখানি বেখেয়াল, তা বখতিয়ার খলজি নিজে আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তৃতীয় কেউ জানে না। ক্ষানিকের জন্যে বখতিয়ার খলজি লা-জবাব হয়ে গেলেন। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন– ফৌজে ঢোকার খাহেশ আর এখন আছে আপনাদের?

আছে মানে? জানপ্রাণ কোশেশ করছি।

কোশেশ করছেন?

হ্যাঁ! জানপ্রাণ কোশেশ করছি রুটির পয়সা বাদে ওসবের জন্যে দুটো বাড়তি পয়সা রোজগারের। কিন্তু ঘোড়া-হাতিয়ার এসব তো দু'একটা পয়সার ব্যাপার নয়। কাজেই কবে যে সে উম্মিদ হাসেল হবে আমাদের– তা ঐ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

শিরান খলজির কণ্ঠস্বর নেমে এলো। বখতিয়ার খলজি বললেন– আমি যদি ঘোড়া আর সেই সাথে তামাম হাতিয়ার দেই আপনাদের, তাহলে জঙ্গী জীবনে নামতে আপনারা রাজি আছেন?

শিরান খলজি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয় আনতে পারলেন না। তিনি বখতিয়ারের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। বখতিয়ার খলজি এবার তাঁর ইরাদার কথা ব্যাখ্যা করে শুনালেন। তিনি বললেন– জঙ্গী জীবন মানে কোন ফৌজের অধীনে চাকরি নয়। যারা আপনার জান মালে হাত দিয়েছে, আমাদের কওমী পতাকার বে-ইজ্জত সাধনে হর-ওয়াক্ত যারা তৈয়ার, তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে লড়াই করার জঙ্গী জীবন। নয়া ফৌজ গড়ে তুলে ফৌজের মালিক হয়ে জেহাদ করার জঙ্গী জীবন। যে জীবনের কামিয়াবীর সাথে একসূত্রে গাঁথা আছে নিজের, কওমের আর তৌহিদের বিপুল স্বার্থ। যে জিন্দেগীর সামনে আছে নিজের, কওমের ও তৌহিদের খেদমতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার প্রশস্ত মওকা।

শুনে শিরান খলজি গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– সবই তো বুঝলাম ভাই সাহেব!

আপনার নিয়ত ইরাদা তামামগুলোই মহৎ আর আকর্ষণীয়; কিন্তু সেটাকে বাস্তবায়িত করার পথ আমাদের কৈ?

পথের চিন্তা আমাদের নয়। ওটা পরোয়ারদিগার দেখবেন। আমাদের কাজ নিয়াতের পেছনে তদবির আর জানপ্রাণ কোশেশ করা। আমার ছোট্ট একটা আস্তানা আছে, কিছু হাতিয়ার আর গোটা কয়েক অশ্ব আছে। নিজেই একটি ফৌজ তৈরির ইরাদায় আমি আগে থেকেই দিনে দিনে যোগাড় করেছি এসব।

অতঃপর আরিজ-কন্যার অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– আর এই তো দেখছেন, আরো কিছু অশ্ব আর হাতিয়ার কেনার সংস্থান আল্লাহ তায়ালা ছাপ্পড় ফেঁড়ে দিয়েছেন। নিজেরও কিছু সঞ্চয় আছে আমার। এবার ফিরে গিয়ে কিছু বেতনভুক সেপাই যোগাড় করে ছোটখাটো বাহিনী তৈয়ার করবো একটা। ছোট হোক, বড় হোক, নিজের একটা বাহিনী থাকলে তার কদর আলাদা। যে কোন শাসনকর্তার নজরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে তখন। আপনারা যদি রাজি থাকেন, তাহলে চলে আসুন আমার সাথে। বেতনভুক সেপাই নয়, আমার সহকারী হয়ে কাজ করবেন।

শিরান খলজির মুখমণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি বললেন– রাজি মানে? মওকা থাকলে আজই আপনার সঙ্গ নিতাম কিন্তু আমাদের পরিবারবর্গ– মানে দুই ভাইয়ের বিবি-বাচ্চা– এদের দিনগুজরানের মতো একটা সংস্থান করে না দিয়ে যাই কি করে, বলুন।

বখতিয়ার খলজি বললেন– একি বলছেন! আপনারা আমার সঙ্গী হলে আপনাদের পরিবারবর্গ জুদা থাকবে কেন? তখন সবাই আমরা এক পরিবার। আমি একদম একা। বরং আপনাদের বালবাচ্চা আর ভাবী সাহেবানরা সঙ্গে থাকলে সুন্দর একটা পারিবারিক জীবন পাবো আমি।

শিরান খলজি এতটা আশা করতে পারেননি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। বখতিয়ার খলজি বললেন– খরচ নিয়ে আপনাদের কারো মাথা ঘামাতে হবে না। খরচাদি ও দায়দায়িত্ব তামাম কিছু আমার।

সে রাত্রিটা শিরান খলজির আস্তানায় গিয়ে কাটিয়ে পরের দিন শিরান খলজি, আহম্মদ খলজি ও তাঁদের বিবি-বাচ্চাদের নিয়ে বখতিয়ার খলজি রওনা হলেন। বাদাউনে এসে শহরের বাইরে তাঁর অস্থায়ী আস্তানাতে শিরান খলজিদের রেখে বখতিয়ার খলজি বাদাউনের শাসনকর্তা মালিক হিজবরের দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। চাকরি করার উদ্দেশ্যে নয়, গোলামির জিঞ্জির

ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে।

অতঃপর শিরান খলজি ও আহম্মদ খলজি দুর্দান্ত কাজে এলেন বখতিয়ারের। নিজের বীরত্বের সাথে তাঁদের বীরত্ব যোগ হওয়ায় তিনি অচিরেই নজরে পড়লেন অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসামউদ্দীন সাহেবের। পেলেন ভাগবত ও ভিউলী নামক দুইটি পরগনার জায়গিরদারী। সবিক্রমে করতে লাগলেন অযোধ্যার সীমান্ত রক্ষীর কাজ। শিরান খলজিদের বীরত্ব ও বাহাদুরী সহজ করে দিলো বখতিয়ার খলজির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। গয়ার রাজা গোবিন্দ পালকে পরাজিত করা ও মগধ জয় করার লড়াইয়ে শিরান খলজি ভ্রাতৃদ্বয় জানবাজি রেখে লড়াই করলেন বখতিয়ার খলজির পাশে দাঁড়িয়ে। বখতিয়ার খলজির দখলে এনে দিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ওদন্তপুর বিহার ও ওদন্তপুর এলাকা।

এই সময় ইওজ খলজি সাহেব এসে সঙ্গী হলেন বখতিয়ারের। শিরান খলজি ভ্রাতৃদ্বয় আর ইওজ খলজিকে পাশে পেয়ে বহুগুণে বেড়ে গেলো বখতিয়ারের বল। তিনি বিপুল বিক্রমে নদীয়া জয় করলেন এবং বাঙ্গালা মুলুকে স্থাপন করলেন বিশাল এক মুসলিম রাজ্য।

বখতিয়ার খলজি বাংলা মুলুকে এসে সুলতান হয়েছেন শুনে খন্নাস আলী মর্দান খলজি পেটের দায়ে এসে কৌশলে বখতিয়ারের বন্ধুত্ব লাভ করলেও, তার সামরিক অবদান তেমন কিছু ছিল না। যা কিছু অবদান সবই ছিল ইওজ খলজি ও শিরান খলজি ভ্রাতৃদ্বয়ের। তবু বখতিয়ার খলজি তাঁর এই তিন ইয়ার (বন্ধু)কেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সমান তিন অংশের শাসনকর্তা বানালেন।

কিন্তু কয়লার ময়লা ধুলেও যায় না। তিব্বত জয়ে গিয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় দেবকোটে ফিরে এলে, দেবকোট এলাকার শাসনকর্তা এই আলী মর্দান খলজি মসনদের লোভে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে মহাউপকারী বন্ধু বখতিয়ার খলজিকে হত্যা করলেন এবং নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা দিলেন।

সুলতান বখতিয়ার খলজি নিহত হওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবেই লাখনৌতির মুসলমান রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। বখতিয়ার খলজির নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়েই দক্ষিণ পশ্চিম ইকতার (প্রশাসনিক এলাকার) শাসনকর্তা শিরান খলজি সাহেব তাঁর অবস্থান নগৌর থেকে দ্রুত দেবকোটে ছুটে

এলেন। প্রথমে তিনি পরলোকগত নেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করলেন ও শোক পালন করলেন। দেবকোটে উপস্থিত খলজি আমীর ও সৈনিকবৃন্দ তাকে নেতা নির্বাচিত করলেন এবং তিনি লাখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি বখতিয়ার খলজির হত্যাকারী আলী মর্দানকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে আলী মর্দানের ইকতা বরসৌল আক্রমণ করলেন এবং আলী মর্দানকে বন্দি করে হাজী বাবা ইস্পাহানী নামক এক কতোয়ালের অধীনে বন্দী রাখলেন।

শিরান খলজি সাহেব অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও সাহসী ছিলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর সেই সাহসিকতার ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ আর একবার পাওয়া গেল। বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া জয়ের পর তিনি (শিরান খলজি) প্রায় তিন দিন নিখোঁজ ছিলেন। অনেক তল্লাশির পর তাকে এক জঙ্গলে পাওয়া গেল। দেখা গেল, সেখানে তিনি একাই ১৮টি হাতী ঘিরে রেখেছেন।

যে যাই হোক, নিজে ন্যায়পরায়ণ ও বীর হলেও লাখনৌতির খলজিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিলেন। কারণ, খলজি নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। প্রত্যেক নেতাই নিজেকে অন্য নেতার চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত বা অন্য নেতার সমকক্ষ মনে করতেন। মোহাম্মদ শিরান খলজি সাহেব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্য শাসন আরম্ভ করলেন। তিনি বখতিয়ার খলজির সময়ের সকল আমিরকে স্ব-স্ব পদে বহাল করলেন এবং এইরূপে খলজি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেন। এমনকি যাঁরা আলী মর্দান খলজির সমর্থক ছিলেন, তিনি তাঁদেরকেও কোন শাস্তি দিলেন না। দিল্লীর সঙ্গেও শিরান খলজি সাহেব বখতিয়ার খলজি সাহেবের নীতি অনুসরণ করলেন। অর্থাৎ প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না, যদিও আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।

মোহাম্মদ শিরান খলজি দক্ষতার সাথে রাজ্য শাসন করলেও আলী মর্দান খলজি হঠাৎ পলায়ন করে লাখনৌতির শান্তি ভঙ্গ করলেন। আলী মর্দান কতোয়াল হাজী বাবাকে বশীভূত করে পলায়ণ করতে সক্ষম হলেন এবং সোজা দিল্লী গিয়ে সুলতান কুতুব-উদ্দীন আইবকের শরণাপন্ন হলেন। কুতুব-উদ্দীনের আশ্রয়ে গিয়ে তিনি কুতুব-উদ্দীনকে লাখনৌতি আক্রমণ করার জন্যে প্ররোচিত করলেন। কুতুব-উদ্দীনও হয়তো সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি অযোধ্যার গভর্নর কায়েমাজ রুমীকে লাখনৌতি আক্রমণ করে লাখনৌতির

খলজি আমীরদের বিরোধ মীমাংসা করার এবং প্রত্যেক আমিরকে স্ব স্ব ইকতায় বহাল করার আদেশ দিলেন। কায়েমাজ রুমী আদেশ পালনে, তথা লাখনৌতি আক্রমণে যাত্রা করলে বখতিয়ার খলজির আমীর ইওজ খলজি বিনাযুদ্ধে কায়েমাজ রুমীর নিকট আত্মসমর্পণ করলেন।

খলজি আমীরদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মোহাম্মদ শিরান খলজি এমনিতেই দুর্বল ছিলেন। তদুপরি তার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তরক্ষী হুসামউদ্দীন ইওজ খলজি বিনা-যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করায় রুমীর সঙ্গে যুদ্ধ করা নিরর্থক মনে করে। অর্থাৎ এই সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা অর্থহীন মনে করে তিনি দেবকোট ছেড়ে উত্তর-পূর্ব দিকে সরে পড়লেন। কায়েমাজ রুমী বিনাযুদ্ধে দেবকোট দখল করলেন এবং হুসামউদ্দীন ইওজ খলজিকে দেবকোটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে অযোধ্যার পথে যাত্রা করলেন। কায়েমাজ রুমী ফিরে গেল দেখে, শিরান খলজি পুনরায় সসৈন্য দেবকোটে ফিরে এলেন এবং হুসামউদ্দীন খলজি সাহেবকে আক্রমণ করলেন। কায়েমাজ রুমী এই খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি দেবকোটে ফিরে এলেন এবং পলায়নের পূর্বেই শিরান খলজিকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে শিরান খলজি সাহেব পরাজিত হয়ে মাসেদা-সন্তোষের দিকে পলায়ন করলেন।

শিরান খলজি সাহেব তবু নিষ্ক্রীয় থাকেননি। দেবকোট থেকে পালিয়ে এসে পার্শ্ববর্তী হিন্দু এলাকা জয় করে একটি স্বাধীনরাজ্য গঠনের চেষ্টা করলেন আর এইরূপ চেষ্টা করার কালে কোন একটি সংঘর্ষে তিনি নিহত হলেন। আত্রাই (আত্রেয়ী) নদীর তীরে অবস্থিত সন্তোষে মোহাম্মদ শিরান খলজি সাহেব সমাহিত আছেন।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব এই পর্যন্ত বলতেই পার্শ্ববর্তী মসজিদ থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে এলো। তিনি চমকে উঠে বললেন– এই রে! রাত শেষ হয়ে গেছে। চলো চলো, ফজরের নামায আদায় করবে, চলো...! বলেই তিনি দ্রুতপদে রওনা হলেন। তা দেখে সেলিনা বানু আর সেলিম মালিকও নামাযের উদ্দেশ্যে ধড়মড় করে উঠে পড়লো।

অযু নামায অন্তে নাশতা নিয়ে সেলিম মালিকের ঘরে এলো সেলিনা বানু। সেলিম মালিক নামায পড়তে মসজিদে গিয়েছিল। মসজিদে নামায অন্তে দোয়া-আসকার হয়। মুনাজাত হয় আর একবার। এসব সেরে সেলিম

মালিকের ঘরে ফিরতে দেরি হবে বিবেচনায় সেলিনা বানু অনেকখানি দেরি করে সেলিম মালিকের নাশতা নিয়ে এলো। এখন প্রায় দিনই ঝি-চাকরানীর পরিবর্তে সেলিম মালিকের নাশতাটা সেলিনা বানু নিজে নিয়ে আসে। সে সেলিম মালিকের খেদমত করতে চায়। আজও তাই এলো। এসে দেখে ঘর ফাঁকা। সেলিম মালিক নেই।

তাজ্জব হলো সেলিনা বানু। বেলাটা নাশতার ওয়াক্ত ছাড়িয়ে গেছে। সেলিনা বানু ভাবতে লাগলো, তবু সেলিম মালিকের ঘরে না ফেরার হেতুটা কি? মসজিদ থেকেই কি সেলিম মালিক তাহলে এখনো ফেরেনি? নাকি ঘরে ফিরে নাশতার আনযাম না দেখে বাইরে গেছে নাশতা করতে? ছিঃ-ছিঃ, ছিঃ! তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তো বড় লজ্জার কথা! নাশতা দেয়ার ভার ঝিয়ের হাতে থাকলে, অনেক আগেই নাশতা নিয়ে আসতো সে। তার নিজের গাফিলতির জন্যেই কি এই অঘটনটা ঘটলো?

নাশতা-পানি খাবার টেবিলে রেখে পাশের এক চেয়ারে হতাশ হয়ে বসে পড়লো সেলিনা বানু। ঘটনাটা জানার জন্যে সে ওখানেই বসে রইলো গুম হয়ে।

অবশেষে ফিরে এলো সেলিম মালিক। ফিরে এলো বেশ কিছুটা দেরিতে। ঘরে ফিরে সেলিনা বানুকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে সেলিম মালিক অপ্রতিভ হলো। ব্যস্তকণ্ঠে বললো– আরে-আরে! তুমি এভাবে বসে আছো যে!

সেলিনা বানু মলিনকণ্ঠে বললো– নাশতাটা কি হয়ে গেছে?

সেলিম মালিক বিস্মিতকণ্ঠে বললো– নাশতা হয়ে গেছে মানে? কোথায় হবে নাশতা?

বাইরে। সেই জন্যেই তো বাইরে গিয়েছিলেন।

: কি যে বলো! নাশতা করতে বাইরে যাবো কেন?

তাহলে এতক্ষণ ছিলেন কোথায়?

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে একদম ঝিলের ধারে গিয়েছিলাম।

তাতেই কি ফিরতে এত দেরী হলো?

না-না, তা হতো না। হঠাৎ এক ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম তো, তাই এত দেরি

হলো। উটকো ফ্যাসাদ।

: উটকো ফ্যাসাদ! কি ফ্যাসাদ?

বুঝিয়ে বলতে দেরি হবে। কিন্তু ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে। আগে কিছু মুখে দেয়া দরকার।

দরকার? তো আসুন, এই খাবার টেবিলে বসুন। দিচ্ছি খাবার। যেমন পীর তেমন ক্ষীর।

অর্থাৎ?

নাশতা নিয়ে সেই কখন থেকে বসে আছি। নাশতা আপনার পানি বরাবর হয়ে গেছে। আরো দেরি করলে বরফ বরাবর হতে মোটেই দেরি হবে না। আসুন- আসুন, বসুন টেবিলে।

সেলিম মালিক খাবার টেবিলে বসলো আর সেলিনা বানু ক্ষিপ্রহস্তে নাশতা-পানি পরিবেশন করতে লাগলো।

নাশতা খাওয়া শেষ করে সেলিম মালিক ঘুরে বসতেই সেলিনা বানু বললো– এবার বলুন তো শুনি, কি সেই উটকো ফ্যাসাদ যার জন্যে ঝিলের ধারে গিয়ে ফিরতে আপনার এত দেরি হলো?

০ ০ ০

ফ্যাসাদটা একটা ফ্যাসাদই বটে। ঝিলের ধারে বেড়াতে গিয়ে সেলিম মালিক নীচে ঝিলের ধার দিয়ে হাঁটছে আর উপরে ঝিলের পাশ দিয়ে রাস্তা বেয়ে ছুটে যাচ্ছে একটা ঘোড়ার গাড়ী। কে বা কারা গাড়ীতে বসে আছে, সেলিম মালিক তা দেখতে যায়নি। এমন সময় হঠাৎ একটা বাউড়ি বাতাস মানে ঘূর্ণিবায়ু পাকাতে পাকাতে এসে ঘোড়ার গাড়ীটার আর সেলিম মালিকের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মূল্যবান ও সুগন্ধি উড়না উড়ে এসে সেলিম মালিকের গলায় পেঁচিয়ে গেল।

এক পলকের ব্যাপার। ঘূর্ণিবায়ুটা তখনই অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু চমকে উঠলো সেলিম মালিক আর থেমে গেল ঘোড়ার গাড়ী। সেলিম মালিক দেখে একটা গদী আঁটা ঘোড়ার গাড়িতে বসে আছে একজন তরুণী আর একজন বৃদ্ধ। তরুণীটি সেলিম মালিকের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছে– এই, এই– ওটা আমার উড়না। উড়নাটা দাও!

 বইঘর ও রোকন

সেলিম মালিক হকচকিয়ে গেল। ধীরে ধীরে সে গাড়ীর দিকে এগুলো। এগুতে এগুতে সে শুনতে পেলো, তরুণীটি বৃদ্ধটিকে বলছে– ওম্মা! দেখো নানু, কি দর্শনধারী নওজোয়ান! কি খাশা তার খুব সুরাত!

বৃদ্ধ হলেও বৃদ্ধটি অত বৃদ্ধ নন। বেশ শক্ত সামর্থ মানুষ। তিনি সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন– তাইতো! বড়ই সুদর্শন নওজোয়ান তো!

উড়না হাতে সেলিম মালিক তখন গাড়ীর কাছে পৌঁছে গেছে। সেলিম মালিককে উদ্দেশ্য করে বৃদ্ধটি সহাস্যে বললেন– আরে এই নওজোয়ান! মেয়ে ছেলের উড়না তোমার হাতে গেল কি করে?

সেলিম মালিক বললো– বাতাসে। বাউড়ি বাতাসে উড়ে গিয়ে এটা আমার গলায় পেঁচিয়ে গেল।

বৃদ্ধটি বললেন– তাই? আমি তো লক্ষ্য করিনি সেটা! পাক দিয়ে এক পাঁজা বাতাস দ্রুত বেগে চলে গেল, দেখলাম। কিন্তু ওটা তোমার গলায় গেল, আমি তো তা লক্ষ্য করিনি?

এবার মেয়েটি মৃদু হেসে বললো– কি করে লক্ষ্য করবে নানাজান? এক লহমার ব্যাপার। যে শক্ত বাতাস আর ধুলোবালি! আমি বুঝে ওঠার আগেই ওটা উেড়ে গেল আমার গলা থেকে। তুমি তা লক্ষ্য কর্রবে কি করে?

বৃদ্ধটি এবার তরুণীটিকে নীচুকণ্ঠে বললেন– তাই কি? তোমার উড়নাটা বুঝি মন্ত্রপূতঃ, মানে মন্ত্রপড়া উড়না?

কেন- কেন?

যারপর নেই সুন্দর দেখেই উড়নাটা উড়ে গিয়ে নওজোয়ানটিকে বেঁধে আনলো তোমার জন্যে!

ধ্যাৎ!

বৃদ্ধ এবার শব্দ করে হেসে উঠলেন। সেলিম মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন– এই ছেলে, চেহারা খানাতো বানিয়েছো কচি মেয়েদের মাথা চিবিয়ে খাওয়ার মতোই। নামটা কি তোমার?

লজ্জা পেলো সেলিম মালিক। নতমস্তকে বললো– সেলিম মালিক। সেলিম খলজি।

থাকো কোথায়?

সুলতান বাহাদুরের উজির শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেবের বাসায়।

এ্যা! শাহাবুদ্দীন সাহেবের বাসায়? ওখানেই কি তুমি বরাবর থাকো?

জি-না, বরাবর থাকিনে। এই কয়দিন আগে আমি ওখানে এসেছি।

কেন, কেন? ওখানে এসেছো কেন?

সুলতান বাহাদুর আমাকে আহ্বান করে এনেছেন।

ওরে বাপরে! খোদ সুলতান বাহাদুর আহ্বান করে এনেছেন? কেন- কেন? কেন আহ্বান করে এনেছেন?

উনার সেনাবাহিনীতে কাজ করার জন্যে।

সেনাবাহিনীতে! তুমি কি একজন সৈনিক? মানে যোদ্ধা?

জি। ও বিদ্যাটা কিছু কিছু রপ্ত করা আছে।

বৃদ্ধটি ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– সর্বনাশ! খোদ সুলতানের দাওয়াত করে আনা লোককে আমরা এতক্ষণ গাড়ীর নীচে দাঁড় করে রেখে কথা বলছি। কি বদনসীব! আসুন- আসুন, এই গাড়ীতে উঠে আসুন! গাড়ীতে জায়গা আছে, আপনি উঠে বসে কথা বলুন।

সেলিম মালিক স্মিতহাস্যে বললো– আপনি নয়, তুমি বলুন। আপনি আমার দাদা-বয়সী লোক।

বৃদ্ধটি বললেন– ঠিক- ঠিক, ঠিক বলেছো! তুমি গাড়ীতে উঠে বসো।

সেলিম মালিক বললো– জি না- জি-না, আমার সময় নেই। তরুণীটি বললো– সময় নেই কেন? আপনি এত বড় একজন লোক। পরিচয় পেয়ে রাস্তা থেকেই ছেড়ে দেবো? আমাদের বাসায় যাবেন, চলুন। এখন নাশতা করার সময়। কিছু নাশতা পানি মুখে দিয়ে তবে আপনি যাবেন।

প্রবল আপত্তি তুলে সেলিম মালিক বললো– না- না, সেটা হয় না।

তরুণী এবার শক্তকণ্ঠে বললো– কেন হয় না? হতে পারেন আপনি একজন সুলতানের লোক, কিন্তু আমার এই নানাজানও একজন ফেলনা লোক নন। উনিও সুলতান বাহাদুরের একজন কর্মচারী। পদস্থ কর্মচারী।

এ কথায় সেলিম মালিক সোচ্চারকণ্ঠে বললো– এ্যাঁ! উনি সুলতানের পদস্থ কর্মচারী? কোথায় থাকেন?

আপনাদের ঐ এলাকাতেই। অতটা উন্নত বাসা না হলেও, আমাদের বাসাও ঐ এলাকাতেই। কয়দিন হলো এসেছেন আর সুলতানের হিসাব-রক্ষক

হাফিজ আহম্মাদের নাম শুনেন নি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও রকম একটা নামের কথা কয়েকবার শুনেছি।

শুনতেই হবে। টাকা পয়সার প্রয়োজন সকলেরই আছে। কোষাধ্যক্ষের পরেই আমার এই নানাজানের স্থান। বেতনাদি এই নানাজানের হাত দিয়েই দেয়া-নেয়া হয়।

ও, আচ্ছা- আচ্ছা!

আসুন- আসুন, উঠে আসুন। আমাদের বাসায় নাশতা-পানি করে তারপর আপনি যাবেন। এখন আপনাকে ছাড়ছে কে?

: না- না, তা সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়? মানে...

হুকুম নিয়ে আসিনি, দেরি হবে- এ কথা জানিয়ে আসিনি।

: কাকে জানিয়ে আসেননি?

উজির সাহেবের কন্যা সেলিনা বানু বেগম সাহেবাকে।

গালে হাত দিয়ে তরুণীটি বললো- মা-শা-আল্লাহ!

ঐ পরমা সুন্দরী নওজোয়ানীর সাথে তাহলে পরিচয়টা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে?

: জি গেছে। উনিই আমার দেখভাল করেন। আপনি তাকে চেনেন?

চিনবো না কেন? অনেক মেয়েই ওকে চেনে। আমিও তাকে চিনি, সেও আমাকে চেনে।

: তাই নাকি?

জি। বলবেন, হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদের নাতনী ফারজানা বেগম আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমার নাম শুনলে ও আর কিছু বলবে না।

না বলুন, তবু আমি তাঁকে না জানিয়ে আপনাদের সাথে যেতে পারবো না। উনি আমার নাশতা নিয়ে বসে থাকবেন।

তার মানে?

আপনার উড়নাটা নিন। আমি আর দেরি করতে পারবো না। বলেই উড়নাটা ফারজানার হাতে ফেলে দিলো সেলিম মালিক। ফারজানা বেগম না-খোশ কণ্ঠে বললো- বটে! এতটাই টান?

মানে?

এ টান শেষ পর্যন্ত টিকবে তো? কত তা-বড়ো তা-বড়ো লোক আপনার আগে থেকেই কাতার বেঁধে বসে আছেন!

তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আল্লাহ হাফেজ! এর পর হাফিজ আহম্মাদ সাহেবকে লক্ষ্য করে সেলিম মালিক বললো– আসসালামু আলাইকুম মুরব্বী! আমার বেয়াদবী নেবেন না। –বলেই সেলিম মালিক ঘুরে উল্টা পথ ধরলো।

০ ০ ০

সেলিনা বানুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে খাবার টেবিলে বসে থেকে সেলিম মালিক এসব কথাই ভাবছিল। সেলিনা বানু ফের প্রশ্ন করলো– কি হলো, বেড়াতে গিয়ে কি সে উটকো ঝামেলা ঘটলো যে, ফিরতে এত দেরি হলো?

হুঁশে এসে সেলিম মালিক বললো– জি?

সেলিনা বানু বললো– হুঁশ-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছেন নাকি? কি সে ঘটনা?

সেলিম মালিক এবার সংক্ষেপে ঘটনাটা বর্ণনা করে শুনালো। শেষে বললো– মেয়েটা আমার কথায় নাখোশ হলো অনেকটাই। তবু তোমার কথা চিন্তা করে আমি চলে এলাম ওদের আহ্বান উপেক্ষা করে। তুমি আমার নাশতা নিয়ে বসে আছো, এটা তো আমি ঠিকই ভেবেছি।

দম ধরে থেকে সেলিনা বানু বেগম তামাম কথা শুনলো। পরে দম ছেড়ে বললো– ঐ ফারজানা বেগমও কম সুন্দরী নয়। তার আহ্বান আপনি ইনকার করে চলে এলেন? মানে, আসতে পারলেন? ও রকম একটা সুন্দর মুখের ডাক–

সেলিম মালিক রুষ্টকণ্ঠে বললো– কোন সুন্দর মুখ দেখার গরজ আমার নেই। আমার যা কর্তব্য, তাই আমি করেছি। –বলেই সে ঝটকা মেরে উঠে গেল চেয়ার থেকে। খিল খিল করে হেসে উঠলো সেলিনা বানু বেগম।

নাশতা খাওয়ার ঘণ্টা খানেক পরই চলে এলো হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদের নাতনী ফারজানা বেগম। সেলিনা বানু ও সেলিম মালিক দহলিজে বসে কথাবার্তা বলছিলো, এই সময় চলে এলো ফারজানা বেগম। দহলিজে

দু'জনকে এক সাথে দেখেই ফারজানা বেগম কৌতুকভরে বললো– যাব্-বাবা। মানিক জোড়কে এক সাথেই পেয়ে গেলাম! আচ্ছা গাঁথাই এরা গেঁথে গেছে দুইজন। টানতে যেন খসা নেই।

ফারজানাকে দেখে সেলিনা বানু বললো– এ কি! তুমি হঠাৎ?

ফারজানা বেগম বললো– হঠাৎই এলাম। এলাম মানে, না এসে পারলাম না।

অর্থাৎ?

সুলতানের আমন্ত্রিত এই সৈনিককে তুমি ইতোমধ্যেই এমন বশ করে ফেলেছো যে, তোমার বিনে হুকুমে এর এক পাও এদিক ওদিক যাওয়ার উপায় নেই। এতটাই বাধ্য করে ফেলেছো একে?

কথাটা কিন্তু পরিষ্কার হলো না আমার কাছে!

পরিষ্কার করে না বললে পরিষ্কার হবে কি করে? বলছি শুনো! আজ সকালে ঝিলের ধারের রাস্তা দিয়ে যেতেই ইনার সাথে দেখা। পরিচয় পেয়ে, মানে সুলতানের আমন্ত্রিত লোক জেনে, ইনাকে বাসায় নিয়ে গিয়ে একটু নাশতা-পানি খাওয়াতে চাইলাম। কিন্তু সরাসরি বেঁকে বসলেন উনি। মাথা কাটা না-জবাব দিয়ে বসলেন।

তাই নাকি?

বিলকুল তাই। প্রথমে ভাবলাম, আমরা নিম্নপর্যায়ের লোক মনে করে উনি আমাদের ইনকার করছেন। কিন্তু পরে দেখলাম, কোন ইনকার অহংকার দিলে উনার নেই। দিলটা উনার সাফ। শুধু তোমার হুকুম না নেয়ার জন্যেই যেতে উনি পারলেন না!

আমার হুকুম?

হ্যাঁ। তাঁকে এতটাই কব্জা করে ফেলেছো যে, তোমার হুকুম ছাড়া উনার কোন দিকেই যাওয়ার উপায় নেই। নসীব গো, নসীব! এমন একটা মানুষকে কি করে যে, এই কয়দিনেই এতটা কব্জা করে ফেললে, তাই ভাবছি। কোন ইসিম কালাম খাটিয়েছো নাকি এর উপর?

জি-না। কোন ইসম কালামের ব্যাপার নয়। চেষ্টা করলে তুমিও এঁকে সহজেই কব্জা করে ফেলতে পারবে। দিলটা এঁর সাদা তো, তাই সাদাদিল দেখলেই ইনি পটে যান। সাদা দিল দেখাও– দেখবে, কেল্লা ফতে।

হেসে বললো সেলিনা বানু। ফারজানা বেগম বললো– তা কি আর হয়রে

ভাই! একজনের পোষা পাখি কি অন্যজনের হাতে যায়? সে জোর কি আমার নসীবের আছে?

বাইরে যাওয়ার জন্যেই সেলিম মালিক তৈরি হয়ে এসেছিল। এদের এ ধরনের কথাবার্তা শুনে শরম পেলো সেলিম মালিক। দ্রুত দাঁড়িয়ে সে সেলিনা বানুকে বললো– আমার কাজ আছে, আমি চললাম–

বলেই সে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল দহলিজ থেকে।

দহলিজ থেকে বেরিয়ে এসে সেলিম মালিক সুলতান ইওজ খলজি বাহাদুরের রাস্তা নির্মাণের খবর নিতে গেলেন। সুলতান বাহাদুর তখন দেবকোটের ঐ দিকে যাওয়ায়, সুলতানের সাক্ষাৎ পেলো না সেলিম মালিক। তবে রাস্তায় কর্মরত শ্রমিক ও কিছু কর্মকর্তার মুখে শুনলো– রাস্তার কাজ পুরোপুরি শেষ হতে এখনও সপ্তাহের অধিককাল সময় লাগবে। তার আগে সুলতান বাহাদুর পুরোপুরি অবসর হতে বা অন্য কাজে যেতে পারবেন না। এতে করে সেলিম মালিক উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে বাসায় ফেরার পথে তার সাক্ষাৎ হলো ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবের সাথে। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব তাকে ডেকে বললেন– এখনই বাসায় ফিরে কি করবে ভায়া? তার চেয়ে বরং চলো হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মেদ সাহেবের বাসায় একটু যাই। কিছু পয়সা কড়ি উঠাতে হবে আমাদের বাসার কর্মচারী আর কাজের মেয়েদের বেতন দেয়ার জন্যে। অদূর ভবিষ্যতে তাঁর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন তোমারও হবে। তোমার অধীনে যে সব কর্মচারী খাটবে, তাদের বেতন দিতে হবে তো। চলো, আজই তাঁর সাথে তোমার পরিচয়টা করিয়ে দেই–

হাফিজ আহম্মদ সাহেবের সাথে সেলিম মালিকের পরিচয় সকাল বেলাতেই হয়ে গিয়েছিল। সে ব্যাখ্যায় না গিয়ে সেলিম মালিক নীরবে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবের পেছনে পেছনে হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাসায় এসে হাজির হলো। হাফিজ আহম্মদ সাহেব তাঁর দহলিজেই ছিলেন। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবকে দেখেই হাফিজ আহম্মদ সাহেব দ্রুত সালাম বিনিময় করে, খোশকণ্ঠে বললেন– আরে এই যে ভাই সাহেব! প্রায় পাশাপাশি বাসা অথচ এতদিন পরে আপনি আমার বাসায় এলেন? ঘরে বসে সারাদিন করেন কি? মাঝে মাঝে এলে তো দুই বুড়ো বসে কিছু গল্প-আলাপ করা যায়।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– আসার ইচ্ছে তো হয়। কিন্তু আমি অনেকটা অবসর মানুষ হলেও, আপনি তো অবসর মানুষ নন। বিরাট কাজের

মানুষ। আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে বিবেচনায় আসতে পারিনি।

হাফিজ সাহেব বললেন– আরে-আরে, কাজ তো কমবেশি সবারই থাকবে। তাই বলে কি কাজের কাছে সব সময় জীবনটা বাঁধা দিয়ে রাখতে হবে? হাঁফ ছাড়ার সময়টা বের করে নিতে হবে না! আসুন- আসুন, বসুন। কিছু পয়সা-কড়ি চাই নিশ্চয়ই?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব সহাস্যে বললেন– সে তো বটেই। একেবারেই বিনে উদ্দেশ্যে কি হয়ে উঠে আসাটা?

এতক্ষণে সেলিম মালিকের উপর নজর পড়লো হাফিজ আহম্মদ সাহেবের। তিনি বিপুল উল্লাসে বলে উঠলেন– এ কি! এ যে মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি! –বলেই তিনি অন্দরের দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়লেন– ফারজানা! আরে ও ফারজানা বেগম! অন্দরে কি করো? বেরিয়ে এসে দেখো, কে এসেছে?

অন্দর থেকে ফারজানা বেগম উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করলো– কে এসেছে নানাজান?

হাফিজ আহম্মদ সাহেব বললেন– সেই লোক, সেই নওজোয়ান! সকালে যাকে সাধাসাধি করে আমাদের বাসায় আনা যায়নি। সে এখন স্বইচ্ছায় এসে হাজির। অর্থাৎ মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

ইয়ারউদ্দীন সাহেব বললেন– সে কি! এর সাথে কি পরিচয় হয়েছে ভাই সাহেবের?

হাফিজ সাহেব বললেন– হয়েছে মানে কি? একেবারে মাখামাখি পরিচয়। আমার নাতনির সাথেও ঐ রকম পরিচয় হয়েছে এর।

সামান্য একটু আব্রু করে ফারজানা বেগম বেরিয়ে এসে বললো– কৈ নানাজান, কৈ সে কলের পুতুল মানুষটা? অন্যের হুকুম ছাড়া এক পাও যার নড়ার সাধ্য নেই, কৈ সে পোষাপাখি?

হাফিজ সাহেব বললেন– এই যে এখানে। মনে হয়, অন্যের বিনে হুকুমেই এসেছে। সে হিসেব তুমি নাও, এই ফাঁকে আমরা হাতের কাজটুকু সারি।

এই বলে তিনি ইয়ারউদ্দীন সাহেবকে বললেন– আসুন ভাই সাহেব! আমরা লেনদেনের কাজটা জলদি জলদি সেরে ফেলি এই ফাঁকে।

ইয়ারউদ্দীন সাহেবকে নিয়ে হাফিজ সাহেব তার দপ্তর কক্ষে ঢুকলেন। সেলিম মালিকের দিকে আঁড়চোখে চেয়ে ফারজানা বেগম বললো– তা সাহেব! এখন এই যে সরাসরি আমাদের বাসায় চলে এসেছেন। এজন্যে কোন হুকুম

নিয়েছেন সেলিনা বানুর?

সেলিম মালিক জড়িতকণ্ঠে বললো– না, মানে এখানে আসবো এ রকম কোন ইরাদা আগে থেকেই ছিল না তো, তাই কোন হুকুম নেয়া হয়নি।

ফারজানা বেগম বললো– তা-হলে?

সেলিম মালিক বললো– তাহলে ব্যাপারটা খুব নাজুকই হয়ে গেল। উনি জানলে খানিকটা নাখোশই হবেন।

নাখোশ হবেন?

হতেই পারেন। বিশেষ করে অন্য কোন উড়তি বয়সের মেয়ের সান্নিধ্যে আমি আসবো আর উনি জানবেন না, এটা কি হয়? ভাববেন, উনার অগোচরে, মানে উনাকে লুকিয়ে আমি এসেছি।

তাতে কি হবে?

আর কিছু না হোক, আমার গুনাহ হবে। উনি আমার দেখভাল করেন। আমার খুবই যত্ন নেন। যেমনই সৎ তেমনই খোলা মনের মানুষ। উনার সাথে লুকোচুরি করা আমার মোটেই শোভা পায় না।

ফারজানা বেগম কপট গাম্ভীর্যের সাথে বললো– আর আমি যদি তাকে বলে দিই?

সেলিম মালিক উদাসকণ্ঠে বললো– তা আপনি বলতেই পারেন। আপনাকে তো আমি নিষেধ করতে পারিনে।

'আপনি' নয় 'তুমি'। সেলিনাকে তো আপনি 'তুমিই' বলেন।

তা বলি। সে আমার বয়সে ছোট। কিন্তু

কিন্তু নয়। আমাকেও 'তুমি'ই বলবেন। আমিও আপনার বয়সে ছোট। বড় নই।

www.boighar.com

সেই ভাল। সেইটেই ভাল শুনায়।

বেশ। এখন বলুন তো, আপনি আমাকে নিষেধ করতে পারেন না কেন? মানে, আমাদের এখানে আসার কথা সেলিনাকে বলতে আপনি নিষেধ করতে পারেন না কেন?

ওতে ঈমানদারির বরখেলাপ হয়।

তাহলে উপায়?

উপায় আর কি? উনি যা ভাবেন, ভাববেন। আমার করার কিছু নেই। 'বিশ্বাসের ঘরে চুরি' ভাবলেও আমি কি করবো।

ফারজানা বেগম এবার সশব্দে হেসে উঠে বললো– ভয় নেই, ভয় নেই। আপনি হুকুম নিয়ে না এলেও, আমি সে হুকুম নিয়ে নিয়েছি। আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন, তখন যে নাশতা-পানি করেননি সেই নাশতা-পানি করবেন, চুটিয়ে আমার সাথে গল্প-আলাপ চালাবেন– আর বাধা নেই। ঢালাওভাবে সে হুকুম দিয়ে দিয়েছে সেলিনা বানু।

সেলিম মালিক হৃষ্টচিত্তে বললো– তাই?

ফারজানা বেগম বললো– একদম তাই। এ বেলা আর এখান থেকে যাওয়া নেই আপনাদের।

মানে?

মানে আপনারা প্রথমে নাশতা-পানি করবেন, পরে দিনের খানা খাবেন, আরাম বিরাম নেবেন, তারপর সাঁঝের ওয়াক্তে বাসায় ফিরে যাবেন।

পাগল! কি যে বলো!

এই সময় হাফিজ আহম্মদ সাহেব আর ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব সেখানে ফিরে এলেন। সেলিম মালিকের কথা শুনে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– পাগল মানে? কি বলছে মেয়েটা?

সেলিম মালিক বললো– বলছে, এখন আমাদের ছাড়া নেই। আমরা এখানে নাশতা খাবো, দিনের খানা খাবো, বিশ্রাম নেবো, তারপর সাঁঝ ওয়াক্তে ছাড়া পাবো।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব হেসে বললেন– ঠিকই তো পাগল! কি যে বলে–

প্রবল বাধা দিয়ে হাফিজ আহম্মদ সাহেব জোরকণ্ঠে বললেন– না-না, পাগল নয়, পাগল নয়। আমার নাতনী যা বলেছে, ঐটেই কায়েমী কথা। সাঁঝের আগে আজ আপনাদের ছাড়া নেই।

শুরু হলো রশি টানাটানি। ফারজানা বেগম ও হাফিজ আহম্মদ সাহেব থাকার জন্যে, আর সেলিম মালিক ও ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব চলে আসার জন্যে পীড়াপীড়ি জুড়ে দিলেন। শেষ অবধি হেরে গেলেন ইয়ারউদ্দীন সাহেবেরা। নিরুপায় হয়ে তারা অন্দরমহলে গেলেন। অসময়ে ফারজানা বেগম পরিবেশিত নাশতা-পানি খেলেন এবং তার পরে ছাড়া পেলেন।

৩

এশার নামায অন্তে যথা সময়ে চলে এলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব। সেলিনা বানু ও সেলিম মালিক তাঁর অপেক্ষাতেই ছিল। এসেই তিনি সরাসরি বললেন– গতকাল বখতিয়ার খলজি সাহেবের এক ইয়ার ঈজ্জউদ্দীন মোহাম্মদ শিরান খলজি সাহেবের কথা বলেছি। আজ বলবো তাঁর আর এক ইয়ার আলী মর্দান (আলাউদ্দীন) খলজির কথা। আজ তাঁর কথা শুনো!

সেলিনা বানু বেগম বললো– জি দাদু, সে কথা তো অবশ্যই শুনবো। কিন্তু তার আগে একটু বলুন তো, আপনার এই নয়া নাতীকে নিয়ে আজ কোথায় গিয়েছিলেন আর কোথায় আপনারা কি খেয়ে এসেছিলেন?

স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে বাধা পড়ায় ইয়ারউদ্দীন সাহেব থমকে গিয়ে বললেন– কেন, এর মধ্যে আবার সে কথা আনছো কেন?

সেলিনা বানু বললো– আনছি এই কারণে যে, আজ দিনের খানা ইনি কিছুই খেতে পারেননি। বলছেন, দাদুর সাথে আজ এক জায়গায় গিয়ে অসময়ে অনেক নাশতা খেয়ে এসেছি। মোটেই এখন ক্ষুধা নেই। কোথায় গিয়েছিলেন, বলুন তো?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব নাখোশকণ্ঠে বললেন– আরে দুর! এর মধ্যে আবার সে কথা কেন? এক কথার মধ্যে আর এক কথা আনলে, আসল কথাটাই গোলমেলে হয়ে যাবে।

সেলিনা বানুও হকচকিয়ে গিয়ে বললো– দাদু!

ইয়ারউদ্দীন সাহেব বললেন– সে কথাটা পরে শুনলেও চলবে। ওটা এমন কোন গরুত্বপূর্ণ কথা নয়।

জি আচ্ছা দাদু, ও কথা থাক। ওটা পরে শুনবো।

হ্যাঁ, তাই শুনো। এখন যে কথা শুনতে তোমরা এত বেশি আগ্রহী, সেই কথা শুনো। এখন আলী মর্দান খলজির কথা শুনো–

আলী মর্দান (আলাউদ্দীন) খলজির কথা

আলী মর্দান খলজি এবং হুসামউদ্দীন ইওজ খলজি সাহেব বখতিয়ার খলজি সাহেবের বাল্যকালের বন্ধু। হুসামউদ্দীন ইওজ খলজি সাহেব ছিলেন অত্যন্ত ঈমানদার ব্যক্তি এবং বখতিয়ার খলজি সাহেবের অন্তরঙ্গ ও পকৃত বন্ধু। কিন্তু আলী মর্দান খলজি ছিলেন জন্মগতভাবেই একজন খন্নাস লোক এবং বখতিয়ার খলজির খল বন্ধু। একই স্থানে জন্ম আর একই সম্প্রদায়ের লোক হেতু আলী মর্দান বখতিয়ার খলজির বন্ধুত্ব লাভ করেন আর বখতিয়ার খলজির পাশে পাশেই থাকেন। কিন্তু খন্নাস লোক হওয়ায় আলী মর্দান খলজি বখতিয়ার খলজির সাহস বীরত্ব ও গুণাবলীর প্রশংসা করার পরিবর্তে উপহাস ও বিদ্রূপ করেছেন সব সময়।

বখতিয়ার খলজি সাহেব হাতীর পদতলে পিষ্ট হওয়া থেকে বর্তমানে আজমীরের দেওয়ান ও তৎকালীন গজনীর আরিজ-কন্যার প্রাণ রক্ষা করেন। আলী মর্দান খলজি নিজ চোখে তা দেখেন এবং সেই সাথে আরিজ-কন্যা প্রতিদান স্বরূপ বখতিয়ার খলজি সাহেবকে হাতের অঙ্গুরীয় (আংটি) খুলে দেয়াও তিনি স্বচক্ষে দেখেন। এছাড়াও আরিজ-কন্যা কর্তৃক বখতিয়ার খলজি সাহেবকে অনেক ধনরত্ন দিতে চাওয়া এবং শেষ অবধি একটা ভাল নকরী দেয়ার প্রতিশ্রুতির কথাবার্তাও আলী মর্দান খলজি অদূরে দাঁড়িয়ে শুনেন। এসব দেখে ও শুনে আলী মর্দান খলজি হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরেন এবং গায়ের জ্বালা মেটানোর জন্যে এসব নিয়ে সব সময়ই বখতিয়ার খলজিকে উপহাস ও বিদ্রুপ বানে জর্জরিত করেন।

ইওজ খলজি সাহেব তখন একজন গাধাওয়ালা। হতদরিদ্র মানুষ। গাধার পিঠে করে মাল টেনে তিনি সংসার চালান। কোনদিন দুই বেলার আহার জোটে, কোনদিন এক বেলারও জোটে না। বিবি-বাচ্চা নিয়ে তিনি অনাহারে থাকেন। অনেক সময় দিনের পর দিন কেটে যায় অনাহারে। এ অবস্থায় একদিন মাল টেনে ন্যায্য মজুরীর অতিরিক্ত অনেক বখশিশ পেলেন ইওজ খলজি সাহেব। রৌদ্রের তীব্র তাপের মধ্যে অনেক দূর থেকে মাল টেনে এনে তিনি ক্ষুৎপিপাসায় কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের জন্মস্থান গরমশিরের কাছাকাছি এক সরাইয়ে উঠে তিনি বকশিশের পয়সা দিয়ে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু দরিদ্র হলেও তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ লোক। খাবার সংস্থান হলেই তিনি মেহমান ডেকে আনতেন এবং মেহমানসহ

বিবি-বাচ্চাদের নিয়ে আহার করতেন।

সেদিন মোটা বকশিশ পাওয়ায় বিবি-বাচ্চাদের ভালভাবে আহারের জন্যে পুরো মজুরিটা এবং বকশিশের কিছু অংশ আলাদা করে রাখার পরও তাঁর হাতে যে পয়সা রইলো, তা দিয়ে তিনি দেখলেন, কমপক্ষে দুইজন লোকের ভরপেট আহার হবে। কিন্তু তিনি একা। তাই দস্তরখানায় বসার আগে তিনি অভুক্ত মেহমান খুঁজতে বেরোলেন। বেরিয়েই তিনি দেখলেন, তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়বন্ধু বখতিয়ার বিনি পয়সায় অন্যের বেগার খেটে ক্লান্ত হয়ে গেছেন এবং ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতে ঐ সরাইয়ের সেরেফ পানি খেতে এসেছেন।

আর যায় কোথায়? বখতিয়ার সাহেবের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ইওজ খলজি সাহেব বখতিয়ার খলজি সাহেবকে ধরে এনে দস্তরখানায় বসালেন এবং দুই দোস্ত খানা খেলেন পেটপুরে। অতঃপর আরাম বিরাম নিয়ে গাধাসহ সরাই থেকে বেরিয়ে দুই বন্ধু বাসায় ফিরে যেতেই পথে হঠাৎ সামনে পড়লো আলী মর্দান খলজি। ব্যস, শুরু হলো আলী মর্দানের খন্নাসপনা আর বিদ্রুপ। তিনি ইওজ খলজি সাহেবকে উদ্দেশ্য করে তৎক্ষণাৎ আওয়াজ দিয়ে উঠলেন– কেয়া গজব! আরে ইওজ, খোদ সাহেবজাদাকে এইভাবে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছ তুমি? গুনাহগার আর বলে কাকে? শিগগির শিগগির গাধার পিঠে তুলে নাও!

ইওজ খলজি সাহেব ঘাবড়ে গিয়ে বললেন– সাহেবজাদা!

আলী মর্দান বললো- জরুর।

সাহেবজাদা কোথায় দেখলে তুমি?

ঐ তো নাক বরাবর।

মানে?

আরে আমাদের এই বখতিয়ার আর বখতিয়ার আছে ভেবেছো? এখন তো সে বিলকুল এক সাহেবজাদা। জব্বোর এক সাহেবজাদীর ও তো এখন দিলের মানুষ। জানের জান।

বড় বড় চোখ করে বখতিয়ার সাহেবের দিকে তাকিয়ে ইওজ সাহেব বললেন– কিয়া বাত! মুহব্বত কি পয়গাম?

জবাব দিলেন আলী মর্দান। বললেন– আরে ওসব পয়গাম প্রস্তাব নয়, একদম ফয়সালা। কৈ দেখি বাবা? বিবিজানের দেয়া সেই অঙ্গুরিটা রাখলে কোথায়, দেখি?

 বইঘর ও রোকন

ইওজ সাহেব আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন– অঙ্গুরি! মাশাআল্লাহ! এতদূর?

ফের আলী মর্দান বললেন– তো আর বলছি কি? অঙ্গুরি তো অঙ্গুরি, সোনাদানা হিরে-জহরত, নকরী তকমা– কত কি যে দিতে চাইলেন সাহেবজাদী কিন্তু আমাদের এই শাহানশাহের তবু দিল খোলাসা হলো না।

এ্যাঁ। সে কি!

বুরবকের মতো তামাম কিছুই নাকচ করে দিয়ে সেরেফ বোরকা-ঢাকা মুখখানা হা করে দেখতে লাগলেন। কি খোদাবন্দ, ঠিক বলিনি!

বখতিয়ার সাহেবের মুখের দিকে তিরসা নজরে চেয়ে আলী মর্দান খলজি হাসতে লাগলেন। বখতিয়ার সাহেব মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বলেই চললেন আলী মর্দান– তবু যদি আস্‌লী মুখখানা দেখতে পেতে বাবা, তবু একটা কথা ছিল। মুখের উপর ঝোলানো ঐ বস্ত্রখণ্ড দেখেই সোনাদানা তামাম কিছু নাকচ করে দিলে? আসলী মুখ দেখলে তো ধরে রাখাই যেতো না এই দোস্তকে আমাদের! পরনের কাপড় খুলে বিলকুল নাঙ্গা হয়েই পালকির পেছনে দৌড় দিতো।

এবার প্রচণ্ড শব্দ করে হাসতে লাগলেন আলী মর্দান। বখতিয়ার সাহেব আর বরদাশত্‌ করতে পারলেন না। তিনি গর্জে উঠে বললেন– খামোশ! এই খন্নাসপনা আমার বেজায় না-পছন্দ!

বখতিয়ার সাহেবের চোখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগলো। বখতিয়ার সাহেবকে ভয় পায় না গরমশিরে তাঁর সমবয়সী এমন কেউ ছিল না। আলী মর্দান মস্তানীতে অনেকের চেয়ে অগ্রগামী হলেও বখতিয়ার সাহেবকে তিনি মনে মনে দস্তরমতো ভয় করতেন। স্বগোত্র, অধিকতর মেলামেশা আর সমবয়সীর দাবিতে আলী মর্দান বলতে বলতে তাল হারিয়ে ফেলেছিলেন। বখতিয়ারকে নিয়ে তামাশা করতে গিয়ে তিনি তাঁর খন্নাসপনাই উলঙ্গ করে তুলেছিলেন।

বখতিয়ার সাহেবের ধমক খেয়ে চমকে উঠলেন আলী মর্দান। বখতিয়ারের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলার তামাম সাহস উবে গেল আলী মর্দানের। কিছুটা থতমত করে তিনি খামোশ হয়ে গেলেন।

ইওজ খলজি সাহেব ঘটনাটা জানতেন না। তিনি বখতিয়ার খলজি সাহেবকে প্রশ্ন করলেন– কি ব্যাপার দোস্ত? কি বলতে চায় আলী মর্দান?

সেদিনের ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বখতিয়ার সাহেব বললেন– একটা

নকরীর আশ্বাস তিনি দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু আলী মর্দান তার খন্নাসপনার কারণে তিলকে একদম তাল বানিয়ে ফেলেছে।

শুনে ইওজ খলজি সাহেব উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। বললেন– বলো কি? নকরী? নকরীর আশ্বাস দিয়ে গেছেন? তবু তুমি যাওনি?

ইওজ খলজি সাহেবের তখন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। কিন্তু বখতিয়ার সাহেবের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। তিনি ঠাণ্ডাকণ্ঠে বললেন– না, যাইনি। কারণ, একমাত্র সৈন্য বিভাগ ছাড়া অন্য কোন নকরীই আমার পক্ষে কবুল করা সম্ভব নয়।

সে কি!

তবে ভদ্র মহিলার আব্বা যখন 'আরিজ' তখন ফৌজেই একটা নকরী পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি।

দিশেহারাকণ্ঠে ইওজ খলজি সাহেব বললেন– তাই যদি মনে করো, তাহলে যাওনি কেন এতদিন? আলতু ফালতু ব্যাপার নয়, একটা নকরী বলে কথা। যার তার নসীবে এটা জোটে?

বখতিয়ার সাহেব হেসে বললেন– আরে দোস্ত! কোন আওরাতের দাওয়াতে ব্যস্ত হতে নেই। ওটা বেলেল্লাপনা।

তাই বলে কি যেতেই নেই?

যাবো ভাবছি একদিন। গিয়ে দেখি নসীবটা আমার কতখানি শানদার।

মুখ খোলার মওকা পেলেন আলী মর্দান। এই ফাঁকে তিনি বললেন– দোস্ত, মস্তানই বলো আর খন্নাসই বলো, অবস্থা বড় খারাপ। রুটির বড় কহর পড়েছে দেশ দুনিয়ায়। সুদিন যদি পেয়েই যাও একটা, এই ভুখা-নাঙ্গারা যেন নেক নজরটা না হারায় ইয়ারের।

এমনই আলী মর্দান খলজির চরিত্র। বিপদে পায়ে পড়েন আর সুযোগ পেলেই মাথায় লাথি মারেন। বখতিয়ার খলজি সাহেব বাঙ্গালা মুলুকে এসে সুলতান হয়েছেন শুনে অনাহার-ক্লিষ্ট আলী মর্দান বাঙ্গালা মুলুকে ছুটে আসেন এবং বখতিয়ার খলজি সাহেবের পায়ের তলে পড়েন। বখতিয়ার খলজি সাহেব তাকে তুলে কাছে টেনে নেন এবং বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। কালক্রমে তিনি শিরান ও ইওজ খলজি সাহেবের মর্যাদায় আলী মর্দান খলজিকে অধিষ্ঠিত করেন এবং তাঁদের মতোই একটা প্রশাসনিক এলাকার মুক্তি– অর্থাৎ

বইঘর ও রোকন

প্রশাসক নিয়োগ করেন। অন্য কথায়, তিব্বত অভিযানের আগে বখতিয়ার খলজি সাহেব তার সাম্রাজ্য সমান তিনভাগে ভাগ করেন এবং আলী মর্দানকে এক ভাগ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের তথা দেবকোট এলাকার প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

কিন্তু এতটার পরও বখতিয়ার খলজি সাহেব গুরুতর অসুস্থ হয়ে এসে দেবকোটে আশ্রয় নিলে অকৃতজ্ঞ আলী মর্দান সুযোগ পেয়ে বাঙ্গালার তথা লাখনৌতি রাজ্যের সুলতান হওয়ার লালসায় মরণাপন্ন বখতিয়ার খলজির বুকে ছুরি বসিয়ে দেন এবং অতঃপর দেবকোটের তথা লাখনৌতির মসনদে আরোহণ করেন (১২০৬)।

বখতিয়ার খলজির মৃত্যু তথা হত্যার সংবাদ পেয়ে বখতিয়ার খলজির অন্যতম প্রধান অমাত্য মোহাম্মদ শিরান খলজি লখনৌর (নগৌর) হতে তাড়াতাড়ি দেবকোটে ছুটে আসেন এবং বখতিয়ার সাহেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের পর দেবকোটের খলজি আমীরগণ ও সৈনিকবৃন্দ কর্তৃক নেতা নির্বাচিত হয়ে শাসনভার গ্রহণ করেন। অতঃপর শিরান খলজি সাহেব তাঁর প্রভু বখতিয়ার খলজির হত্যাকারী আলী মর্দানকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে আলী মর্দানের ইক্‌তা বরসৌল আক্রমণ করেন এবং আলী মর্দানকে বন্দি করে হাজী বাবা ইস্পাহানী নামক একজন কতোয়ালের অধীনে বন্দি রাখেন।

কিন্তু আলী মর্দান খলজি নিশ্চেষ্ট থাকার লোক নন। কতোয়াল আলী বাবা ইস্পাহানীকে বশীভূত করে তিনি পলায়ন করতে সক্ষম হন এবং সোজা দিল্লী গিয়ে সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেকের শরণাপন্ন হন। সেখানে গিয়ে আলী মর্দান খলজি কুতুবউদ্দীনকে লাখনৌতি আক্রমণ করার জন্যে প্ররোচিত করেন। কুতুবউদ্দীনও হয়তো এই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি আলী মর্দানকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন। কারণ, আলী মর্দান অত্যন্ত সাহসী ছিলেন এবং নিজের কৃতিত্ব জাহির করতেও তিনি অত্যন্ত পটু ছিলেন। আলী মর্দান সুখে-দুঃখে কুতুবউদ্দীনকে সাহস দান করেন।

১২০৮ খৃষ্টাব্দে গজনীর শাসনকর্তা তাজউদ্দীন এল্‌দাজ লাহোর আক্রমণ করলে কুতুবউদ্দীন তাঁকে বাধা দেন এবং তাজউদ্দীনকে পরাজিত করে গজনী অধিকার করেন। আলী মর্দানও কুতুবউদ্দীনের সঙ্গে লাহোর যান এবং লাহোর হতে গজনী যান। কিন্তু গজনীতে কুতুবউদ্দীনের রাজত্ব মাত্র ৪০ দিন স্থায়ী থাকে। এরপর তিনি তাজউদ্দীনের চক্রান্তে গজনী ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। ঘটনাচক্রে আলী মর্দান কুতুবউদ্দীনের সাথে পালাতে

সক্ষম না হওয়ায় তাজউদ্দীন কর্তৃক ধৃত হন এবং গজনীতে আটকা পড়েন। কিন্তু এতে আলী মর্দানের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হলো না, শুধু প্রভু বদল হলো। কারণ আলী মর্দান তৎক্ষণাৎ তাজউদ্দীনকে প্রভু বলে বরণ করে নেন এবং তাকে ভীষণ ভক্তি শ্রদ্ধা করতে শুরু করেন। এতে করে তাজউদ্দীনও আলীমর্দানকে প্রীতির চোখে দেখতে থাকেন।

গজনীতে সালার জাফর নামক একজন খলজি আমিরের সঙ্গে আলী মর্দানের বন্ধুত্ব হয়। একদিন আলী মর্দান ও সালার জাফর তাজউদ্দীন এলদাজের সঙ্গে শিকার করতে বের হন। সেখানে আলী মর্দান সালার জাফরকে বলেন– যদি সালার জাফর গজনীর সিংহাসনে বসতে রাজী হন, তাহলে আলী মর্দান তাজউদ্দীনকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করতে প্রস্তুত।

এই সাংঘাতিক প্রস্তাব শুনে সালার জাফর আতংকিত হয়ে পড়েন এবং তখনই আলী মর্দানকে দুইটি ঘোড়া উপহার দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে গজনীর সীমানা পার হয়ে দিল্লী চলে যেতে আদেশ দেন।

এভাবে আলী মর্দান দিল্লী সাম্রাজ্যে ফিরে আসতে সমর্থ হন। সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবক আলী মর্দানকে লাহোরে সাদরে গ্রহণ করেন এবং বন্ধুত্বের পুরস্কারস্বরূপ আলী মর্দানকে লাখনৌতির শাসক নিযুক্ত করেন।

কিন্তু লাখনৌতির শাসক নিযুক্ত হওয়া এক কথা আর লাখনৌতি শাসন করতে আসা আর এক কথা। আলী মর্দান নিজে খুব ভাল করেই জানতেন যে, লাখনৌতির খলজি আমীরেরা তাঁকে গ্রহণ করবেন না। বখতিয়ার খলজি সাহেবকে হত্যার কথা বা লাখনৌতির খলজি আমীরদের প্রতি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা তখন পর্যন্ত কেউ ভুলতে পারেননি।

সুতরাং তিনি লাখনৌতি আসার আগে সৈন্য সংগ্রহ করলেন এবং বিরাট সৈন্য বাহিনীসহ লাখনৌতির দিকে যাত্রা করলেন। উল্লেখ্য যে, বখতিয়ার সাহেবের পরে এই সময়ই বাঙ্গালা মুলুকে দ্বিতীয় পর্যায়ে অধিক সংখ্যক বহিরাগত মুসলমান আগমন করেন।

আলী মর্দান খলজির মনে যাই থাকুক না কেন, বাঙ্গালা মুলুকে এসে তিনি কোন বাধা পেলেন না। হুসামউদ্দীন অর্থাৎ গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি সাহেব এবং কুশি নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। খলজি আমীরদের মধ্যে এই ইওজ খলজি সাহেব ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ এবং কূটনীতিবিদ। তিনি তাঁর বিরোধী নেতৃবৃন্দের প্রতিও সৎ ব্যবহার করতেন

এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। আলী মর্দান খলজি কুতুবউদ্দীন আইবেক কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ায় ইওজ খলজি সাহেব বুঝতে পারলেন যে, আইবেকের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁর উচিত নয়। তাই তিনি স্বেচ্ছায় আলী মর্দানের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিলেন ও সরে দাঁড়ালেন। অন্য পক্ষে আলী মর্দান খলজি অত্যন্ত কঠোর হস্তে শাসন চালাতে লাগলেন। তাঁর ভয়ে সকল খলজি আমীরগণ তার নেতৃত্ব মেনে নিলেন। পার্শ্ববর্তী হিন্দু রায় রায়ানরা এত ভীত হয়ে পড়েন যে, তারা আলী মর্দানের নিকট রীতিমত খাজনা পাঠাতে লাগলেন।

আলী মর্দান খলজি লাখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করার অল্পদিন পরে লাহোরে সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেকের মৃত্যু হয়। সুলতান কুতুবউদ্দীনের পুত্র সন্তান না থাকায় দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। আমীরেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল কুতুবউদ্দীনের জামাতা ও বাদাউনের শাসনকর্তা ইলতুতমিশকে যথাক্রমে লাহোর ও দিল্লীতে সিংহাসনে বসান। আমীরদের মধ্যে দলাদলির ফলে কোন কোন হিন্দু রাজা বিদ্রোহ করেন এবং এই সুযোগে বাঙ্গালা মুলুকে আলী মর্দান খলজি সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বখতিয়ার খলজি ও মোহাম্মদ শিরান খলজি সাহেবরা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করলেও, প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। সে হিসাবে সুলতান আলাউদ্দীন আলী মর্দান বাঙ্গালা মুলুকের প্রথম মুসলমান স্বাধীন সুলতান।

www.boighar.com

সুলতান আলাউদ্দীন আলী মর্দান খলজি একজন সাহসী সৈনিক ও যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না এবং তিনি অযথা রক্তপাত করতে দ্বিধা করতেন না। হঠাৎ ভাগ্য ফলে যাওয়ায় এবং লাখনৌতির অধীশ্বর হওয়ায় তাঁর মাথা ঘুরে গেল এবং তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলেন। তিনি দরবারে বসে খোরাসান, গজনী, ঘোর ইত্যাদি এলাকায় জায়গীর দান করতে লাগলেন আর লাখনৌতিতে বসে তিনি নিজেকে সারা বিশ্বের অধীশ্বর রূপে কল্পনা করতে লাগলেন। শুধু কল্পনাই করতেন না, সেই মতে কাজও করতেন। কথিত আছে যে, একজন মুসলমান ব্যবসায়ী ব্যবসায় লোকসান দিয়ে রিক্ত হয়ে পড়েন এবং সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। সুলতান লোকটির নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, লোকটি ইস্পাহানের অধিবাসী। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান আদেশ দিলেন, তাঁকে ইস্পাহানের জায়গীর দেয়া হোক। সুলতানের এ আদেশে আমীরেরা ফাঁপড়ে

পড়ে গেলেন। তাঁরা জানতেন যে, ইস্পাহান সুলতানের রাজ্যের মধ্যে নয় বললে, সুলতান অবশ্যই উত্তর দেবেন যে, তিনি শীঘ্রই ইস্পাহান জয় করে নেবেন। সুতরাং তাঁরা যুক্তি করে বললেন যে, ব্যবসায়ীটির ইস্পাহানে যাওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। তখন সুলতান তাকে বিপুল অর্থ দান করার আদেশ দেন।

এক কথায় স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে থাকেন। লাখনৌতির খলজি আমীরদের প্রতিও তিনি অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। এতটা কি আর সয়? খলজি আমীরেরা তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে আমাদের এই বর্তমান সুলতান ইওজ খলজি বাহাদুরের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন এবং গোপনে ১২১২ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন আলী মর্দানকে হত্যা করেন।

এই পর্যন্ত ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব থামতেই সেলিনা বানু দাঁত পিষে বলে উঠলো– ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে। যেমন স্বভাব, তেমন শিক্ষা পেয়েছে। এই সব খন্নাস লোকদের এভাবেই উৎখাত করা উচিত।

সেলিম মালিক বললো– তা বটে, তা বটে। লড়াইয়ের ময়দানে নিহত হলে তার একটা ইজ্জত আছে। এভাবে নিহত হওয়াটা ন্যক্কারজনক। এটা দুশ্চরিত্রেরই স্বাক্ষর বহন করে।

সেলিনা বানু তার দাদুকে জিজ্ঞাসা করলো– আচ্ছা দাদু, বখতিয়ার খলজি, শিরান খলজি, বর্তমান সুলতান ইওজ খলজি– এঁরা সবাই অত্যন্ত ভাল লোক। যেমনই ঈমানদার তেমনি সৎ। এঁদের মধ্যে আলী মর্দানের মতো একজন অসৎ লোক ঢুকলো কি ভাবে?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব সহাস্যে বললেন– ধানের মধ্যে চিটা ঢোকে যেভাবে, সেই ভাবে। চিটা তো ধানের মধ্যেই থাকে।

সেলিনা বানু বললো– তা যা বলেছেন। এ লোক সেরেফ চিটাই। একদম নির্গুণ।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– এখানে একটা কথা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। যারা জাত খন্নাস তারা বিলকুল নির্গুণই হয়। তারিফ করার কোন দিক তাদের মধ্যে থাকে না। তবে এই আলী মর্দান সাহেবের মধ্যে একটা দিক ছিল যা যথেষ্ট তারিফ পাওয়ার যোগ্য।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ তাঁর আগে সুলতান বখতিয়ার সাহেব ও সুলতান শিরান সাহেব আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করলেও দিল্লীর সুলতান নারাজ হবেন বিবেচনায় তাঁরা কেউই প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেননি। কিন্তু এই আলী মর্দান সাহেব প্রকাশ্যে নিজেকে স্বাধীন সুলতানরূপে ঘোষণা দেন। অন্য কথায়, তিনিই বাঙ্গালা মুলুকের প্রথম মুসলমান স্বাধীন সুলতান। এটা কিন্তু একটা নগণ্য দিক নয়।

এবার সেলিনা বানু ও সেলিম মালিক এক সাথে বললো– অবশ্যই অবশ্যই। এটা ঠিকই উপেক্ষা করা যায় না।

ঠিক এই সময় মসজিদ থেকে ফজর নামাযের আযান ভেসে এলো। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব চমকে উঠে বললেন– এই রে! আজও রাত শেষ হয়ে গেল।

সেলিনা বানু শশব্যস্তে বললো– শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। জলদি জলদি সবাই শুয়ে পড়ুন। একটু ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর ফজরের নামায আদায় করবেন। শুয়ে পড়ুন এখন।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বাধা দিয়ে বললেন– উঁহুঁ উঁহুঁ, সেটা করা যাবে না। তাতে ঘুমও ঠিক মতো হবে না, ওদিকে আবার ফজরের নামাযও কাযা হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ষোলআনা। তার চেয়ে বরং অযু করে সবাই ফজরের নামায আদায় করে নাও আর নামায অন্তে ঘুমুতে যাও। তাতে করে যতক্ষণ ইচ্ছে আরাম করে ঘুমুতে পারবে।

আবার সেলিম মালিক ও সেলিনা বানু এক সাথে বললো– তা ঠিক- তা ঠিক।

ফজরের নামায আদায়ের পর সবাই ঘুম দিলো লম্বা। ঘুম থেকে উঠে নাশতা করা শেষ হলে সেলিনা বানুর আব্বা শাহাবুদ্দীন খলজি অর্থাৎ সেনাসৈন্যের দেখভাল করার লোক, সেলিম মালিককে বললেন– চলো, আজ তোমাকে এখনই এক জায়গায় নিয়ে যাবো।

সেলিম মালিক প্রশ্ন করলো– কোথায় জনাব?

শাহাবুদ্দীন সাহেব বললেন– সেনা ছাউনিতে। সেখানে কিছু লোক আছে যারা সেনাবাহিনীতে তোমার সাথে কাজ করবে। সুলতান বাহাদুর জানিয়ে

দিয়েছেন, রাস্তার কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। রাস্তার কাজ শেষ হলেই তিনি তোমাকে সেনা বাহিনীর যে কাজের জন্যে আহ্বান করে এনেছেন, সেই কাজে লাগাবেন। তোমার সাথে কাজ করার জন্যে কয়েকজন লড়াইয়াকে প্রস্তুত রাখতে বলেছেন। চলো, তাদের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো।

সেলিম মালিককে নিয়ে শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব সেনা ছাউনিতে এলেন। এসে তিনি প্রথমেই একজন চৌকস লড়াইয়াকে (সৈনিককে) তলব দিলেন। সৈনিকটি এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালে তাকে তিনি সেলিম মালিককে দেখিয়ে দিয়ে বললেন– একে চেনো? মানে দেখা হয়েছে আগে?

সৈনিকটি বললো– জি না হুজুর। আগে দেখিনি।

শাহাবুদ্দীন সাহেব বললেন– ইনিই সেই বিশিষ্ট যোদ্ধা, যাকে সুলতান বাহাদুর তাঁর দেশ গরমশির থেকে আহ্বান করে এনেছেন। এর অধীনেই তোমাদের কাজ করতে হবে।

সেলিম মালিককে সসম্ভ্রমে সালাম দিয়ে সৈনিকটি বললো– জনাবের নামটা কিছু কিছু শুনেছি। আজ দেখা পেয়ে বড়ই খুশি হলাম।

সালামের জবাব দিয়ে সেলিম মালিক বললো– আল্লাহ তায়ালা আপনার কল্যাণ করুন।

সৈনিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব এবার সেলিম মালিককে বললেন– এর নাম ফয়েজউদ্দীন বেগ। এও একজন চৌকস লড়াইয়া। এর অধীনে ছোট্ট একটা সৈন্যদল আছে। অর্থাৎ এর সাগরিদদের দল। সেই দল নিয়েই সে তোমার সাথে কাজ করবে আর সর্বক্ষণ তোমার নির্দেশেই চলবে।

সেলিম মালিক খোশকণ্ঠে বললো– আলহামদুলিল্লাহ!

শাহাবুদ্দীন সাহেব অতঃপর ফয়েজউদ্দীন বেগকে বললেন– তোমার দল তুমি গুছিয়ে নাও। আমি একটু ওদিক থেকে আসি। এরপর কুচকাওয়াজের ময়দানে যাবো সবাই আমরা।

শাহাবুদ্দীন সাহেব চলে গেলেন। ফয়েজউদ্দীন বেগ সেলিম মালিককে বললো– আমি আমার সাগরিদদের ডেকে আনি জনাব! আপনার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

সেলিম মালিক বললো– বহুত আচ্ছা!

ফয়েজউদ্দীন বেগের সাগরিদেরা ইতিমধ্যেই এসে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। ইংগিত দিতেই তারা এসে ফয়েজউদ্দীনের পেছনে লাইন ধরে দাঁড়ালো। ফয়েজউদ্দীন তাদের বললো– এই ইনিই সেই জনাব; অর্থাৎ সেই মশহুর যোদ্ধা যিনি আমাদের চালনা করবেন। সালাম দাও এঁকে।

সঙ্গে সঙ্গে সাগরিদেরা সামরিক কায়দায় এক সাথে পা ঠুকে সালাম দিলো। অর্থাৎ সেলিউট করলো সেলিম মালিককে।

সেলিম মালিক তাদের খোশ আমদেদ জানাতেই শাহাবুদ্দীন সাহেব এসে হাজির হলেন এবং তাঁর নির্দেশে সবাই তাঁকে অনুসরণ করে কুচকাওয়াজের ময়দানে চলে এলো।

মাঠে এসে শাহাবুদ্দীন সাহেব ফয়েজউদ্দীনকে বললেন– আজ বিশেষ কিছু কাজ নেই। তোমার সাগরিদদের কুচকাওয়াজটা এই মেহমানকে একটু দেখাও আর এর সাথে সবাই তোমরা পরিচিত হও। এরপর এ মাঝে মাঝে এসে তোমাদের তালিম দেবে।

ফয়েজউদ্দীন বেগের নির্দেশে তার সাগরিদেরা কিছুক্ষণ সুশৃঙ্খলভাবে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করলো। তাদের শৃঙ্খলা ও কলাকৌশল দেখে সেলিম মালিক ও শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব উভয়েই বিশেষ প্রীত হলেন। শাহাবুদ্দীন সাহেব বললেন– আজ এই পর্যন্তই। এখন তোমরা পরস্পর আলাপ পরিচয় করো। আমি যাই, অন্যদিকে আমার একটু জরুরি কাজ আছে।

শাহাবুদ্দীন সাহেব চলে গেলেন। সেলিম মালিক ফয়েজউদ্দীন বেগকে বললেন– বড় সুন্দর তালিম দিয়েছেন আপনি আপনার সাগরিদের। ভবিষ্যতে খুব কাজ দেবে এরা। আপনার সাগরিদদের এখন আপনি ছাউনিতে পাঠিয়ে দিন আর নিরিবিলিতে বসে একটু গল্প আলাপ করি আমরা। গল্প আলাপ মানে, পয়পরিচয়টা করি। আপনার অসুবিধা হবে কি?

ফয়েজউদ্দীন বেগ বিপুল আগ্রহে বললো– মোটেই না, মোটেই না। জনাবের সাথে বিশেষ পরিচিত হওয়ার আমারও বড় ইচ্ছে। সাগরিদদের এখনই আমি ছাউনিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ফয়েজউদ্দীন বেগ সাগরিদদের ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে এসে সেলিম মালিকের সাথে ছায়াতে বসলো। এরপর বললো– তা জনাবের আবাস কি গরমশিরে? মানে, গরমশির থেকে এসেছেন?

সেলিম মালিক বললো– হ্যাঁ, গরমশিরেই। এই সুলতান বাহাদুর আর আমি

এক জায়গার আর পূর্ব পরিচিত লোক।

ফয়েজউদ্দীন উৎফুল্লকণ্ঠে বললো– মা'শাআল্লাহ! জনাবও তাহলে বুঝি একজন খলজি? মানে খলজি সম্প্রদায়ের লোক?

ঠিক তাই। তা আপনার নাম তো শুনলাম ফয়েজউদ্দীন বেগ। আপনি নিশ্চয়ই খলজি সম্প্রদায়ের লোক নন?

জি না জনাব। কিন্তু এসব কথার আগে আমার একটা অনুরোধ আছে। আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন জনাব। আপনি আমার মনিব হতে এসেছেন। বয়সেও কিছুটা বড়ই হবেন। আপনি আমাকে 'তুমি' বললে, আমি বেশ সহজভাবে আর স্বস্তির সাথে কথা বলতে পারি।

মনিব হতে এসেছি মানে! সে কি! মনিব হতে কেন? বলতে পারেন বন্ধু হতে এসেছি। আপনাকে নিয়ে কাজ করতে হবে আমাকে।

তবুও আপনি আমার শ্রদ্ধেয়জন। সামরিক বিদ্যায় জনাব আমার উস্তাদেরও উপর পর্যায়ের লোক। জনাবের যা নাম খ্যাতি শুনেছি তাতে জনাবের সাগরিদ হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতাও হয়তো আমার নেই। দয়া করে আর 'আপনি আপনি' করবেন না। 'তুমি' বললে আমি বড়ই বাধিত হবো।

বেশ তাই হবে। 'তুমি'ই বলবো। এবার বলো তো আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি কোথায় শুনেছো?

আমার এক স্বদেশীর কাছে জনাব। আমার এক প্রতিবেশীর মুখে শুনেছি।

স্বদেশী! দেশ কোথায় তোমার? আফগান মুলুকে নয়?

অবশ্যই আফগান মুলুকে জনাব। তবে গরমশিরের ওদিকে নয়, সিস্তানের দক্ষিণ অঞ্চলে। আমার নানার বাড়ি আফগানিস্তানের ফারগানায়।

ফারগানায়?

জি। আমার আম্মা ফারগানারই মেয়ে। আমার আব্বাও ফারগানারই লোক ছিলেন। জন্ম তার ফারগানাতেই। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কার্যোপলক্ষে সিস্তানে আসেন আর সিস্তানেই বসতি স্থাপন করেন। আমার জন্ম ঐ সিস্তানেই।

আচ্ছা! আমার কথা তোমার প্রতিবেশীর মুখে শুনেছো? তিনিই বা সে কথা জানলেন কি করে?

এখানে এই লাখনৌতিতে এসে। তিনি এই রাজধানীতে চাকরি করেন।

বলো কি! এখানে চাকরি করেন?

জি জি। তবে আপনার সম্বন্ধে উনি আগে বিশেষ জানতেন না। এই দিন দুই হলো জেনেছেন।

তাজ্জব! কে সে লোক? মানে, আপনার সে প্রতিবেশী?

জনাব হাফিজ আহম্মদ সাহেব।

হাফিজ আহম্মদ সাহেব? কোন হাফিজ আহম্মদ সাহেব?

হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেব।

সোবহান আল্লাহ! তিনি আপনার প্রতিবেশী?

জি, তিনিই আমাকে এখানে এনেছেন।

কি তাজ্জব- কি তাজ্জব!

গতকাল নাকি আপনি ঐ হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

মাশাআল্লাহ। সে কথাও জেনেছো?

জি জনাব, জেনেছি।

কে বললে সে কথা?

উনার মেয়ে, ফারজানা বেগম।

চমকে গেল সেলিম মালিক। বললো– ফারজানা বেগম! ফারজানা বেগমের সাথে তোমার পরিচয় আছে?

জি, অনেক আগে থেকেই আছে।

মানে?

মানে, বছপন কাল থেকেই।

বছপন কাল থেকেই?

বছপন কাল থেকেই আমরা একে অন্যের পরিচিত। হাফিজ আহম্মদ সাহেব নকরী নিয়ে এখানে এলে কিছুদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। পরে আমিও এখানে নকরী করতে এলে, মানে হাফিজ আহম্মদ সাহেব আমাকে এখানে আনলে আবার আমরা একত্রিত হয়েছি।

একত্রিত হয়েছো? মানে, ফারজানা বেগমের সাথে?

জি-জি, তার সাথেই। মাঝখানে আমরা বড়ই দুঃখিত ছিলাম।

এখন খুশি হয়েছো?

জি জনাব, জি।

আচ্ছা! তাহলে কি মুহাব্বত আছে তোমাদের মধ্যে?

থমকে গেল ফয়েজউদ্দীন বেগ। থতমত করে বললো– জনাব!

তোমরা কি ভালবাসো দু'জন দু'জনকে?

একথা কেন জনাব?

আপত্তি থাকলে শুনতে চাইনে। বছপন কাল থেকেই তোমরা পরিচিত বলছো, সেজন্যে বলছি। এমন অবস্থায় মুহাব্বত হওয়ারই তো কথা।

ফয়েজউদ্দীন বেগ মাথা নীচু করলো। সলজ্জ হাসিমুখে বললো– জনাব আকেল মান্দ! আর বেশি জানতে চেয়ে আমাকে শরমিন্দা করবেন না জনাব!

সাব্বাশ! আর কিছু জানতে চাইনে।

এ সময় বাসার একজন বয়স্ক কাজের লোক এসে সেলিম মালিককে বললো– হুজুর, আম্মাজান স্মরণ করেছেন আপনাকে।

সেলিম মালিক বললো– আম্মাজান মানে? কোন আম্মাজান?

সেলিনা বানু আম্মাজান। তিনি এখনই আপনাকে বাসায় ফিরে যেতে বললেন।

কেন- কেন? এখনই কেন?

আজ আবার কোথাও গিয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করে ফেলতে পারেন সন্দেহে তিনি এখনই আপনাকে বাসায় যেতে বললেন।

সেকি! এখনই?

জি হুজুর। বেলা দুপুর পার হয়ে গেছে তবু আপনি বাসায় ফিরলেন না, তাই...

কারো বাসায় গিয়ে খানা খেতে পারি?

আম্মাজান তাই মনে করছেন হুজুর। আপনি যতক্ষণ না যাবেন ততক্ষণ উনি না খেয়ে থাকবেন।

তোমার আম্মাজানের কি যে খেয়াল! ঠিক আছে। তুমি যাও, আমি আসছি–

জি না হুজুর! আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন। আমি একা ফিরে গেলে আম্মাজান আমার উপর ভীষণ গোস্বা হবেন।

বইঘর ও রোকন

গোস্বা হবেন?

তিনি হুকুম দিয়েছেন, খুঁজে বের করে আপনাকে এখনই বাসায় নিয়ে যেতে হবে। আপনাকে পেয়ে রেখে গেলে আমার ভীষণ মুসিবত হবে।

মুসিবত হবে কি রকম?

আমার নকরীও যেতে পারে। এ ছাড়া আপনি না গেলে সারাদিনে উনি না খেয়ে থাকবেন। এক ফোঁটা পানিও মুখে দিবেন না। দয়া করে এখনই আমার সাথে চলুন হুজুর!

লোকটা দুই হাত জোড় করলো। সেলিম মালিক বললো– বাব্বা! এতটাই তাকিদ তোমার আম্মাজানের? তবে আর কি! চলো...

ফয়েজউদ্দীন বেগের দিকে চেয়ে সেলিম মালিক বললো– চলি ফয়েজউদ্দীন মিয়া। জেনানার তলব, দেরি করার জো নেই।

ফয়েজউদ্দীন বেগ ঈষৎ হেসে বললো– কেমন যেন একটু গন্ধ পাচ্ছি জনাব! তলবের মধ্যে কেমন যেন একটু দরদ দরদ ভাব ফুটে উঠছে।

সেলিম মালিক মুচকি হেসে বললো– 'আকেলমান্দ কে লিয়ে ইশারাই কাফি'!

লোকটার সাথে তখনই রওনা হলো সেলিম মালিক।

বাড়ির কাজের লোককে পাঠিয়ে দেয়ার পরও সেলিম মালিক তাড়াতাড়ি না আসায় সেলিনা বানু তার দাদুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো– আচ্ছা দাদু, গতকাল প্রশ্ন করেও উত্তর পাইনি। এখন বলুন তো, আপনি আর সেলিম মালিক সাহেব গতকাল দুপুরে কোথায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে এসেছিলেন?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– গতকাল দুপুরে?

সেলিনা বানু বললো– জি জি! ঐ খাওয়া-দাওয়া করে আসার জন্যেই তো সেলিম খলজি সাহেব গতকাল দুপুরে কিছুই খেতে পারেননি। তার নাকি ক্ষুধাটাই আর ছিল না। কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা?

ও, এই কথা? আমরা হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাসায় গিয়েছিলাম।

উৎকর্ণ হয়ে সেলিনা বানু বললো– হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাসায়? কেন কেন?

কিছু টাকা পয়সা উঠানোর দরকার ছিল, তাই!

সেলিম মালিক সাহেবও আপনার সাথে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, আমার সাথেই। আমরা এক সাথেই ছিলাম আর ওখানেও এক সাথেই গিয়েছিলাম।

আর অমনি খেতে দিলো? টাকা পয়সার ব্যাপারে ওখানে গেলেই হাফিজ আহম্মদ সাহেব আপনাকে খেতে দেন?

না, তা দেন না। কিন্তু গতকাল সেলিম মালিককে দেখে হাফিজ সাহেবের নাতনী এমন চেপে ধরলো যে, কিছু মুখে না দিয়ে আর আসতে পারলাম না।

বলেন কি! সেলিম মালিক সাহেবের দেখা হয়েছিল উনার নাতনীর সাথে!

: হয়েছিলই তো। ঐ মেয়েটাও অন্দর থেকে বেরিয়ে এলো যে!

কথাও হয়েছিল বুঝি ওদের মধ্যে?

হয়েছিল মানে কি? বেধড়ক কথাবার্তা। কথার পর কথা। কথার একদম তুফান ছুটিয়ে দিয়েছিল ওরা।

অর্থাৎ?

আমি কি জানতাম যে, ঐ মেয়েটার সাথে সেলিম মালিকের এত বেশি পরিচয় আছে? হাফিজ আহম্মদের সাথে আমি হিসাব-কক্ষে গেলাম আর এই ফাঁকে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ওরা দীর্ঘ সময় ধরে কথার একদম বহর ছুটিয়ে দিল। সেলিম মালিককে দেখে মেয়েটা খুশিতে সেকি গদ গদ!

সেলিনা বানু অস্থির হয়ে উঠলো। বললো– আর অমনি এনে খাবার দিলো?

অমনি এনে দেবে কি! বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল যে। অন্দর মহলে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে বসিয়ে খেতে দিলো।

সে কি! একদম অন্দর মহলে নিয়ে গেল সেলিম মালিক সাহেবকে?

আমাকেও নিয়ে গিয়েছিল।

আরে, আপনি হলেন বুড়ো মানুষ আর উনাদের অনেক পরিচিত লোক। ওদের অন্দর মহলে আগে থেকেই যাতায়াত আছে আপনার। কিন্তু সেলিম মালিক সাহেব? উনি তো বুড়ো মানুষ নন, আগে থেকে পরিচিত মানুষও নন। অথচ একজন অচেনা আর তরতাজা নওজোয়ানকে অন্দর মহলে নিয়ে গেল ফারজানা?

তা নওজোয়ান হলে কি হবে? সেলিম মালিক যে ওদের অত্যন্ত পরিচিত

লোক। বললাম না, সেলিম মিয়ার সাথে অনেক বেশি পরিচয় আছে মেয়েটার? এক গলা খাতির।

তাই পোলাও-গোশত আর মিঠাই মিষ্টি এনে...

না না, পোলাও গোশত নয়। লুচিপুড়ি আর মিঠাই-মিষ্টান্ন দিয়েছিল শুধু। পোলাও গোশত খাওয়ানোর জন্যে যথেষ্ট সাধাসাধি করলো মেয়েটা। দুপুরের খানা খেয়ে ওদের ওখানে বিরাম-বিশ্রাম নিয়ে সাঁঝ অবধি থাকার জন্যে বিস্তর সাধাসাধি করলো।

কে, হাফিজ আহম্মদ সাহেব, না ঐ মেয়েটা?

ঐ মেয়েটাই, ঐ মেয়েটাই। হাফিজ আহম্মদ সাহেবও কিছুটা বলেছিলেন কিন্তু যত পীড়াপীড়ি তা সবই ঐ মেয়েটার।

তার পর?

মেয়েটার চাপে পড়ে দেখলাম, সেলিম মালিকও রাজি হয় হয় ভাব। কিন্তু আমি কি তা হতে দেই? আমাদের জন্যে খানা নিয়ে তুমি বসে থাকবে, সেটা কি আমি জানিনে?

হুঁউঁ! সেই জন্যে বুঝি সেলিম মালিক সাহেব দস্তর মতো লুচি-পুড়ি আর মিঠাই মিষ্টান্ন গিলেছেন?

গিলেছে গিলেছে। মেয়েটা যে তার পাশে বসে তুলে তুলে দিল আর সেধে সেধে খাওয়ালো। সে কি সাধাসাধি! ওদের মধ্যে এতটা যে ভাব আছে, আমি তা ভাবতেই পারিনি!

বটে!

প্রেরিত লোকটার সাথে সেলিম মালিক এসে হাজির হলো এই সময়। তা দেখে সেলিনা বানু সেই প্রেরিত লোকটাকে রুষ্টকণ্ঠে বললো– এই যে, এসেছো? তা এত দেরি হলো কেন? তুমি আবার ওঁকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?

সেলিম মালিকের প্রতি ইংগিত করলো সেলিনা বানু। লোকটি থতমত করে বললো– কোথাও তো যাইনি আম্মাজান! কুচকাওয়াজের ময়দানেই ছিলাম। ওখান থেকেই আসছি।

তাহলে এত দেরি হলো কেন? কুচকাওয়াজের ময়দান থেকে আসতে কয় প্রহর লাগে?

একজন লোকের সাথে এই হুজুর গল্প-আলাপে মশগুল ছিলেন যে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসতে পারলেন না।

একটা লোক! কোথাকার লোক?

তা তো সঠিক জানিনে। তবে মনে হলো, হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাড়ির লোক। ওঁদের নিয়েই, মানে হাফিজ আহম্মদ সাহেব আর তাঁর নাতনীকে নিয়েই গল্প-আলাপ হচ্ছিল যে!

সেলিনা বানু ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো– আবার সেই হাফিজ আহম্মদ সাহেব আর তাঁর নাতনী!

সঙ্গে সঙ্গে সেলিম মালিকের দিকে ঘুরে সেলিনা বানু দাঁত পিষে বললো– কি ব্যাপার! হাফিজ আহম্মদ সাহেবের ঐ নাতনিটা আপনাকে কি যাদু করেছে যে, তার কথা ভুলতে পারছেন না? উঠতে বসতে শুধু তারই কথা? কুচকাওয়াজের ময়দানে গিয়েও...

সেলিম মালিক বললো– তারই কথা মানে? ওঁদের পরিচিত এক লোকের সাথে দেখা হলো আর তাই ওঁদের কথা উঠলো। উঠতে বসতে তার কথা হবে কেন?

কেন আবার! এত আদর যত্ন পেলে আর সুন্দর মুখের এত মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনলে কি আর তার কথা ভোলা যায়?

সেলিম মালিক নাখোশকণ্ঠে বললো– এ তুমি কি বলছো?

সেলিনা বানু বললো– কি বলছি বুঝতে পারছেন না? গতকাল ফারজানাদের বাসায় যাননি? ফারজানার সাথে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে গদগদকণ্ঠে দীর্ঘ সময় গল্প-আলাপ করেননি? তার আহ্বানে তাদের অন্দর মহলে যাননি? তার তুলে তুলে দেয়া লুচি-পুড়ি মিষ্টি-মিঠাই পেটপুরে খাননি?

হ্যাঁ খেয়েছি। তো কি হয়েছে?

হবে আবার কি! সুন্দর মুখ দেখে একদিনেই মজে গেলেন?

কি বলতে চাও তুমি?

কি বলছি, তা ঠিকই বুঝতে পারছেন। এখন থেকে কি ওখানে গিয়েই থাকতে চান আপনি?

তা যদি থাকতে হয়, থাকতে হবে। আমার তো নিজস্ব কোন আস্তানা নেই। যেখানে রাত, সেখানেই কাত। আমার আবার এখান ওখান কি?

বইঘর ও রোকন

বটে! এখান থেকে ওখানে যেতে আপনার মন ভারী না হোক, একটুও পা ভারী হবে না?

না, হবে না। আর না হোক, ওখানে আমাকে এমন হাজারটা কৈফিয়তের নিচে চাপা পড়তে হবে না।

ওরে বাপরে! আমার চেয়ে ওর ব্যবহার এতটাই মিষ্টি?

উঃ! দুপুর পেরিয়ে গেছে বলে জোর তাকিদ দিয়ে আমাকে ধরে আনা হলো। এখন খাবার খাওয়ার বদলে যদি এইসব গঞ্জনাই খেতে হয় আমাকে, তাহলে আর আমার খাবারের দরকার নেই। এক গ্লাস পানি খেয়েই শুয়ে পড়ছি গিয়ে।

সেলিম মালিক নড়েচড়ে উঠলো। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব এতক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে এদের বাহাস দেখছিলেন। এবার সেলিনা বানুকে উদ্দেশ্য করে তিনি সোচ্চারকণ্ঠে বলে উঠলেন– আরে আরে! এ কি করছো তুমি? বেচারা তেতে পুড়ে এলো, তার আহার বিশ্রামের দিকে না তাকিয়ে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছো? যাও, যাও। শিগ্‌গির খেতে দাও বেচারাকে।

সেলিনা বানু ভারীকণ্ঠে বললো– খাবার তো সেই পৌনে দুপুর থেকেই আগলে নিয়ে বসে আছি। এখন আমার দেয়া খানা খেতে তার ভাল লাগবে কি না, কে জানে?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব ধমক দিয়ে বললেন– আরে চুপ! ফের সেই তর্ক? চলো চলো, খাবার দেবে চলো। আমিও তো খেতে এসে দাঁড়িয়ে আছি সেই থেকে।

অতঃপর সেলিম মালিকের কাছে এসে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– চলো ভাই, আমরা খাবার টেবিলে যাই। মেয়েটার মাঝে মাঝে কি যেন ঝুল্ উঠে একবার করে। বাপটাকেও সে এইভাবে মাঝে মাঝেই জ্বালায়। চলো, সেলিনা পরিবেশন না করে না করুক, আমরা নিজেরাই নিয়ে খাবো। চলো...

সেলিম মালিককে ঠেলতে ঠেলতে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন তিনি। তা দেখে সেলিনা বানু ছুটে এসে হাত লাগালো খাবারে। থালা-গ্লাস এগিয়ে দিয়ে খাবারাদি পরিবেশন করতে লাগলো ক্ষিপ্রহস্তে।

মাগরিব নামায অন্তে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব সেলিনা বানুকে বললো– এশার নামাযের পর আজ আর বোধ হয় আমাদের আলোচনায় বসা হবে না। মানে, বখতিয়ার খলজি সাহেবের দুই ইয়ারের কথা তো শেষ হয়ে গেছে।

বাকী আছে আমাদের এই সুলতান ইওজ খলজি সাহেবের জীবন কথা। তাঁর সুলতান হওয়ার পূর্ববর্তী জীবন কাহিনী আজ আর বোধ হয় শুরু করা যাবে না।

সেলিনা বানু বেগম সবিস্ময়ে বললো– কেন? শুরু করা যাবে না কেন?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– সেলিম মালিক তো নেই। তার ঘরে তালা দেয়া। তাকে বাদ দিয়ে কি করে শুরু করবো? পরে তো আবার শুনতে চাইবে সে কাহিনী।

: তার অর্থ? সেলিম মালিক সাহেব নেই মানে?

মানে, কে একজন এসে একটা চিরকুট তার হাতে দিলো। সেই চিরকুট দেখেই সেলিম মালিক সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে গেল?

হ্যাঁ। মাগরিবের ওয়াক্ত তো শেষ হতে চললো। আর একটু পরেই এশার ওয়াক্ত শুরু হবে। এশার নামাযের সময়ও যদি সে না আসে, তাহলে আর কি করে বসা যাবে আজ? গভীর রাতে বসলে তো শেষ করা যাবে না সে কাহিনী।

বলেন কি! তাহলে কোথায় গেলেন উনি?

সেটা তো ঠিক বলতে পারছিনে। তবে যে লোকটা এসে তাকে সেই চিরকুটটা দিলো, মনে হলো সে লোক ঐ হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাড়ির এক কাজের লোক।

হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাড়ির কাজের লোক?

হ্যাঁ, ঐ বাড়িতেই লোকটাকে কাজ করতে দেখেছি।

তাজ্জব!

এখন দেখা যাক সে সময় মতো ফিরে কি না। ফিরলে আলোচনায় বসা যাবে। কোথায় আর কেন গিয়েছিল, সেটাও জানা যাবে।

কিন্তু সেলিম মালিক এলো না। এশার নামাযের পরও সে এলো না। অনেক্ষণ বসে থাকার পরে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব হতাশচিত্তে আর সেলিনা বানু বেগম ক্ষুব্ধচিত্তে নিজ নিজ কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরের দিন অনেকখানি বেলাতে গিয়ে সেলিনা বানু দেখলো, সেলিম মালিকের কক্ষের তালা খোলা আর সেলিম মালিক ঘুমুচ্ছে। দরজা ঠেলে কক্ষে ঢোকার

শব্দেও সেলিম মালিক জাগলো না দেখে সেলিনা বানু তাকে আর বিরক্ত করলো না। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সে নিঃশব্দে চলে এলো সেখান থেকে।

হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাড়িতেই তথা ফারজানা বেগমের কাছেই সেলিম মালিক গিয়েছিল– এই ধারণা দৃঢ় হওয়ায় সেলিনা বানু সরাসরি সেখানে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলো। সেলিনাদের বাসা থেকে হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাসা বেশি দূরে নয়। সেলিনা বানু তার ব্যক্তিগত হুকুমবরদার (ফাই-ফরমায়েশ খাটা লোক) বৃদ্ধ জাফরউল্লাহ ওরফে জাফর মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলো ফারজানাদের বাসায়।

বাসার ফটকে বসে এক লোক ঝুমছিল। তাকে লক্ষ্য করে সেলিনা বানু বললো– এই লোক, শুনতে পাচ্ছো?

চোখ না খুলে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় লোকটি বললো– বাসায় নেই।

বাসায় নেই মানে? কে বাসায় নেই?

যাকে খুঁজছো সে বাসায় নেই। কাজেই কোন মওকা নেই। অন্য জনের সাথে সে অন্য বাসায় বেড়াতে গেছে।

কাকে খুঁজছি আমি?

ঐ তাকে। যখন তখন এলেই পাওয়া যায়? ঐ তা-বড়ো লোকটা এলে সংবাদ দিয়েই আসতো।

খামোশ্!

ধমকে উঠলো সেলিনা বানু। তন্দ্রা ছুটে গেল লোকটার। চোখ মেলে বোরকা আঁটা সেলিনা বানুকে দেখেই সে ধড়মড় করে উঠে বললো– সেলাম, সেলাম! এবার চিনতে পেরেছি।

কি চিনতে পেরেছো?

আপনি একজন খানদান ঘরের জেনানা। এত দামী লেবাস খানদান ঘরের জেনানারাই পরেন।

এবার জাফরউল্লাহ ওরফে জাফর মিয়া রুষ্টকণ্ঠে বললো– ইনি শুধু খানদান ঘরের জেনানাই নন বুরবক্। ইনি উজির জনাব শাহাবুদ্দীন হুজুরের মেয়ে আর জনাব ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবের নাতনি।

এবার শূন্যে লাফিয়ে উঠে লোকটা বললো– ওরে বাপরে, মরেছি! সেলাম হুজুরাইন, সেলাম, সেলাম! বোরকার মধ্যে কে না কে, বুঝতে পারিনি

 বইঘর ও রোকন

হুজুরাইন। এই গরীবের গোস্তাখি মাফ করে দিন। দোহাই আপনার, মাফ করে দিন।

সেলিনা বানু বললো– নাম কি তোমার?

লোকটা বললো– মহব্বত আলী হুজুরাইন। এই অধমের নাম মহব্বত আলী মিয়া। এবার ঠিক চিনতে পেরেছি।

বটে।

এই গতকাল সাঁজবেলাতেই তো আপনাদের মকানে গেলাম।

আমাদের বাসায় গিয়েছিলে?

জি জি। চিরকুট দিতে গিয়েছিলাম। আপনাদের মকানে ঐ তাবড়ো লোক সেলিম মালিক হুজুর আছেন না? তাঁকে চিরকুট দিতে গিয়েছিলাম।

তুমি চিরকুট দিতে গিয়েছিলে?

জি হুজুরাইন, আমিই গিয়েছিলাম।

কি লেখা ছিল চিরকুটে?

চিরকুট আমি পড়িনি। তবে ফয়েজউদ্দীন হুজুর বললেন– ফারজানা আপার ভীষণ অসুখ, এখনই দেখা করতে হবে।

ভীষণ অসুখ? কি অসুখ হয়েছিল?

মহব্বত মিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে বললো– আরে দূর! অসুখ কোথায়? উনারা মিথ্যা কথা বললেন।

www.boighar.com

মিথ্যা কথা? কেন, মিথ্যা বললেন কেন?

তা না বললে ঐ সেলিম মালিক হুজুর যে নাও যেতে পারেন আর আপনার অনুমতি নাও পেতে পারেন, তাই।

তাই ফারজানার অসুখের কথা শুনেই উনি ছুটে এলেন?

আমার আগে আগে ছুটে এলেন। আসবেন না? ফারজানা আপা উনাকে যে জব্বোর আদর করেন। পাশে বসে তুলে তুলে খাওয়ান। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন।

জব্বোর প্রেমও করেন উনার সাথে, না কি বলো?

মহব্বত মিয়া থমকে গিয়ে বললো– না, মানে, সেটা সঠিক বলা কঠিন!

কঠিন কেন?

বইঘর ও রোকন

এক মেয়ে কয়জনের সাথে প্রেম, মানে মহব্বত করবেন, বলুন? আর একজন যে সামনে আছেন আগে থেকেই।

আর একজন? কে সে?

জনাব ফয়েজউদ্দীন বেগ। উনাদের দেশের মানুষ।

তাঁর সাথে আগে থেকেই মহব্বত আছে?

সঠিক জানিনে। তবে থাকতেই তো পারে। আমার তাই বিশ্বাস।

থাকতেই পারে?

অবশ্যই পারে। এক মুলুকের মানুষ ওরা দুইজন। বছপনকাল থেকেই ওঁরা দুইজন এক জায়গায় মানুষ হয়েছেন। খেলাধুলা করেছেন। এতে করে ওঁদের মধ্যে পিরীত হবে, এ আর অসম্ভব কি?

পিরীত থাকলেও সে পিরীত আজও আছে, তার নিশ্চয়তা কি? সেলিম মালিক সাহেবকে দেখার পর ছেলেবেলার ঐ পিরীত-পিরীত ভাবটা যে ছুটে যায়নি, সে কথা তোমাকে কে বললো?

তা মানে...

তোমাদের ঐ ফয়েজউদ্দীন বেগ কি সেলিম মালিক সাহেবের চেয়ে দেখতে বেশি সুন্দর?

না না, তা কখনো নয়। সেলিম মালিক হুজুর তো বিলকুল রাজপুত্তুর। মানে নবাবজাদা, বাদশাহজাদা চেহারা তাঁর।

ঐ ফয়েজউদ্দীন বেগ কি সেলিম মালিক সাহেবের চেয়ে বেশি হিম্মতদার, না কি একই সমান বাহাদুর?

জি না হুজুরাইন, জি না। শুনেছি, সেলিম মালিক হুজুরের পুরোপুরি সাগরিদের সমানও নয়। তবে অনেকটা কাছাকাছি। কিছুদিন তাঁর তালিম পেলে ফয়েজউদ্দীন হুজুর সেলিম মালিক হুজুরের পুরোপুরি সাগরিদ বনে যাবেন।

তবে? রূপ-গুণ আর হিম্মত যাঁর এত অধিক উমদা, তাঁর প্রেমে ফারজানা বেগম পড়বে না, এটা কি নিশ্চিত করে বলতে পারো?

জি না হুজুরাইন, তা পারিনে। তা পারিনে। বরং সেলিম মালিক হুজুরের দিকে ফারজানা আপা যে রকম ঝুঁকে গেছেন আর ফারজানা আপার ব্যাপারে সেলিম মালিক হুজুর যেভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তাতে ফয়েজউদ্দীন হুজুরের

স্থান আর ওখানে না থাকারই কথা।

: ঠিক নয়?

জি হুজুরাইন, ঠিক। ঠিকই এখন তা বুঝতে পারছি। ফারজানা আপার অসুখ হয়েছে শুনেই উনি যেভাবে পড়িমরি ছুটে এলেন, তাতে মহব্বতের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

'কি হতে পারে না মহব্বত মিয়া?'– বলতে বলতে ফারজানা বেগম আর ফয়েজউদ্দীন বেগ এক সাথে এসে হাজির হলো। সেলিনা বানুদের উপর নজর পড়তেই ফারজানা বেগম উৎফুল্লকণ্ঠে বলে উঠলো– আরে, কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! গরীবের বাড়িতে হাতির পাঁড়া!

ফারজানার উল্লাসের বিপরীতে সেলিনা বানু ঠাণ্ডাকণ্ঠে বললো– হাতীর পাঁড়া কি রকম?

সুলতান বাহাদুরের দেশি ভাই আর বিশিষ্ট অমাত্য তোমার আব্বা। তার উপর বিশ্ব সুন্দরী তুমি। গরীবের বাড়িতে এমন মানুষের আগমন হাতীর পাঁড়া বৈ কি?

বটে!

বিরাট পদস্থ লোকের কন্যা ছাড়াও তোমার রূপ জগৎ ভোলানো রূপ। এমন রূপের তুলনা নেই।

কেন, তোমার রূপও কি কম কিছু? তুমিও তো যথেষ্ট সুন্দরী!

প্রদীপের পাশে জোনাকী! তোমার রূপের পাশে আমার রূপের কি দাঁড়ানোর কোন স্থান আছে? তা থাক এই রূপচর্চা। চলো-চলো, ভেতরে চলো। কখন থেকে যে তোমরা এই ফটকে দাঁড়িয়ে আছো, কে জানে? ভেতরে এসো-ভেতরে এসো!

ভেতরে আসবো?

বাহ! আসবে না? কি জন্যে তুমি এলে, মানে এই গরীবের উপর এই দয়া তুমি কি জন্যে করলে, তা বলবে না?

এই সাথে মুহাব্বত মিয়াকে লক্ষ্য করে ফারজানা বেগম বললো– মুহাব্বত মিয়া! সেলিনা আপার লোক এই জাফর বাবাজীকে নিয়ে তুমি দহলিজে গিয়ে বসো আর তার সাথে গল্প করো। আমরা অন্দরে যাই।

অন্দর মহলে এসে ফারজানা বেগম ফয়েজউদ্দীন বেগকে বললো– আপনিও

একটু ওদিকে যান বেগ সাহেব। একটু মন খুলে গল্প করি।

ফয়েজউদ্দীন বগে সরে গেল। ফারজানা বেগম বললো– তা সখী, হঠাৎ তুমি আমাদের বাসায়? মানে, হঠাৎ তোমার এই আগমন!

সেলিনা বানু বললো– সেলিম মালিক সাহেবকে গতকাল মিথ্যা বলে ধরে আনলে কেন?

মিথ্যা না বললে কি উনি আসতেন। না তুমি আসতে দিতে?

তা তাঁর আসার এত গরজটা কি পড়েছিল?

সেদিন এসে তোমার দাদুর সাথে সেরেফ একটু নাশতা করে গিয়েছিলেন উনি। দুপুরের খানা, মানে একটু পোলাও মাংস করে খাওয়ানোর জন্যে অনেক সাধাসাধি করা সত্ত্বেও উনি থাকলেন না বা খেলেন না। আজ সেই পোলাও-মাংস করেছি। আমার বেগ সাহেবের পোলাও মাংস প্রিয় খাদ্য। তাই আমার বেগ সাহেব বললেন– আমার হবু উস্তাদ ঐ সেলিম মালিক সাহেবকে যেভাবেই পারো আনো এই খানায়। মেহমান ছাড়া খানা আমার তৃপ্তিদায়ক হয় না।

তিরসা নয়নে চেয়ে সেলিনা বানু বললো– তোমার বেগ সাহেব মানে? বেগ সাহেব একজন চৌকস সৈনিক, তা শুনেছি। কিন্তু উনি তোমার বেগ সাহেব, তাতো জানতাম না! তোমার হলো কি করে?

ফারজানা বেগম হাসিমুখে বললো– আপন করে নিতে জানলেই আপন হয়। আত্মার আত্মা হয়।

মার কাটারি! এক সাথে কয়জনকে আত্মার আত্মা কবে নেবে তুমি!

কয়জনকে মানে?

সেলিম মালিক সাহেবকেই তো আত্মার আত্মা করে নেয়ার ইচ্ছে তোমার জোরদার। তাই তো মনে হয় আমার।

তোমার আত্মা তা সইতে পারবে তো? তেমন হলে বুক ফেটে মরে যাবে না তুমি?

উপায় কি! কেউ যদি নিয়েই নেয়, আমার বুক ফেটে গেলেই তা কি করার আছে, চিরে গেলেই বা কি করার আছে?

তোমার করার না থাক আমার করার যথেষ্ট আছে। অন্যের ধন কেড়ে খেতে কখ্খনো আমি যাবো না।

অন্যের ধন!

বুকের ধন। সেলিম মালিক সাহেবের আত্মার সাথে তোমার আত্মা যে এক হয়ে গেঁথে গেছে, এটা লুকোতে চাইলেই কি আর আমার কাছে তা লুকোতে পারো তুমি? সুখী হও সখী। যেমন উমদা নসীব করে এসেছো, তেমনই উমদা দোসর মিলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তোমাকে।

তাহলে তোমার উপায়? এমন উমদা একজন দোসর পেতে তোমার ইচ্ছে হয় না?

জি-না। যার সেটা হজম করার সাধ্য নেই, তার সেদিকে হাত বাড়িয়ে কাজ নেই। দুষ্পাচ্য বস্তু না গেলাই ভাল। যেটা আমার জন্যে সুপাচ্য তা গিলেই সুখী থাকতে চাই। সেটাতেই আমার সর্বাধিক আনন্দ।

তাহলে কে সেই সুপাচ্য বস্তু? ফয়েজউদ্দীন বেগ?

ফারজানা বেগম মুচকি হেসে বললো– আকেলমান্দ কে লিয়ে ইশারাই কাফি!

হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেব কোষাধ্যক্ষের দপ্তরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি ফিরে এলেন এ সময়। অন্দরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন– কি কাফি রে নাতনী?

অন্দরে ঢুকে সেলিনা বানুকে দেখে তিনি খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। বললেন– সোবহান আল্লাহ- সোবহান আল্লাহ! আমার বড় নাতনী এখানে! তুমি কখন এলে মালেকা হুজুরাইন? কত দিন হলো, তুমি আর আমাদের বাসায় আসো না!

জবাব দিলো ফারজানা বেগম। বললো– আজও কি তোমার এই বড় নাতনী সেরেফ বেড়াতে এসেছে দাদু? পাইক পেয়াদা নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে!

পাইক পেয়াদা মানে? আর কে এসেছে সাথে?

দহলিজে দেখোনি? ওর বিশ্বস্ত হুকুমবরদার জাফর মিয়া সাহেবকে দহলিজে দেখোনি? আমাদের মহাব্বত মিয়াও বসে আছে তার সাথে। গল্প করছে ওরা দুইজন।

তাই নাকি? নাঃ, ওটা আমি খেয়াল করিনি। তা এই মালেকা হুজুরাইন কি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে এখানে?

গতকাল সেলিম মালিক সাহেবকে ধরে এনে আমরা, মানে আমি, গোটাই

তাঁকে গিলে ফেলেছি কিনা, সেই খোঁজ নিতে এসেছে।

সেই খোঁজ? কেন কেন?

হারাই হারাই ভয় দাদু! কারো পরম ধন চোখের আড়াল হলেই তার মনে হয়, এই বুঝি হারিয়ে গেল ধন তার। তাই ছুটে এসেছে সখী আমার।

হাফিজ আহম্মদ সাহেব বললেন– আরে দূর পাগলি! আমার বড় নাতনীটা কতদিন পরে এসেছে, তার খানাপিনার ব্যবস্থা করতে না গিয়ে তাকে এমন উপহাস করতে লেগেছো তুমি?

সখীকে একটু ক্ষেপিয়ে দিচ্ছি দাদু! ঠিক আছে, এই এখনই আমি তাদের খানাপিনার আয়োজনে যাচ্ছি।

ফারজানা বেগম সেদিকে এগুলেই প্রবল আপত্তি তুললো সেলিনা বানু। কিন্তু ফায়দা বেশি হলো না। মোটা খানায় না গেলেও তাঁদের অনুরোধে কিছু নাশতা-পানি কবুল তাদের করতেই হলো এবং নাশতা-পানি কবুল করে তবেই ফিরে আসতে পারলো সেলিনা বানুরা।

৪

সে দিনই যথা সময়ে অর্থাৎ বাদ এশা, ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব এসে আলোচনায় বসলেন। আলোচনায় বসেই তিনি সেলিনা বানু বেগম ও সেলিম মালিককে বললেন– আজ আর তোমরা কোন অন্য কথায় যাবে না বা অন্য প্রসঙ্গ টানবে না। তোমাদের কথা দিয়ে আমি দায়বদ্ধ আছি। তাই আজ সরাসরি আমার বক্তব্য শুরু ও শেষ করে আমি দায় মুক্ত হতে চাই।

সেলিনা বানু বললো– ঠিক আছে দাদু, অন্য কোন কথায় যাবো না। আপনি আপনার বিবরণ শুরু করুন।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– গত দুই রাত বর্ণনা করে আমি বখতিয়ার খলজি সাহেবের দুই ইয়ার আলী মর্দান ও শিরান খলজি সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত শেষ করেছি। এখন বাকি আছে তাঁর সর্বাধিক অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত ইয়ার আমাদের এই সুলতান গিয়াসউদ্দীন ওরফে হুসামউদ্দীন ইওজ খলজি বাহাদুরের কথা। অবশ্য বখতিয়ার সাহেবের অন্য দুই ইয়ারের জীবন বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে তাঁর তৃতীয় ইয়ার এই সুলতান ইওজ খলজি সাহেবের অনেক কথাই বলা হয়ে গেছে। তবু তাঁর পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত বলতে গেলে সে সব কথাও কিছু কিছু এসে যাবে। তোমরা শুনো–

সুলতান গিয়াসউদ্দীন ওরফে হুসামউদ্দীন ইওজ খলজির কথা

ইওজ খলজি সাহেবের পিতার নাম ছিল হোসেন। আলী মর্দান খলজির মতো হুসামউদ্দীন খলজি সাহেবও বখতিয়ার খলজি সাহেবের একই এলাকার লোক ছিলেন। অর্থাৎ তিনিও আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গোর অধিবাসী ছিলেন। তবে আলী মর্দানের চেয়ে ইওজ খলজি সাহেব

বখতিয়ার খলজি সাহেবের ঢের ঢের ঘনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত আর নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন। আগেই্ বলা হয়েছে, ইওজ খলজি সাহেব পেশায় ছিলেন একজন গাধাওয়ালা মজদুর। গাধার পিঠে করে মাল টেনে তিনি জীবিকা নির্বাহ্ করতেন। বিবি-বাচ্চা নিয়ে এইভাবে তাঁর দুই বেলার আহার জুটতো। কোন কোনদিন আবার এক বেলার বেশি জুটতো না।

একদিন মাল টেনে তিনি নির্ধারিত মজুরি বাদে একটা মোটা বকশিস পেলেন। সেই বকশিসের পয়সা দিয়ে তিনি প্রিয়বন্ধু বখতিয়ার খলজিকে ডেকে নিয়ে বাসস্থানের নিকটবর্তী এক সরাইয়ে ভরপেট খানা খেলেন। খানা খেয়ে বাড়িতে ফেরার পথে বখতিয়ার সাহেবের আর এক প্রতিবেশী খন্নাস প্রকৃতির আলী মর্দানের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো। এই সাক্ষাতের সময় আলী মর্দান ইওজ খলজি সাহেবকে বললেন– গজনীর আরিজ-কন্যার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আরিজ-কন্যা বখতিয়ারকে একটি দামী আংটি উপহার দিয়েছেন। এছাড়াও আরিজ-কন্যা অনেক ধনরত্ন দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু বখতিয়ার তা নেয়নি। সর্বোপরি, আরিজ-কন্যা বখতিয়ারকে একটা চাকরি দেয়ার জন্যে গজনীতে বিশেষভাবে ডেকে গেছেন। কিন্তু বুরবক বখতিয়ার আজও গজনীতে চাকরি নিতে যায়নি।

সে যুগে কামিন মজদুরের একটা যেমন তেমন চাকরি পাওয়াও ছিল আস্ত সোনার হরিণ পাওয়া। সেই দুর্মূল্য বস্তু চাকরিটা নিতে বখতিয়ার আজও যায়নি শুনে ইওজ খলজি সাহেবের মাথা বিগড়ে গেল। বখতিয়ারের উপর দুর্দান্ত চাপ সৃষ্টি করে তিনি তখনই তাকে গজনীতে যেতে বাধ্য করলেন।

কিন্তু ইওজ সাহেবের চাপে গজনী শহরে এসে হতাশ হলেন বখতিয়ার সাহেব। দেখলেন, সেখানে সেই আরিজ-কন্যাও নেই, তার আব্বা আরিজ সাহেবও নেই। তাঁরা সপরিবার অন্যত্র চলে গেছেন আর অন্য একজন আরিজ হয়ে বসে আছেন। এই নয়া আরিজের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করে যারপর নেই অপমানিত হলেন বখতিয়ার সাহেব। হতাশ চিত্তে ফিরে আসার সময় দপ্তরের সদর ফটকে তাঁর দেখা হলো আরিজ-কন্যার প্রিয় বৃদ্ধ এক খানসামার সাথে। সে লোক গজনী ছেড়ে অন্যত্র যায়নি, রাজধানীতেই ছিল। আরিজ-কন্যার বর্ণনা অনুযায়ী বখতিয়ার সাহেবকে চিনতে পেরে সে লোক আরিজ-কন্যার একটি পত্র তাঁর হাতে দিলো। পত্র খুলে পড়ে স্তম্ভিত হয়ে হয়ে গেলেন বখতিয়ার সাহেব। পত্রে আরিজ-কন্যা লিখেছেন–

জনাব!

সালাম অন্তে জানাই– তকদিরের মার-পেঁচে আপনার কাছে আমি ওয়াদা বরখেলাপকারী মোনাফেকদের একজনরূপে পরিচিত হলাম। আপনাকে যে আশা আমি দিয়েছিলাম, আর তা পূর্ণ করার ফুরসুত আমার রইলো না। আমরা গজনী থেকে সপরিবার হিন্দুস্তানে চলে যাচ্ছি। শাহান শাহ আমার আব্বাকে আরিজের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। ষড়যন্ত্রে পড়ে তিনি আমার আব্বাকে শাসন বিভাগে যোগদান করার জন্যে হিন্দুস্তানে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন। এ হুকুম অবিলম্বে তামিল করার জোরদার তাকিদ আছে। তাই আমরা আজকেই রওনা হচ্ছি।

অধীর আগ্রহ নিয়ে এ কয়দিন আমি আপনার এন্তেজারে ছিলাম। আমার ধারণা ছিল, অতি অল্প দিনের মধ্যেই আপনি গজনীতে হাজির হবেন আর তা যদি হতেন, তাহলে অনায়াশেই আমি আমার ওয়াদা রক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু আপনি তা এলেন না। এরপর যখন আসবেন তখন আমি বহুত বহুত দূরে।

গরমশির থেকে গজনীতে ফেরার পর আপনার কথা একটা দণ্ডের জন্যেও আমি ভুলে থাকতে পারিনি। কি যে আমার হলো, হর-ওয়াক্ত আপনার ঐ মায়াভরা দৃষ্টি চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে আমাকে। অথচ সেই আপনি অসহায়ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াবেন আর অনেক কিছু করার এক্তিয়ার থাকলেও আপনার জন্যে কিছু আমি করতে পারবো না, এ আফসোস সম্বরণ করবো কি করে?

হিন্দুস্তানে গিয়ে কোথায় কিভাবে থাকবো তা আমি জানিনে। তবে একটা কথা ঠিক, এ দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকি না কেন, আপনি আমার সাথেই থাকলেন। আপনারই উসিলায় যে জিন্দেগী ফিরে পেয়েছি আমি, তা থেকে আপনি আর জুদা হবেন কি করে? যেখানেই থাকি না কেন, আপনি যদি মেহেরবানী করে হাজির হন সেখানে, আমি আমার ওয়াদা রক্ষার আপ্রাণ কোশেশ করবো। ইয়াদ রাখবেন, আপনি কিন্তু আদৌ কোন তুচ্ছ কিছু নন। যে সাহস আর তাকত আমি আপনার মধ্যে দেখেছি, তাতে আপনার দ্বারা এ দুনিয়ার অসাধ্য সাধন হতে পারে।

ইতি–

আরিজ-কন্যা
দিলারা বানু।

এক নিঃশ্বাসে পত্রখানা পাঠ করে পথের উপর দাঁড়িয়েই বখতিয়ার সাহেব তা আর একবার পাঠ করলেন। অতঃপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে কিছুক্ষণ সম্বিতহীন অবস্থায় উদাস নেত্রে চেয়ে রইলেন।

পাশে দণ্ডায়মাণ পত্রবাহক একটু নড়েচড়ে বললো– হুজুর বলছিলাম কি...

বইঘর ও রোকন

বখতিয়ার সাহেব আপন খেয়ালে এক কদম সরে গেলেন। তিনি অন্যমনস্ক আছেন দেখে পত্রবাহকও এক কদম এগিয়ে এসে গলা ঝেড়ে বললো– হুজুর! বলছিলাম কি, আপামণির চোখমুখ দেখেই...

বখতিয়ার সাহেবের খেয়াল ফিরতেই তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– এ্যাঁ, কি হয়েছে আপামণির?

না, বলছিলাম– আপামণির চোখ মুখ দেখেই বুঝেছি, বড় পেরেশান দিল নিয়ে উনি এখান থেকে গিয়েছেন। অমন খুব সুরাতের মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল। সম্ভব হলে উনার সাথে মোলাকাত করার কোশেশ করবেন হুজুর।

বখতিয়ার সাহেবের মুখে এর কোন জবাবই যোগালো না। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে পত্রবাহকের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আরো কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর পত্রবাহক বললো– তাহলে এযাযত দিন হুজুর, আমি এবার আসি?

বখতিয়ার সাহেব উদাসকণ্ঠে বললেন– এসো।

গজনী থেকে বখতিয়ার খলজি সাহেব উদাস হৃদয়ে ফিরতি রাস্তা ধরলেন এবং টলতে টলতে ইওজ খলজি সাহেবের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন।

ইওজ খলজি সাহেবের স্ত্রী হুসনে আরা বেগম বাড়ির মধ্যে গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। ছেলের মুখে খবর পেয়েই তিনি দেউটির কাছে এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়ালেন। খবর– বখতিয়ার সাহেব এসেছেন।

ইওজ খলজি সাহেবের কাছে হুসনে আরা শুনেছেন– বখতিয়ার খলজি সাহেব এখন গজনীতে এবং তিনি এখন এক মস্তবড় মানুষ। প্রভূত ক্ষমতা আর অঢেল ধন-দৌলতের মালিক। কিন্তু একি! পর্দার আড়াল থেকে সেই গজনী ফেরত বখতিয়ার সাহেবের মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠলেন হুসনে আরা বেগম। চিরসবুজ মহীরুহের পরিবর্তে এ যেন এক পাতাঝরা মরা গাছ তার সামনে দণ্ডায়মাণ। অনাহার, অনিদ্রা আর বিমারের আলামত তাঁর সারা অঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আড়াল থেকে উদ্বেগের সাথে হুসনে আরা বেগম বললেন– আস্‌সালামু আলাইকুম ছোট মিয়া। এ কি হালত আপনার! কোন বিমার-টিমার হয়েছে নাকি?

জবাবে বখতিয়ার সাহেব ক্ষীণকণ্ঠে বললেন– ওয়া আলাইকুমুস সালাম। না ভাবী, ওসব কিছু হয়নি। এমনি খানিক কাহিল হয়ে পড়েছি।

 বইঘর ও রোকন

হুসনে আরা বেগম আরো প্রশ্ন করলেন– শুনলাম, গজনীতে নাকি গিয়েছিলেন?

: জি-হ্যাঁ।

কোন কিছুই হলো না?

মানে?

কে যেন আপনাকে নকরী দিতে চেয়েছিলেন?

হ্যাঁ-ভাবী।

দিলেন না!

: কি করে বুঝলেন?

: আপনার হালত দেখে। না-উম্মিদের আজাড় ঢেকে রাখতে পারেননি।

বখতিয়ার সাহেব থেমে গেলন। ক্ষণিক নীরব থেকে ধীরকণ্ঠে বললেন– ঠিকই বলেছেন। কিছুই আমার হলো না।

হুসনে আরা বেগম ফের প্রশ্ন করলেন– মোলাকাত? ওটাও হয়নি?

কার সাথে?

হুসনে আরার কণ্ঠ থেকে ক্ষীণ একটা হাসির রেশ ভেসে এলো।

তিনি বললেন– ছোট মিয়া! তামাম মুলুকের মানুষ যেটা জানলেন, আমি সেটা জানবো না, এটা আপনি আন্দাজ করলেন কি করে?

ভাবী!

আমার ধারণা ছিল আপনার কাছেই খবরটা আমি পাবো, আর অনেকের আগেই পাবো। এমন একটা গরম খবর কি করে আপনি চেপে গেলেন আমি তা সোচ্ করে পাচ্ছিনে।

বখতিয়ার সাহেবের মুখেও এবার ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। বললো– গরম খবর হলে নিশ্চয়ই আমি বলতাম। কিন্তু খবরটা আসলে একটা ঠাণ্ডা খবর ভাবী, অন্তত এ যাবত ঠাণ্ডা খবরই ছিল। এই এতদিনে ওটা একটু গরম হয়ে উঠেছে।

কি রকম?

সেটা পরে। এখন বলুন, দোস্ত কোথায়?

এই একটু বাইরে গেলেন। এখনই ফিরে আসবেন।

বখতিয়ার সাহেব এবার ইতস্তত করে বললেন– ভাবী! কিছুটা শরমিন্দা বোধ করলেও না বলে পারছিনে। একটানা গজনী থেকে আসছি। আমার ঘর তো কয়দিন থেকে বন্ধ। আনযাম করতে সময় লাগবে। আপনার ঘরে কি কিছু আছে এখন? জব্বোর ভুখ লেগেছে। নিদেন পক্ষে এক গ্লাস পানি হরেও চলবে।

এতক্ষণে হুঁশে এলেন হুসনে আরা বেগম। চমকে উঠে আফসোসের সাথে বললেন– এ্যাঁ! তাই তো! ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আপনাকে এভাবে দাঁড় করে রেখে তামাশা শুরু করেছি আমি! আসুন-আসুন, শিগ্‌গির ঐ দহলিজে গিয়ে বসুন। আমি এক্ষণি খাবার ব্যবস্থা করছি।

দেউটি থেকে ছিটকে গেলেন হুসনে আরা। তাঁর ছোট্ট বাচ্চাটিকে ডেকে তৎক্ষণাৎ বখতিয়ার সাহেবের কাছে পাঠালেন এবং তার মাধ্যমেই বখতিয়ার সাহেবকে দহলিজে বসিয়ে তিনি ক্ষিপ্রহস্তে খানা তৈরি করতে লাগলেন।

ইতোমধ্যেই ইওজ খলজি সাহেব বাইরে থেকে ওয়াপস এলেন। বখতিয়ারের চেহারা দেখে তিনিও চমকে উঠলেন। দুই দোস্ত সালাম বিনিময় করতেই ইওজ খলজি সাহেবের ছেলে বললো– আব্বু, চাচার জব্বোর ভুখ লেগেছে। আগে জলদি তাঁকে খেতে দাও।

ছেলের বয়স অল্প। হঠাৎ তাকে একথা বলতে শুনে ইওজ খলজি সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– এ্যা, তাই?

জবাবে ছেলেটি বললো– হ্যাঁ আব্বু। চাচা বললেন, তাঁর জব্বোর ভুখ লেগেছে।

শুনে ইওজ খলজি সাহেব দিশেহারা হয়ে গেলেন। বখতিয়ার নিজে যখন মুখ ফুটে বলেছে, তখন ব্যাপারটি আদৌ কোন মামুলি ব্যাপার নয়। কয়দিন ধরে যে সে অনাহারে আছে, কে জানে।

পরিস্থিতি লাঘব করার ইরাদায় বখতিয়ার সাহেব কিছু বলতে গেলেন। কিন্তু ইওজ খলজি সাহেব তখন আওয়ারা। তাঁকে মুখ খোলার ফুরসুতটাও না দিয়ে ইওজ খলজি সাহেব ঝড়ের বেগে বাড়ির মধ্যে ছুটে গেলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আবার খাবার নিয়ে ফিরে এলেন এবং বখতিয়ার সাহেবের পাশে বসে নিজে তাঁকে পরিবেশন করে খাওয়ানোর পর তখনই তাঁকে শুইয়ে দিলেন। বিশ্রামের আগে ইওজ সাহেব তাকে কথা বলতে দিলেন না বা কোন কথার মধ্যে নিজেও গেলেন না।

বাদ মাগরিব দুই বন্ধু আলাপ শুরু করলেন। হুসনে আরা বেগমও এসে পর্দার পাশে দাঁড়ালেন। বখতিয়ার সাহেব আগে আদ্যঅন্ত তামাম ঘটনা বয়ান করলেন। এরপর দিলারা বানুর পত্রখানা ইওজ খলজির হাতে দিলেন।

বখতিয়ার সাহেবের বয়ান শুনেই ইওজ খলজি সাহেব বিহ্বল হয়ে গেলেন। এর উপর পত্রখানা বাড়িয়ে ধরতেই তিন তা ছো মেরে নিয়ে আলোর সামনে ঝুঁকে পড়লেন এবং এক নিঃশ্বাসে পত্রখানা আগাগোড়া পাঠ করে বিপুল উল্লাসে লাফিয়ে উঠে বললেন– মারদিয়া কিল্লা! মারদিয়া কিল্লা!! বখতিয়ার ভাই কামাল কিয়া। বিলকুল কামাল কিয়া! ওরে বাস্‌রে!

হাত-পা ছুঁড়ে ইওজ খলজি সাহেব চিৎকার করতে লাগলেন। তা দেখে পর্দার আড়াল থেকে হুসনে আরা বেগম হাসিমুখে বললেন– বহিন আমাদের কি লিখেছেন তা কিছু বলবেন না, একা একাই হাত-পা ছুঁড়ে আত্মঘাতী হবেন? ব্যাপারটি অন্যকেও বুঝতে দিন।

ইওজ খলজি সাহেব আবেগের সাথে বললেন– আরে বুঝবে কি? একদম ঘায়েল করে দিয়েছে।

ঘায়েল করে দিয়েছে?

বিলকুল ঘায়েল করে দিয়েছে। আহারে! তোফা- তোফা!

তাজ্জব! আপনি নিজেই যে ঘায়েল হয়ে গেলেন দেখছি। ব্যাপারটা কি জানতে দেবেন, না সেরেফ ঐ...

ইওজ খলজি সাহেব বাস্তবিকই বেশ একটু আওয়ারা হয়ে উঠেছিলেন। এবার তিনি কিছুটা শান্ত হয়ে বললেন– জানবে জানবে, অবশ্যই জানবে। এই পড়ছি শোনো–

–বলেই পত্রখানা আর এক দফা সশব্দে পাঠ করে ফের তিনি এ একই মেজাজে চিৎকার করে বলতে লাগলেন– বললাম না, বললাম না আমি, দোস্ত আমার সাহেবজাদীর দিলটা একদম ঘায়েল করে দিয়েছে? এমন একটা দিল ঘায়েল করতে পারা আর সমরখন্দ বুখারা দখল করে নেয়া একদম সমান।

এবার হুসনে আরা বেগমও মোহিত হয়ে গেলেন। ইওজ সাহেবের সুরে সুর মিলিয়ে তিনিও বললেন– ঠিক ঠিক! হাজার কথার এক কথা! ছোট মিয়া দেখছি একদিনেই বুবুজানকে দিওয়ানা বানিয়ে দিয়েছেন। এটা সত্যিই একটা মস্তবড় খোশ খবার!

দু'জনের ভাব দেখে বখতিয়ার খলজি সাহেব বললেন– আরে ভাবী! এর মধ্যে এত হইচই করার কি আছে! একজন মহিলা একটু আফসোস করে দু'কথা লিখেছেন দেখেই আনন্দে মেতে উঠেছেন আপনারা! এর বদলে আজ একটা নকরী যদি তোফা রকমের পেতাম, তাহলে না জানি আপনারা কি করে বসতেন!

ইওজ সাহেব বললেন– মানে? বখতিয়ার সাহেব বললেন– যে জন্যে সুদূর ঐ গজনীতে গিয়ে জান দিতে বসেছিলাম, সেই নকরীটাই পেলাম না, আর এ তো এক...

বখতিয়ার সাহেবকে তাঁর মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে ইওজ খলজি সাহেব প্রতিবাদ করে বললেন– নকরী! আরে নকরী তুমি পাওনি তো কি হয়েছে? তুমি যা পেয়েছো তা এ দুনিয়ার হাজার বাদশাহ পায় না।

সঙ্গে সঙ্গে হুসনে আরা বেগম বললেন– বিলকুল হক কথা। ধন-দৌলত প্রতিপ্রত্তি অনেক নাদানেরাও পায়। কিন্তু একটা দিলের মতো দিল পাওয়া সবার নসীবের ব্যাপার নয়।

বখতিয়ার সাহেব বললেন– ভাবী!

হুসনে আরা বেগম বললেন– তা ছাড়া নকরী পাওয়ার আশাও তো বিলকুলই খারিজ হয়ে যায়নি। বুবুজান যা বলেছেন, তাতে একটু তকলিফ করে হিন্দুস্থানে হাজির হলেই তো নকরী আপনি ইনশাআল্লাহ পেয়েই যাবেন একটা।

ইওজ খলজি সাহেব বললেন– সেরেফ নকরীটাই দেখলে? মুনাফাটা দেখলে না?

হুসনে আরা বেগম জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইতেই ইওজ সাহেব ফের বললেন– বুঝলে না? এরপরও বুঝলে না?

না। মানে, মুনাফাটা কি?

কেন, ঐ সাহেবজাদী! উনাকেও তো পেয়ে যাবেন সেই সাথে।

হুসনে আরা বেগম উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বললেন– হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই তো! সোবহান আল্লাহ! হিন্দুস্থানে ছোট মিয়াকে যেতেই হবে জলদি জলদি। রাহা খরচের কিছুটা না হয় আমি আমার হাত-কানের জেওর বেচে জুটিয়ে দেবো।

ইওজ খলজি সাহেব ফোঁশ করে উঠলেন। বললেন– কিছুটা মানে? কিছুটা

মানে কি? দরকার হলে আমি আমার গাধা বেচে তামাম খরচ জুটিয়ে দেবো, তবু হিন্দুস্থানে যেতেই হবে দোস্তকে। কি দোস্ত, রাজি তো?

হেসে ফেললেন বখতিয়ার সাহেব। হাসতে হাসতে বললেন– তোমার আর ভাবী সাহেবার আগ্রহ দেখে আমার মানসিক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে পাখা থাকলে এই মুহূর্তেই আমি উড়াল দিয়ে হাজির হতাম হিন্দুস্তানে। আর এক লহমা গরমশিরে থাকতাম না।

থমকে গিয়ে ইওজ সাহেব বললেন– মানে? তামাশা করছো?

তামাশা!

সেরেফ তামাশা। কিন্তু আমি তো দোস্ত তামাশার কথা বলিনি। গম্ভীর হলেন বখতিয়ার সাহেবও। গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– না দোস্ত, তামাশা আমিও করছিনে।

মানে?

ঠাট্টাচ্ছলে বললেও, ওটা আমার দিলের কথাই। ভেবে দেখলাম, এই গরমশিরে খামাখা আর সময় নষ্ট না করে সত্যিই আমাকে যেতে হবে হিন্দুস্তানে।

সত্যিই?

আরো বেশি শক্ত হলো বখতিয়ার সাহেবের কণ্ঠ। বললেন– হ্যাঁ, সত্যিই। তবে সেটা ঐ সাহেবজাদীর কারণে নয়, আমার জিন্দেগীটা যাচাই করে দেখার জন্যে।

খুশি হলেন ইওজ খলজি সাহেব। বললেন– মারহাবা মারহাবা!

আমার এই একঘেঁয়ে জিন্দেগীর মোড়টা আমাকে ঘোরাতেই হবে। এ সাহেবজাদীর সাক্ষাৎ পাওয়া আর তাঁর মদদে নকরী পাওয়া এটুকুই এ জিন্দেগীর একমাত্র উম্মিদ আমার নয়। নকরীটা সেরেফ উপলক্ষ্য। উম্মিদ আমার তার চেয়ে অনেক বড়।

দোস্ত!

নয়া জিন্দেগীর নয়া দুয়ার খুলতেই হবে আমাকে। কওম আর দীনের জন্যে একটা কিছু করতে চাই আমি। আর আমার এই উম্মিদ হাসিলের চাবিকাঠি এ সাহেবজাদীই নয়। মূলধন আমার আল্লাহ তায়ালা আর আমার এই দুই বাজু। দরকার হলে পাহাড় কেটে তৈয়ার করবো আমার নয়া জিন্দেগীর

 বইঘর ও রোকন

রাহা।

বখতিয়ার সাহেবের মুখমণ্ডল পাথরের মতো কঠিন আর বাহুযুগল ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে এল। তা লক্ষ্য করে ইওজ খলজি সাহেব বিহ্বলকণ্ঠে বললেন– আলহামদুলিল্লাহ!

বলেই চললেন বখতিয়ার সাহেব– আর আমার সেই নয়া জিন্দেগীর রণক্ষেত্র আমার নজরে একমাত্র এ হিন্দুস্তান। গোরস্থান হলেও ঐ হিন্দুস্তানই আখেরী মঞ্জিল আমার।

আবেগের আধিক্যে বখতিয়ার সাহেব তাঁর আজন্মের পুঞ্জীভূত উম্মিদ এই পয়লা এবং প্রশস্তভাবে মেলে ধরলেন তাঁর একমাত্র বিশ্বস্ত দোস্তের সামনে। তাঁর বজ্রকঠিন সংকল্পের চ্ছটায় ইওজ খলজি সাহেবের চোখে মুখে চমক লেগে গেল। বখতিয়ার সাহেব থামতেই ইওজ খলজি সাহেব লাফিয়ে উঠে বললেন– সাব্বাশ। এতদিন সেরেফ একটা ভাসা ভাসা ধারণাই ছিল আমার। ঐ সাহেবজাদীর মতো আজ আমারও দৃঢ় বিশ্বাস, এই দোস্তের দ্বারা সত্যি সত্যিই একটা অসাধ্য সাধন হতে পারে।

বখতিয়ার সাহেব এবার অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে বললেন– দোয়া করো দোস্ত। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আল্লাহ চাহে তো দু'একদিনের মধ্যেই আমি রওনা হবো হিন্দুস্তানে।

আল্লাহ তায়ালা নিয়াত তোমার পুরা করুন। তুমি তৈয়ার হয়ে যাও দোস্ত, রাহা খরচের ব্যাপার নিয়ে পেরেশান হতে যেও না। ওটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। যেভাবে পারি, ওটা আমরাই তোমাকে জুটিয়ে দেবো।

দোস্ত, আপনাদের এই পাক-দিলের দাম আল্লাহ তায়ালা ছাড়া মানুষের দেয়ার তাকত নেই। রাহা খরচের চিন্তা আমি আগেই করে রেখেছি। আমার ঘর-দুয়ার আর সামানাদি যা আছে তা ঐভাবেই বেচে দিলে শুধু রাহা খরচই নয়, হিন্দুস্তানে গিয়ে কয়েক দিন চলার মতো খরচাটাও জুটে যাবে।

ইওজ খলজি সাহেব চমকে উঠলেন। বললেন– সেকি! সবকিছু বেচে গেলে, ফিরে এলে করবে কি?

বখতিয়ার সাহেবের অধরে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সে হাসি আনন্দের নয়, সে হাসি সংকল্পের। তিনি প্রত্যয়ের সাথে বললেন– দোস্ত! কোন লড়াইয়ে জিততেই হবে– এমন প্রশ্ন থাকলে, পেছনে ফেরার তামাম রাস্তা রুদ্ধ করে দিয়ে তবে গিয়ে সে লড়াইয়ে নামতে হয়। নইলে দুর্বল

মুহূর্তে পা দুটি ফের পেছনের পথ খোঁজে।

হুসনে আরা বেগম এতক্ষণ নীরব হয়ে শুনছিলেন। এবার তিনি ভারী গলায় বললেন– তার মানে? ছোট মিয়া কি তাহলে এ জিন্দেগীর মতো আমাদের সাথে জুদা হয়ে যেতে চান?

বখতিয়ার সাহেবের গলাও কিঞ্চিৎ ভারী হলো। বললেন– ভাবী! সবার সাথে সবাইকে একদিন না একদিন জুদা তো হতেই হবে। আমি না হয় কয়েকটা দিন আগেই তা হলাম। তবে দোয়া করবেন, কামিয়াবী যদি এ জিন্দেগীতে আসেই আমার কোনদিন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আবার আমরা এক হবো। একই সাথে থাকবো। আপনাদের আমি দূরে ফেলে রাখবো না।

অতঃপর একদিন তিনি শামিল হলেন সুদূর আরব পারস্য গজনী থেকে গরমশিরের পাশ দিয়ে ধাবমান হিন্দুস্তানগামী ব্যবসায়ীদের এক কাফেলার সাথে।

বখতিয়ার খলজি সাহেব হিন্দুস্তানে চলে গেলেন আর ইওজ খলজি সাহেব সপরিবার রয়ে গেল গরমশিরে। দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। দিনে দিনে বদলে গেল তাঁদের (ইওজ খলজি সাহেবের) সাংসারিক অবস্থা।

ইওজ খলজি সাহেবের সংসারে খুবই টানাটানি পড়লো। তাঁর আয়-উপায়ের একমাত্র অবলম্বন সেই গাধাটির আচানকভাবে এক কঠিন বিমার হলো। খায়ও না, দায়ও না, পায়ের উপর উঠে দাঁড়াতেও পারে না। ধরে-পাকড়ে দাঁড় করালে কেবলই থর থর করে কাঁপে। হপ্তা দুই ধরে ইওজ খলজি সাহেব কোন রকম কামাই করতে পারলেন না। গাধাটাকে নিয়েই তাকে হর-ওয়াক্ত ব্যস্ত থাকতে হলো। এর উপর আবার পৈতৃক আমলের এক দেনা শোধের ভয়ানক চাপ পড়লো এ সময়। সঞ্চিত তামাম অর্থ দিয়ে সেই দেনা শোধ করার ফলে তিনি একদম কপর্দকহীন হয়ে গেলেন।

গাধাটা তাঁর সবেমাত্র সুস্থ হয়ে উঠতেই পেটের দায়ে সেই গাধা নিয়েই তাঁকে ছোট ছোট মাল টেনে কোন মতে যা হোক কিছু রোজগার করতে হতে লাগলো। তখন তিনি দিন আনেন, দিন খান। কোন কোনদিন সেই কাহিল ও কমজোর গাধা দিয়ে সারাদিনের পুরো পেট রুটিও তিনি কামাই করতে পারলেন না। এক বেলার খানা দুই বেলা ভাগ করে খেতে হতে লাগলো।

এমনই এক অবস্থার মধ্যে একদিন এক ঘটনা ঘটে গেল। সারাদিন ছুটোছুটি করেও ইওজ খলজি সাহেব সেদিন পুরোদিনের রুটির পয়সা কামাই করতে

পারলেন না। গাধাটা ফের কমজোর হয়ে পড়বে ভয়ে, দূরের কোন ভাড়া সেদিন তিনি ধরলেন না। এদিকে আবার নিকটে মাল টানার ভাল কোন কাজও তিনি পেলেন না। ফলে সারাদিন দৌড়ঝাঁপ করে যা কামাই তিনি করলেন, সাম ওয়াক্তের একটু আগে হিসেব মিলিয়ে দেখলেন, তা দিয়ে এই রাতের রুটিটাই কোন মতে হবে তাঁদের, পরের দিন সকালের কোন সংস্থান তাঁদের থাকবে না। বেলাও তখন প্রায় খতম হয়ে এসেছে। মকানে সবাই অনাহারে আছে। ফের কোন ভাড়া ধরার মতলব করলে এ অবেলায় ভাড়া আর তিনি নাও পেতে পারেন। খামাখা তাঁর বউ-বাচ্চা অনাহারে কষ্ট পাবে।

সাত পাঁচ ভেবে ইওজ খলজি সাহেব তাঁর গাধা নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। স্থির করলেন, বাড়ির পাশেই দোকান আছে, সেখান থেকে রুটির আঞ্জাম কিনবেন। www.boighar.com

বাজার থেকে বেরুতেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো দুই কংকালসার বৃদ্ধ। তাদের প্রত্যেকের পরিধানে ছেঁড়া-ময়লা এক টুকরো চট। পেট তাদের পিঠের সাথে লেগে গেছে। সারা অঙ্গে আজাড়ী আর পেরেশানীর করুণ ছাপ।

বৃদ্ধ দুটি সামনে এসেই করুণকণ্ঠে বললো– বাবা, বড় ভুখ! দুই দিন হলো এক রত্তি দানাপানিও পেটে যায়নি আমাদের। দ্বারে দ্বারে ঘুরে রুটির একটা টুকরাও কোথাও পাইনি। ক্ষুধার জ্বালায় পেট আমাদের জ্বলে যাচ্ছে। একটু কিছু পেটে দিতে না পারলে, পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকার তাকতটুকু আর আমাদের থাকবে না।

করুণ নয়নে চেয়ে বৃদ্ধ দুটি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো।

অজ্ঞাতেই জেবের মধ্যে হাত গেল ইওজ সাহেবের। বউ-বাচ্চা নিয়ে তার দিনান্তের আহার ঐ জেবের মধ্যে। গাধার দড়ি ধরে থেকে আসমান জমিন ভাবতে লাগলেন ইওজ সাহেব। বউ-বাচ্চা তাঁর দিনমান ভুখা। ভুখা তিনি নিজেও। ওদিকে আবার তাঁর চোখের সামনে জইফ দুই বৃদ্ধ দুই দিন যাবত অনাহারে। বৃদ্ধ দুটির করুণ-ক্লিষ্ট মুখের দিকে ক্ষণকাল নিবিড়ভাবে চেয়ে থাকার পর ইওজ খলজি সাহেব তাঁর সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললেন।

ঘটিবাটি একটা কিছু বন্ধক রেখে বাচ্চার জন্যে রুটির একটা সংস্থান তিনি করতে পারবেনই কোন মতে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই তারা জোয়ান মানুষ। এক দেড় দিন পানি খেয়ে কাটাতেও তাঁরা পারবেন। কিন্তু এই বৃদ্ধদের পক্ষে তো

ভুখা থাকা আর একদণ্ডও সম্ভব নয়। এদের প্রয়োজন তাঁদের চেয়ে ঢের ঢের বেশি।

সামনেই একটা সরাই। ক্ষণকাল চিন্তা করেই তিনি বৃদ্ধদের বললেন– আসুন। আপনারা আমার সাথে আসুন।

সরাইয়ে নিয়ে গিয়ে নিজে তদবির করে ভুখা দুই বৃদ্ধকে ইওজ খলজি সাহেব খাওয়ানো শুরু করলেন। খাওয়াতে খাওয়াতে শেষ পয়সাটিও যখন তাঁর শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি বৃদ্ধদের দুঃখ করে বললেন– বাবা, আর তো আমার পয়সা নেই। এইটুকুতেই আপনাদের সন্তুষ্ট হতে হবে।

বৃদ্ধদের পেট তখন ভর্তি হয়ে গেছে। আর পয়সা থাকলেও বৃদ্ধদের আর খাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। হাত ধুয়ে উঠে ইওজ খলজি সাহেবের সাথে বৃদ্ধরাও বাইরে বেরিয়ে এলেন। ইওজ খলজি সাহেব যাওয়ার উদ্যোগ করলে দুই বৃদ্ধের একজন তাঁকে প্রশ্ন করলো– বাপজান! তামাম পয়সা খরচ করে আমাদের আপনি খাওয়ালেন। বাল-বাচ্চা নিয়ে আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে তো কিছু মকানে?

ম্লান হাসি হেসে ইওজ খলজি সাহেব বললেন– আপাতত কিছু দেখছিনে। তবে ইনশাআল্লাহ ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে।

হয়েই যাবে? কিভাবে হবে? সেরেফ পানি খেয়ে?

সেটা তো বলতে পারবো না, তবে রেজেকের মালিক আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে যে রেজেক আজ বরাদ্দ করে রেখেছেন সেই রেজেকই জুটবে। তার বাইরে যাওয়ার সাধ্য তো কারো নেই।

এবার দ্বিতীয়জন বললো– অবশ্যই! তবে বউ-বাচ্চা নিয়ে নিজেকে ভুখা থাকতে হবে জেনেও আপনি যখন আমাদের তামাম পয়সা খরচ করে খাওয়ালেন, তখন আপনাকেও তো কিছু একটা দেয়ার কোশেশ করতে হয় আমাদের।

ইওজ সাহেব এবার বিস্মিত হয়ে বৃদ্ধদের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ভাবতে লাগলেন– পাগল নাকি! বলে কি! এরা আবার কি দেবে! কৌতূহলবশেই তিনি বৃদ্ধদের প্রশ্ন করলেন– আপনারা কিছু দেয়ার কোশেশ করবেন মানে?

হ্যাঁ, অবশ্যই করবো। আপনি এতটা করবেন আর আমরা কিছুই করবো না। এটা কি হয়? আপনাকে আমরা একটা সালতানাত দেয়ার জন্যে আল্লাহ

তায়ালার কাছে সুপারিশ করলাম।

নিছকই একটা মামুলি বাত হিসাবে ইওজ খলজি সাহেব হেসে বললেন– ও, এই কথা?

হ্যাঁ, এই কথা। আপনি জলদি জলদি হিন্দুস্তানে চলে যান। ওখানে গেলেই আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আপনি সুলতান হবেন একদিন।

আর কথা না বলে বৃদ্ধদ্বয় জনতার সাথে মিশে গেল। তাদের রসিকতায় ইওজ খলজি সাহেবও না হেসে পারলেন না। মলিন হাসি হাসতে হাসতে তিনিও ধীরে ধীরে মকানের দিকে রওনা হলেন।

মকানে ফিরে ইওজ খলজি সাহেব তাজ্জব বনে গেলেন। প্রকাণ্ড এক বর্তনভর্তি গোস্ত-রুটি নিয়ে স্ত্রী হুসনে আরা বেগম তাঁর জন্যে বিকেল থেকে এন্তেজারে আছেন। প্রশ্ন করতেই হুসনে আরা জানালেন, পাড়ার এক দৌলতমান্দের পুত্র সন্তান হওয়ায় খানাপিনার বিপুল আয়োজন করেছেন তিনি। সবাইকে তিনি দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছেন। তাঁদের জন্যে এই এক গামলা লোক দিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

ইওজ খলজি সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ দুটির কথা দিলে তার চকিতে একটা ঝিলিক দিয়ে গেল। আহার করতে বসে ইওজ খলজি সাহেব স্ত্রী হুসনে আরাকে তামাম ঘটনা বয়ান করে শুনালেন এবং বৃদ্ধদের সালতানাত দানের কথাও সকৌতুকে উল্লেখ করলেন।

উল্লেখ করে ইওজ খলজি সাহেব হাসতে লাগলেন। শুনে হুসনে আরা বেগম গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– তামাশা করছেন কেন? কার মধ্যে কি আছে তা বলা যায়!

ইওজ খলজি সাহেব সহাস্যে বললেন– আচ্ছা!

হুসনে আরা বললেন– তাঁরা তো ফকির দরবেশও হতে পারেন। দরবেশদের কথা তো জানি ঝুটা হয় না।

ব্যস! তবে আর কি?

তবে আর কি মানে?

(সুর করে) আমি বাদশাহ বনেছি, তুমি বেগম হয়েছো। বাদশাহ বেগম ঝম ঝমা ঝম...

হুসনে আরা বেগম রুষ্টকণ্ঠে বললেন– থামুন! সব কিছুই হেসে উড়িয়ে

দেবেন না।

অর্থাৎ?

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। ইওজ খলজি বললেন– আমি তর্কে যেতে চাইনে। তাই বলে একটা সালতানাত? মানে, আমি সুলতান হবো একটা মুলুকের?

সেই রাতেই খোয়াব দেখলেন ইওজ খলজি সাহেব। আপাদমস্তক সফেদ পোশাক পরিহিত দুই দরবেশ এসে তাঁর শিয়রে দাঁড়ালেন। মুখ দেখেই ইওজ সাহেবের মনে হলো– ঠিক এঁদেরকেই তিনি আজ সন্ধ্যায় আহার করিয়েছেন সরাইয়ে। শিয়রে দাঁড়িয়ে দরবেশদ্বয় বললেন– দরবেশের কথা ঝুটা হয় না। জলদি জলদি হিন্দুস্তানে রওনা হন। কিছু তকলিফ মুসিবত থাকলেও সালতানাত আপনি একদিন পাবেনই।

পরের দিন ফের এই খোয়াবের কথা হুসনে আরাকে বলতেই হিন্দুস্তানে যাওয়ার জন্যে জিদ ধরলেন হুসনে আরা বেগম। বখতিয়ার সাহেবের প্রসঙ্গ টেনে বললেন– ছোট মিয়া যদি এতটা মনোবল নিয়ে হিন্দুস্তানে যেতে পারে, আমরা পারবো না কেন? আমাদের নসীব তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

ইওজ খলজি সাহেব কিছুটা আপত্তির কথা তুলতেই হুসনে আরা বেগম ফের জোরদার কণ্ঠে বললেন– এখানেই বা এমন কি সুখে আছি আমরা? এভাবে মেহনত বিক্রি করে আর কতদিন চালাবেন আপনি? নসীবে যদি তকলিফ পেরেশানী থেকেই থাকে আমাদের তা এখানে থাকলেও থাকবে, হিন্দুস্তানে গেলেও থাকবে। বরং চুপ করে এক জায়গাতেই বসে না থেকে নসীবটাকে যাচাই করে দেখতে আমাদেরই বা দোষ কি? বউ-বাচ্চা নিয়ে কত লোকই এখন ভাগ্যের তালাশে হিন্দুস্তানে যাচ্ছে। তারা যদি সবাই সেখানে ভুখা হয়ে মরে, আমরাও না হয় মরবো।

কয়দিনের মধ্যেই গরমশিরের তামাম কিছু বেচে দিয়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হিন্দুস্থানগামী এক কাফেলার সাথে ইওজ খলজি সাহেবও সপরিবারে শামিল হলেন।

হিন্দুস্তানে এসে অনেক দিন পর একদিন অকস্মাৎ গজনীর আরিজ সাহেবের সাক্ষাৎ পেলেন বখতিয়ার খলজি সাহেব। তিনি অর্থাৎ বখতিয়ার সাহেব তখন বাদাউনের শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দীনের অধীনে একজন বেতনভুক্ত

বইঘর ও রোকন

সেপাই। মালিক হিজবর উদ্দীনের আদেশে বাদাউনের সচিব এলেন আজমীরের দেওয়ান সাহেবের কাছে রাজস্ব বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা জেনে নিতে। সচিব সাহেবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে যে বাহিনী গঠন করা হলো সেই বাহিনীর একজন সৈনিক হিসাবে বখতিয়ার খলজি সাহেবও আজমীর এলেন। এখানে এসেই তিনি সাক্ষাৎ পেলেন গজনীর আরিজ সাহেব ও আরিজ-কন্যার। তিনি দেখলেন, আরিজ সাহেবকে সামরিক বিভাগ থেকে রাজস্ব বিভাগে পার করা হয়েছে এবং এই আজমীরে রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান করা হয়েছে। দেওয়ান সাহেব এখন দিল্লীর শাসনকর্তার অধীনস্থ এক কর্মচারী।

সে যাই হোক, এই পরিচয়ের অর্থাৎ সাক্ষাতের পর দেওয়ান কন্যা (আরিজ-কন্যা) দিলারা বানুর গভীর প্রেম হলো বখতিয়ার সাহেবের সাথে। বখতিয়ার সাহেব দিলারা বানুর আহবানে ও আকর্ষণে ঘন ঘন আজমীরে আসতে লাগলেন এবং দেওয়ান সাহেবও পরম স্নেহে বখতিয়ার সাহেবকে গ্রহণ করলেন। কন্যা দিলারার গভীর প্রেম দেখে দেওয়ান সাহেব বখতিয়ার খলজি সাহেবের সাথেই কন্যার শাদি দিবেন, স্থির করলেন।

কিন্তু বাদ সাধলেন দিল্লীর শাসনকর্তা। শাসনকর্তাটি ছিলেন গজনীর শাহানশাহর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সেই সুবাদে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী। এই শাসনকর্তার পুত্র দেওয়ান কন্যা সুন্দরী দিলারাকে শাদি করার জন্যে উন্মাদ হয়ে গেলেন। এতে করে শাসন কর্তা তার পুত্রের সাথে দিলারার শাদি দেওয়ার জন্যে দেওয়ান সাহেবের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করলেন। দেওয়ান সাহেব অসম্মতি জানালে, দিল্লীর শাসনকর্তাটি দেওয়ান সাহেবকে দিল্লীতে ডেকে নিয়ে বললেন– তাঁর পুত্রের সাথে দেওয়ান সাহেব তাঁর কন্যার শাদি না দিলে যে ষড়যন্ত্রে পড়ে তাঁকে এই হিন্দুস্তানে আসতে হয়েছে, ষড়যন্ত্রের ঐ মিথ্যা ঘটনাকেই সত্য ঘটনা বলে তিনি শাহানশাহকে জানাবেন আর তার পরিণাম দেওয়ান সাহেবকে সোচ্ করতে বললেন।

একথা শুনে চমকে উঠলেন দেওয়ান সাহেব। সেক্ষেত্রে তাঁকে সপরিবার জীবন্ত পুঁতে ফেলবেন শাহানশাহ। ফলে দিল্লী থেকে ফিরে এসেই বখতিয়ার সাহেবকে নিরালায় ডেকে নিলেন দেওয়ান সাহেব। পরিস্থিতি আগাগোড়া বর্ণনা করে দুই হাতে বখতিয়ার সাহেবের এক হাত চেপে ধরলেন।

ঝরঝর করে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন– বাবা, তুমি আমাদের বাঁচাও! নিশ্চিত ধ্বংস থেকে তুমি আমার পরিবারটা রক্ষে করো। তুমি সরে

দাঁড়ালেই দিলারাকে সমঝে নিতে পারবো আমরা!

অসহায় দৃষ্টি হেনে আর্তের মতো চেয়ে রইলেন দেওয়ান সাহেব। বখতিয়ার সাহেবের সর্বাঙ্গ মুর্দার মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দিলটা তাঁর ফেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বৃদ্ধের এই সকরুণ আবেদন আর আহাজারী উপেক্ষা করতে না পেরে রুদ্ধকণ্ঠে 'আচ্ছা তাই হবে' বলে অশ্বের লাগাম টেনে নিয়ে অশ্রুর তুফান তুলে দেওয়ান সাহেবের মকান থেকে বেরিয়ে গেলেন বখতিয়ার খলজি সাহেব। দিলারার জন্যে রেখে গেলেন এক পত্র। দেওয়ান সাহেব ছাড়া দুসরা কেউ তা জানলো না। পত্রে বখতিয়ার সাহেব লিখলেন–

'রুচি বদল করার ইরাদায় দু'দিনের জন্যে আজমীরে এসেছিলাম। রুচিটা বদলে নিয়ে চলে গেলাম। শাদি করার খাহেশ কিছুমাত্র নেই আমার, ছিলও না কোনদিন। আমার এই জীবনের দুর্বার গতিপথে শাদি একটা মস্তবড় জঞ্জাল। মস্তবড় বিপত্তি। ও আমার অসহ্য। আপনি আপনার পথ দেখুন।'

বখতিয়ার সাহেবের পত্র পড়ে কক্ষের মধ্যে মূর্ছা গেলেন দিলারা বানু বেগম।

০ ০ ০

অশ্বের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে আজমীর থেকে দিল্লীর দিকে ছুটতে লাগলেন বখতিয়ার খলজি সাহেব। নিজের দিলের নিদারুণ হাহাকার ছাপিয়ে দেওয়ান সাহেবের আখেরটা বড় বেশি বাজতে লাগলো বখতিয়ার সাহেবের অন্তরে। নিজেকে তিনি মস্তবড় অপরাধী বোধ করতে লাগলেন। তাঁর জন্যেই হয়তো বা দেওয়ান সাহেবের পরিবারটা গোটাই মিসমার হয়ে যাবে।

তাই দিল্লীর শাসনকর্তার পুত্র আরমান খাঁর সাথে তিনি নিজে গিয়ে সাক্ষাৎ করে মাফ মাফী মেঙ্গে তাঁকে শান্ত করার জরুরত বোধ করলেন। দিলারা তাঁকে শাদি করতে চাইলেও তিনি একজনের বাগদত্তাকে শাদি করতে অনিচ্ছুক– এ বার্তা আরমানকে নিজে গিয়ে পৌঁছে দিলে দেওয়ান সাহেবের উপর তাদের জুলুমটা হালকা হবে বিবেচনায় তিনি দিল্লীর দিকে ছুটতে লাগলেন।

বেখেয়ালে ছুটে চলেছেন বখতিয়ার সাহেব। দিল তার উদাস! ভাবহীন অস্তিত্বহীন। দিল্লী শহরে প্রবেশ করতেই তাঁর সামনে পড়লো এক ভিস্তিওয়ালা। বখতিয়ার সাহেবের দৃষ্টি তখন শূন্যে। কোন দিকে খেয়াল নেই। যেমন তিনি ছুটছিলেন তেমনই ছুটতে লাগলেন। ফলে তাঁর অশ্বটা

সামনের দিকে এগুতেই অশ্বের সাথে ধাক্কা লেগে ভিস্তিওয়ালা হুমড়ি খেয়ে রাস্তার উপর পড়ে গেল। মশকটা তার কাঁধ থেকে একপাশে গড়িয়ে পড়লো। মশকের তামাম পানি রাস্তার উপর ঢেলে পড়লো। চারদিক থেকে ছুটে এলো লোকজন।

ভিস্তিওয়ালার কাতরোক্তি কানে যেতেই ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন বখতিয়ার সাহেব। লাফ দিয়ে অশ্ব থেকে নেমে তিনি ভিস্তিওয়ালাকে টেনে তুললেন। তাকে টেনে তুলেই চমকে উঠলেন বখতিয়ারে সাহেব। তাঁর সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগলো। একি! এ যে তার পরম দোস্ত ইওজ খলজি সাহেব!

ইওজ খলজি সাহেবও বখতিয়ার সাহেবকে দেখে কেঁদেই ফেললেন ঝর ঝর করে। হতভম্ব বখতিয়ার সাহেব ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন– দোস্ত, তুমি এখানে!

কাফেলার সাথে ইওজ খলজি সাহেব সপরিবার সরাসরি দিল্লীতে এসে হাজির হন। কয়েকদিন তিনি বখতিয়ার সাহেবকে নানা স্থানে তালাশ করেন। সঙ্গে আনা পুঁজিটা ক্রমেই ফুরিয়ে যেতে দেখে রেজেকের তালাশেও তিনি বেপরোয়া ঘুরে বেড়ান কয়েকদিন। শেষ অবধি একেবারেই রিক্তহস্ত হয়ে পড়ায় এই ভিস্তিওয়ালার কাজটা যোগাড় করেছেন কোনমতে। বখতিয়ার সাহেবের প্রশ্নোত্তরে তিনি কাতরকণ্ঠে বললেন– সবই নসীব!

একই রকম উদ্বেগের সাথে বখতিয়ার সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন– ভাবী কোথায়? আমার ভাতিজা?

নিস্তেজকণ্ঠে ইওজ খলজি সাহেব বললেন– শহরের বাইরে এক বস্তিতে।

কোথায় সে বস্তি? এসো, এসো এখনই। আমি যাবো সেখানে।

কিন্তু

কোন কিন্তু নেই। এসো!

এই মশকটা?

নিজের, না ধার করা?

নিজের।

ফিঁকে দাও। এসো জলদি...

ইওজ সাহেবকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে বখতিয়ার সাহেব ফের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ইওজ সাহেবের ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে তাঁরা নিতান্তই নোংরা ও

তুচ্ছ এক বস্তিতে এসে হাজির হলেন।

বখতিয়ার সাহেবকে দেখেই হুসনে আরা বেগম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তা দেখে বখতিয়ার সাহেব বললেন– আল্লাহ তায়ালার কাছে শোকর গোজারী করেন ভাবী। একমাত্র তাঁরই রহমে আমাদের এই আচানকভাবে মোলাকাত ঘটে গেল।

চোখের পানি মুছে হুসনে আরা বেগম প্রশ্ন করলেন– আপনি এখন কোথায় আছেন ছোট মিয়া?

জবাবে বখতিয়ার সাহেব বললেন– যেখানে আছি সেখানেই আপনাদের শিগগির আমি নিয়ে যাবো ভাবী। কিন্তু আমি তো আপনাদের নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলাম। দেখা হয়নি তাদের সাথে?

ইওজ খলজি সাহেব বললেন– কই, নাতো!

বখতিয়ার সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন– গরমশির থেকে কবে বেরিয়েছেন আপনারা?

জবাবে ইওজ খলজি সাহেব যা বললেন তাতে বখতিয়ার খলজি সাহেব হিসাব করে দেখলেন, সেপাইরা পৌঁছার অনেক আগেই ইওজ খলজি সাহেব সপরিবার গরমশির ত্যাগ করে এসেছেন। হিসাব মিলিয়ে দেখে বখতিয়ার খলজি সাহেব ফের স্বগতোক্তি করলেন– কিন্তু সিপাইরা আমার গেল কোথায়? সীমান্তে আমি থাকতে তো ফিরে তারা আসেনি?

বখতিয়ার সাহেবকে বিড়বিড় করতে দেখে ইওজ সাহেব প্রশ্ন করলেন– ব্যাপার কি দোস্ত? সেপাই, সীমান্তে...

ওসব পরে হবে। এবার এসো তো দেখি আমার সাথে!

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ইওজ খলজি সাহেবের ছেলেটাকে অশ্বের পৃষ্ঠে চাপিয়ে দিয়ে বখতিয়ার খলজি সাহেব অশ্বের লাগাম ধরে, ইওজ সাহেব ও হুসনে আরা বগেমকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে শহরের এক সম্ভ্রান্ত সরাইয়ে এসে উঠলেন। পরের দিন এক ফাঁকে তালাশ করে গিয়ে আরমান খাঁকে সমঝিয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা করে রেখে এলেন। তার পরের দিন ইওজ সাহেবদের সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যার পথে পা বাড়ালেন বখতিয়ার খলজি সাহেব।

দিল্লী থেকে অযোধ্যা আসার পথেই ইওজ সাহেব ও হুসনে আরা উভয়েই দিলারা বানুর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন আর তা জানার জন্যে কয়েকবার

বইঘর ও রোকন

প্রশ্ন করেন। প্রতিবারেই 'পরে বলবো' বলে বখতিয়ার সাহেব তাঁদের নিবৃত্ত করে রাখেন।

বখতিয়ার সাহেবের আস্তানায় এসে হাজির হওয়ার পরের দিন তাঁরা এক সময় বখতিয়ার সাহেবকে ফাঁকে পেয়ে প্রশ্ন করলেন– কৈ, দিলারা বহিনের ব্যাপারে কোন কিছুই তো এখনও আমরা জানলাম না। একবার ভাবলাম, বহিন বোধ হয় এই মকানেই আছেন। কিন্তু কৈ, তাতো নেই?

সীমান্তের ব্যাপার নিয়ে বখতিয়ার সাহেবের মন মেজাজ গরম ছিল। এর মাঝে ঐ একই প্রশ্ন আবার টেনে আনায় বখতিয়ার সাহেব বড় বিব্রতবোধ করলেন। তিনি না-খোশ কণ্ঠে বললেন– দোস্ত, দেখতেই তো পাচ্ছো, কি অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দিন কাটছে আমার। দিলারা বানুর চিন্তা-ভাবনা করার এখানে অবকাশ আমার কৈ?

ইওজ খলজি সাহেব বললেন– চিন্তা-ভাবনা করার কথা তো আমরা কেউ বলছিনে দোস্ত। আমরা বলছি, হিন্দুস্তানে এসে তাঁর সাথে আদৌ তোমার মোলাকাতটা ঘটেছে কি ঘটেনি!

বখতিয়ার সাহেবের বুকটা আবার টন টন করে উঠলো। উষর জিন্দেগী তার উষরই থেকে গেল– এ ব্যথাটা পুনরায় নাড়া দিয়ে উঠলো। অতিকষ্টে যে ক্ষতটা ঢেকে রাখতে চান তিনি সেখানেই এরা হাত দিচ্ছে বার বার। দিলারার পাক-পবিত্র দিল আর তার অনুপম মুহব্বত যেভাবে তিনি দু'পায়ে দলে দিয়ে এসেছেন, তার কি কাহিনী বখতিয়ার এদের বলবেন! যে মিথ্যাচার করেছেন তিনি, যে অমানুষিক আঘাত একটা নিষ্পাপ অন্তরে তিনি হেনেছেন, তাতে এ প্রসঙ্গে কথা বলার কোন মুখ আর আছে তাঁর?

ইওজ খলজি সাহেবের প্রশ্নের কোন তাৎক্ষণিক জবাব বখতিয়ার খলজি সাহেব তালাশ করে পেলেন না। খানিকক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললেন– জমিনে বাস করে, কি হবে ঐ আসমানের তারার সাথে মোলাকাতের প্রসঙ্গ টেনে?

হুসনে আরা বেগম বললেন– মানে?

বখতিয়ার সাহেব বললেন– এগুলো দূর থেকে দেখার জিনিস ভাবী। হাতের মধ্যে পাওয়ার বস্তু নয়।

ইওজ খলজি সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– এ্যাঁ! মোলাকাত তাহলে হয়েছিল?

হ্যাঁ, হয়েছিল। ঐ যে বললাম, এগুলো সেরেফ দেখার বস্তু। অতি ঊর্ধ্বের

পদার্থের মধ্যে অনেক জটিলতা দোস্ত। হাত বাড়ালে হাতে পাওয়া তো যায়ই না, তার উপর ফের তপ্ত পদার্থে মর্ত্যের লোকের হাত লাগানোও সম্ভব নয়। তাতে হাতই শুধু পুড়ে না, দিলটাও ঝলসে যায়।

ইওজ খলজি সাহেব বললেন– তোমার বক্তব্য বড় জটিল হয়ে যাচ্ছে দোস্ত। একটু খোলাসা করে কি বলবে, ওঁরা এখন কোথায় আর কি অবস্থায় আছেন?

আজমীরের সুরম্য অট্টালিকায় সুখেই আছেন দেওয়ান সাহেব অর্থাৎ গজনীর সেই আরিজ সাহেব। তবে

তবে?

এক উজিরজাদা খসম নিয়ে এই মুহূর্তে দিলারা বানু কি অবস্থায় আছেন, তা আমার পক্ষে বর্ণনা করা শক্ত।

ইওজ খলজি সাহেব ও হুসনে আরা বেগম এক সাথে চমকে উঠলেন। উভয়েই এক সাথে ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– তার মানে? দিলারা বুবুর শাদি তাহলে ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে?

ভারাক্রান্ত দিলে বখতিয়ার সাহেব বললেন– কথাবার্তা অনেক আগে থেকেই পাকা হয়ে আছে। বরপক্ষের যে আগ্রহ দেখে এসেছি, তাতে এ কয়দিনে হয়ে যাওয়ারই কথা।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনই আর্তনাদ করে উঠলেন– সেকি!

রুদ্ধকণ্ঠ পরিস্কার করে নিয়ে বখতিয়ার সাহেব ফের বললেন– তাই দিল নিয়ে আর কোন কারবারই নেই আমার। তামাম কারবার এখন আমার তলোয়ার নিয়ে। কওমের খেদমতে জান কোরবান করা নিয়ে।

ইওজ সাহেব ধরা গলায় বললেন– দোস্ত!

বখতিয়ার সাহেব বললেন– বেঁচে থাকার জন্যে তো প্রত্যেক ইনসানেরই অবলম্বন চাই একটা। কওমের খেদমতে একটা বড় কিছু করার আমার আজন্মের সাধ। অবশ্য হৃদয়ের চাওয়া পাওয়ার সাধটুকুও জড়িয়ে ছিল তার সাথে। সেই হৃদয়টাই টুটে গেল। একদিক দিয়ে ভালই হলো ইয়ার। কওমের খেদমতে এখন একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারবো।

সকলেই নীরব হয়ে গেলেন। কারো মুখেই কোন কথা জোগালো না।

পরবর্তীকালে বখতিয়ার সাহেব তামাম ঘটনা বর্ণনা করে দুই স্বামী-স্ত্রীকে শুনালেন। সেই সাথে তাঁদের শুনালেন, দিলারা বানু তাঁকে ছাড়া আর

বইঘর ও রোকন

কাউকেই শাদি করতে চাননি। যে উজিরজাদা জোর করে দিলারা বানুকে শাদি করতে চেয়েছিলেন, সেই উজিরজাদা এক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন।

বখতিয়ার সাহেবের বর্ণনা থেকে দুই স্বামী-স্ত্রী, অর্থাৎ ইওজ খলজি সাহেব ও হুসনে আরা বেগম অতঃপর বুঝলেন যে, দিলারা বানু ও বখতিয়ার সাহেব বরাবরই উভয়ে উভয়কে শাদি করার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছেন। তবে এক্ষণে একটা ভুল বুঝাবুঝি তাঁদের মধ্যে শক্তভাবে কাজ করছে।

তাঁরা ঠিকই বুঝেছিলেন। আসলে ব্যাপারটা তাই-ই। পরবর্তীকালে একটা ভুল বুঝাবুঝির ব্যাপার। তবে সে ভুল বুঝাবুঝিটা এক তরফা, এক পক্ষের এবং তা দিলারা বানুর একারই। বখতিয়ার সাহেবের এখানে কোন সম্পৃক্ততা নেই। একটা মস্তবড় ভুল তথ্য পাওয়ার ফলে বিগড়ে গিয়েছিলেন দিলারা বানু। যারপর নেই দুর্ব্যবহার করে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বখতিয়ার সাহেবকে। বখতিয়ার সাহেবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। নিজের দুঃখে নিজেই তিনি গুমরে গুমরে মরছিলেন। বখতিয়ার সাহেব বার বার চেষ্টা করেও মন ফেরাতে পারেননি দিলারা বানুর। পাননি তাঁর ভালবাসা। এতে করে দুঃখ-বেদনায় মর্মাহত হয়ে বেঁচে থাকার তামাম উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন বখতিয়ার সাহেব। মৃত্যুই তখন তাঁর একমাত্র কাম্য হয়ে উঠলো।

ফলশ্রুতিতে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তিব্বত জয়ের মতো এক আত্মঘাতী অভিযানে পা বাড়ালেন বখতিয়ার সাহেব। তিব্বত অভিযানে যাত্রা করার আগে বখতিয়ার সাহেব তাঁর সাম্রাজ্যকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে তাঁর তিন ইয়ার ইওজ খলজি, ঈজ্জউদ্দীন শিরান খলজি ও আলীমর্দান খিলজিকে তিন এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের শাসনকর্তা হলেন ইওজ খলজি সাহেব, পশ্চিম অঞ্চলের শাসনকর্তা হলেন ঈজ্জউদ্দীন মোহাম্মদ শিরান খলজি আর উত্তর-পূর্ব অর্থাৎ দেবকোট অঞ্চলের শাসনকর্তা হলেন আলী মর্দান খলজি। এভাবে সাম্রাজ্যের বিলি-বণ্টন শেষ করে আত্মঘাতী তিব্বত অভিযানে যাত্রা করলেন বখতিয়ার খলজি সাহেব।

জান কোরবান করার এই যুদ্ধে তাঁর যাত্রা করার পর ভুল ভাঙ্গলো দিলারা বানুর। তিনি বুঝতে পারলেন বখতিয়ার সাহেব সম্পূর্ণ নির্দোষ। দিলারা বানু ছাড়া আর কারো দিকে হাত বাড়াননি বখতিয়ার সাহেব। নিছক এক মিথ্যা তথ্য পেয়ে অর্থাৎ বখতিয়ার সাহেবের চার চারটে পত্নী আছে, এক ডজন উপপত্নী আছে, বখতিয়ার সাহেব নেশাখোর ইত্যাদি ভুল ও ভুয়া তথ্য পেয়ে

 বইঘর ও রোকন

বখতিয়ার সাহেবকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন তিনি। প্রচণ্ড আঘাত করেছেন তার কোমল ও পবিত্র অন্তরে। এটা বুঝতে পেরেই দিলারা বানু পালকিযোগে আজমীর থেকে ছুটে এলেন লাখনৌতিতে। ছুটে এলেন লাখনৌতির রাজধানীতে।

কিন্তু তখন প্রায় সব শেষ। সর্বনাশা তিব্বত অভিযানে সর্বশান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় দেবকোটে ফিরে এলেন বখতিয়ার সাহেব। সংবাদ পেয়ে দেবকোটে ছুটে গেলেন দিলারা বানু। কিন্তু সবই তাঁর পণ্ডশ্রম হলো। বখতিয়ার সাহেব দেবকোটে এসে একেবারেই নিস্তেজ ও অসার হয়ে পড়ে থাকার সময় দেবকোট অঞ্চলের শাসনকর্তা বেঈমান আলী মর্দান খলজির মসনদের লোভ চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তিনি দেখলেন, এক দেড় দিনের মধ্যেই বখতিয়ার সাহেব ইন্তেকাল করবেন। কয়েকদণ্ডের মধ্যেও ইন্তেকাল করতে পারেন তিনি। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর তিন ইয়ারের যিনিই আগে মসনদে উঠে বসবেন, তিনিই হবেন লাখনৌতির সর্বময় কর্তা অর্থাৎ সুলতান। এটা চিন্তা করেই আলী মর্দান খঞ্জর (বড় ছুরি) হাতে নিলেন। খঞ্জর হাতে নিয়ে নির্জনকক্ষে শায়িত মুমূর্ষু বখতিয়ার সাহেবের বুকে আমূল বসিয়ে দিলেন তা। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল বখতিয়ার সাহেবের ইহ-জিন্দেগীর তামাম লেনদেন। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তৎক্ষণাৎ।

দেবকোটে পোঁছে পালকির মধ্যে থাকতেই বখতিয়ার সাহেবের মৃত্যু খবর কানে এলো দিলারা বানুর। সঙ্গে সঙ্গে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দিলারা বানু বেগমও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন পালকির মধ্যেই।

সে যাই হোক, বখতিয়ার সাহেবের ইন্তেকালের পরে পরেই শুরু হলো বখতিয়ার সাহেবের তিন ইয়ারের মধ্যে লড়াই। নিমকহারাম আলী মর্দান বখতিয়ার সাহেবকে হত্যা করেছে শুনেই সাম্রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চলের শাসনকর্তা ঈজ্জউদ্দীন মোহাম্মদ শিরান খলজি সাহেব দেবকোটে ছুটে এলেন। এসে তিনি প্রথমে তাঁদের পরলোকগত নেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করলেন ও শোক পালন করলেন। আলী মর্দান খলজি তখন তাঁর ইকতার কেন্দ্র বরসৌলে। দেবকোটে উপস্থিত খলজি আমীর ও সৈনিকবৃন্দ তৎক্ষণাৎ শিরান খলজি সাহেবকে নেতা নির্বাচন করলে শিরান খলজি সাহেব লাখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করলেন। অতঃপর শিরান খলজি সাহেব বখতিয়ার খলজি সাহেবের হত্যাকারী বেঈমান আলী মর্দানকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে আলী মর্দানের ইকতা বরসৌল আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে আলী মর্দান

বইঘর ও রোকন

পরাজিত ও বন্দী হলেন। হাজী বাবা ইস্পাহানী নামক এক কোতোয়ালের অধীনে আলী মর্দানকে বন্দী করে রেখে শিরান খলজি সাহেব দক্ষতার সাথে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

কিন্তু পরিস্থিতি অধিককাল শান্ত রইলো না। মোহাম্মদ শিরান খলজি সাহেব দক্ষতার সাথে রাজ্য শাসন করতে থাকলেও আলী মর্দান খলজি হঠাৎ পলায়ন করে লাখনৌতির শান্তি ভঙ্গ করলেন। আলী মর্দান কোতোয়াল হাজী বাবা ইস্পাহানীকে উৎকোচ দানে বশীভূত করে পলায়ন করতে সক্ষম হলেন এবং সোজা দিল্লীতে গিয়ে সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেকের শরণাপন্ন হলেন। শরণাপন্ন হয়েই আলী মর্দান কুতুবউদ্দীনকে লাখনৌতি আক্রমণ করার জন্যে প্ররোচিত করলেন। কুতুবউদ্দীনও হয়তো সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। তিনি অযোধ্যার গভর্নর কায়েমাজ রুমীকে লাখনৌতি আক্রমণ করে লাখনৌতির আমিরদের বিরোধ মীমাংসা করতে এবং প্রত্যেক আমীরকে স্ব স্ব ইকতায় বহাল করতে আদেশ দিলেন।

কায়েমাজ রুমী আদেশ পালনে যাত্রা করলে প্রথমেই বখতিয়ার সাহেবের প্রধান ইয়ার হুসামউদ্দীন ইওজ খলজি সাহেব বিনাযুদ্ধে কায়েমাজ রুমীর নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। খলজি মালিকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে শিরান খলজি সাহেব এমনিতেই দুর্বল ছিলেন। তদুপরি ইওজ খলজি সাহেব বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করায় শিরান খলজি সাহেব আরও অসুবিধায় পড়ে গেলেন। ফলে তিনি কায়েমাজ রুমীর সঙ্গে যুদ্ধ করা নিরর্থক মনে করলেন এবং দেবকোট ছেড়ে উত্তর-পূর্ব দিকে সরে পড়লেন।

এতে করে কায়েমাজ রুমী বিনাযুদ্ধে দেবকোট দখল করলেন এবং ইওজ খলজি সাহেবকে দেবকোটের শাসনকর্তা নিয়োগ করে অযোধ্যার পথে যাত্রা করলেন। এদিকে কায়েমাজ রুমীর প্রত্যাবর্তনের কথা শুনে শিরান খলজি সাহেব সসৈন্য দেবকোটে ফিরে এলেন এবং ইওজ সাহেবকে আক্রমণ করলেন। এই খবর পেয়ে কায়েমাজ রুমী ক্ষিপ্রগতিতে দেবকোটে ফিরে এলেন এবং পলায়নের আগেই শিরান খলজি সাহেবকে আক্রমণ করলেন। পরাজিত হয়ে শিরান খলজি সাহেব মাসেদা সন্তোষের দিকে পলায়ন করলেন আর সেখানে গিয়ে একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করার প্রক্রিয়ায় তিনি নিহত হলেন।

শিরান খলজি সাহেবের পরে ইওজ খলজি সাহেব দিল্লীর সুলতানের গভর্নর রূপে লাখনৌতির মুসলিম রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। এতে করে

 বইঘর ও রোকন

লাখনৌতি দিল্লীর একটি প্রদেশে পরিণত হলো। কিন্তু আলী মর্দান খলজি আবার লাখনৌতির শান্তি বিনষ্ট করলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, আলী মর্দান বন্দীদশা হতে পালিয়ে দিল্লীতে গিয়ে কুতুবউদ্দীন আইবেকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক আলী মর্দানকে পেয়ে দিনে দিনে খুব খুশি হয়ে গেলেন। কারণ, আলী মর্দান অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। সুখে দুঃখে তিনি কুতুবউদ্দীনকে বন্ধুর মতো অনেক সাহস ও সাহায্য দান করলেন। এতে করে কুতুবউদ্দীন আইবেক আলী মর্দানকে বন্ধুত্বের পুরস্কারস্বরূপ লাখনৌতির গভর্নর নিযুক্ত করলেন।

কিন্তু লাখনৌতির গভর্নর নিযুক্ত হওয়া এক কথা আর লাখনৌতি শাসন করতে আসা আর এক কথা। আলী মর্দান নিজে খুব ভাল করে জানতেন যে, লাখনৌতির খলজি আমীরেরা তাঁকে গ্রহণ করবে না। বখতিয়ার সাহেবকে তাঁর হত্যার কথা বা লাখনৌতির খলজি আমীরদের প্রতি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা তখন পর্যন্ত কেউ ভুলতে পারেননি। সুতরাং লাখনৌতি আসার আগে আলী মর্দান অনেক সৈন্য সংগ্রহ করলেন এবং বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে লাখনৌতির দিকে যাত্রা করলেন।

আলী মর্দানের মনে যাই থাক না কেন, লাখনৌতিতে এসে তিনি কোন বাধাই পেলেন না। ইওজ খলজি সাহেব বরং কুশী-নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আলী মর্দানকে অভ্যর্থনা জানালেন। খলজি আমীরদের মধ্যে ইওজ খলজি সাহেব ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ও কূটনীতিবিদ। তিনি তাঁর বিরোধী নেতৃবৃন্দের প্রতিও সদ্ব্যবহার করতেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। আলী মর্দান কুতুবউদ্দীন আইবেক কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ায় তিনি বুঝতে পারলেন যে, আইবেকের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁর উচিত নয়। তাই তিনি স্বেচ্ছায় আলী মর্দানের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিলেন এবং নিজে সরে দাঁড়ালেন।

আলী মর্দান খলজি একজন সাহসী সৈনিক ও যোদ্ধা হলেও তাঁর কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। তিনি অযথা রক্তপাত করতে দ্বিধা করতেন না। হঠাৎ ভাগ্য ফলে যাওয়ায় এবং লাখনৌতির অধীশ্বর হওয়ায় তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলেন।

দরবারে বসে তিনি খোরাসান, গজনী, ঘোর ইত্যাদি এলাকায় জায়গীর দান করতে লাগলেন। লাখনৌতিতে বসে তিনি নিজেকে সারা বিশ্বের অধীশ্বররূপে কল্পনা করতেন এবং সেই কল্পনা অনুযায়ী কাজ করতেন। এমন ঘটনাও আছে যে, একজন মুসলমান ব্যবসায়ী ব্যবসায় লোকসান দিয়ে নিঃস্ব হয়ে

পড়লেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন আলী মর্দানের নিকট সাহায্যের আবেদন করলেন। আলী মর্দান লোকটির নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করতে জানতে পারলেন যে, লোকটি ইস্পাহানের অধিবাসী। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান আলী মর্দান আদেশ দিলেন তাকে ইস্পাহানের জায়গীর দেয়া হোক।

সুলতানের অমাত্যেরা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। তাঁরা জানতেন যে, ইস্পাহান সুলতানের রাজ্যের বাইরে বললে সুলতান নিশ্চয়ই উত্তর দিবেন যে, তিনি শীঘ্রই ইস্পাহান জয় করে নেবেন। সুতরাং তাঁরা যুক্তি করে বললেন– 'ব্যবসায়ীটির ইস্পাহানে যাওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই।' তখন সুলতান তাকে বিপুল অর্থদান করার আদেশ দিলেন। এক কথায় বলতে গেলে, তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে লাগলেন। লাখনৌতির খলজি আমীরদের প্রতিও নিপীড়ন ও নির্যাতন শুরু করলেন। তার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে খলজি আমীরেরা হুসামউদ্দীন ইওজ খলজি সাহেবের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং গোপনে সুলতান আলাউদ্দীন আলী মর্দানকে হত্যা করলেন। এরপর আর বাধা রইলো না। জনাব হুসামউদ্দীন ইওজ খলজি বাহাদুর সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি উপাধি ধারণ করে লাখনৌতি রাজ্যের মসনদে আরোহণ করলেন।

ঠিক এই সময় আবার মসজিদ থেকে ফজরের আযান ধ্বনি ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব, সেলিম মালিক ও সেলিনা বানু সকলেই সচকিত হয়ে উঠলেন। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– এই রে! আজও রাত শেষ হয়ে গেল। আর বসে থাকা ঠিক নয়। চলো চলো, ফজরের নামাযের জন্যে তৈরি হই গিয়ে! চলো...

৫

রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী সাহেবের সেরেস্তার দপ্তরী গাফফার আলী আর তার খানসামা নছর খাঁ ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবের বাসার সামনে এসেই দাফাদাফি শুরু করলো। গাফফার আলী আফসোস করে বললো– গজব- গজব! বিলকুল গজব হয়ে গেল।

নছর খাঁ প্রশ্ন করলো– কি হলো গাফফার মিয়া?

গাফফার মিয়া বললো– চিচিম ফাঁক! একদম ফাঁক। এ্যাহ! খাজাঞ্চি হবে! এখন হ দেখি, কেমনে হোস!

কেন, কি হয়েছে?

জেনে গেছে, জেনে গেছে! সুখবরটা আগেই পৌঁছে দিয়েছে। হায় হায়, আমি আগে পৌঁছে দিতে পারলে খাজাঞ্চির পদটা ছিল আমার জন্যে লাঠির আগায় বাঁধা। কিন্তু তার আগেই...

কে জেনে গেছেরে গাফফার? কে পৌঁছে দিলো?

মহাব্বত। হিসাব-রক্ষক হাফিজ সাহেবের নওকর মহাব্বত মিয়া।

সে কি! সে জানলো কি করে!

বলে দিয়েছে। কেউ বলে দিয়েছে।

কে বলে দিলো?

তা- মানে, তুই বলে দিয়েছিস। নির্ঘাত তুই বলে দিয়েছিস!

আমি? কভভি নেহি। আমি বলে দিবো কেন?

তংকার লোভে। রুপিয়া বাগিয়ে নিয়ে তুই বলে দিয়েছিস।

রুপিয়া বাগিয়ে নিয়ে?

আলবত রুপিয়া বাগিয়ে নিয়ে! তুই শালা জানিস এই দপ্তরী গাফফার আলী থাকতে তোর খাজাঞ্চি হওয়ার এক তিলও সুযোগ নেই। রাজস্ব উজির হুজুর

তোর মতো একটা খানসামাকে কখ্খনো খাজাঞ্চি বানাবেন না। তাই রুপিয়া খিঁচে লিয়ে হাফিজ সাহেবের নফর মহাব্বতকে তুই বলে দিয়েছিস। ও ব্যাটা মোটা মাল ঢেলেছে নিশ্চয়ই?

www.boighar.com

কেন? মহাব্বত মিয়া মাল ঢালবে কেন? তার কি লাভ?

তার কি লাভ? খবরটা আগে পৌঁছে দিতে পারলে, মহাব্বত মিয়া হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেবের সহকারীর পদ পেয়ে যাবে যে!

: আহা! কি তোর অনুমান! মহাব্বত হবে হিসেব সহকারী!

: হবে- হবে। সে জন্যেই তো মহাব্বত মিয়া এ বাড়িতে এসেছিল।

এ্যাঁ! এ বাড়িতে এসেছিল?

জি হ্যাঁ, এসেছিল! আর এসে এ বাড়ির মেহমান সেলিম মালিক সাহেবকে সুখবরটা বলে দিয়েছে।

কেন, তাঁকে বলে দেবে কেন?

কেন? শালা তোর মাথায় আছে ষাঁড়ের গোবর! এই সুখবরটা দেয়ার পুরস্কারস্বরূপ সেলিম মালিক সাহেব সুপারিশ করলে হাফিজ আহম্মদ সাহেব নির্ঘাত তাকে হিসাব সহকারী বানাবেন। হাফিজ সাহেবের সাথে সেলিম মালিক সাহেবের জব্বোর দহরম মহরম আছে না?

: বলিস কি?

অমনি কি বলছি? খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, মহাব্বাত মিয়াও নেই, সেলিম মালিক সাহেবও নেই। মহাব্বত মিয়াই সেলিম মালিক সাহেবকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেছে।

এই সময় ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব অন্দর থেকে বেরিয়ে এসে দহলিজে বসলেন। তা দেখতে পেয়ে গাফফার আলী আর নছর খাঁ ছুটে দহলিজের দুয়ারের কাছে এলো এবং এক সাথে বললো– আসসালামু আলাইকুম হুজুর! আসসালামু আলাইকুম!

সালামের জবাব দিয়ে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– তোমরা! তোমরা কি চাও?

গাফফার আলী বললো– কিছু চাইনে হুজুর, সুখবরটা জানাতে এসেছি।

খলজি সাহেব বললেন– সুখবর! কিসের সুখবর?

গাফফার আলী উদগ্রীব হয়ে বললো– সেকি হুজুর! সুখবরটা জানেন না?

মানে কেউ আপনাকে বলেনি?

নাতো! কিসের সুখবর?

আনন্দিত হয়ে ওঠে গাফফার আলী বললো– আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে আমি আগে সুখবরটা জানাই–

এবার নছর খাঁ দৌড়ে সামনে এসে বললো– না, না! তাহলে আমি আগে জানাবো।

গাফফার আলী বললো– কখ্‌খনো না। আমি আগে জানাবো।

নছর খাঁ বললো– হরগিজ নেহি! আমি আগে জানাবো।

দু'জন গোলমাল শুরু করলে ইয়াউদ্দীন খলজি সাহেব ধমক দিয়ে বললেন– খামোশ! একজন কথা বলো!

গাফফার আলী লাফিয়ে উঠে বললো– আমি বলি হুজুর?

খলজি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন– হ্যাঁ, তুমিই বলো! তুমিই বলো...

বলেই তিনি নছর খাঁকে উদ্দেশ্য করে গরমকণ্ঠে বললেন– এই, তুমি থামো। কোন কথা বলো না।

অলক্ষ্যে কপালে করাঘাত করে নছর খাঁ অনুচ্চকণ্ঠে বললো– হায়রে আমার কপাল!

গাফফার আলী বললো– শুনুন হুজুর, শুনুন! সুখবরটা হলো, আপনার নাতনীর শাদি।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– আমার নাতনী মানে?

মানে, সৈন্য বিভাগের উজির শাহাবুদ্দীন খলজি হুজুরের মেয়ের শাদি।

চুপ রও! এই আজগুবী খবর তুমি কোথায় পেলে?

আজগুবী নয় হুজুর! বাস্তব খবর!

বাস্তব খবর?

জি- জি। রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ হুজুরের সাথে আপনার ছেলে উজির শাহাবুদ্দীন হুজুরের কথাবার্তা আমি নিজ কানে শুনেছি।

কথাবার্তা! কি কথাবার্তা?

রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী সাহেব তাঁর ছেলে বাহারাম কোরেশীর সাথে আপনার ছেলে শাহাবুদ্দীন খলজি উজির হুজুরের মেয়ের শাদির কথা

বললেন।

সে কি! আমার ছেলে কি বললো?

উজির হুজুর বললেন– মেয়ের আমার শাদির বয়স অনেকদিন আগেই হয়েছে। মেয়ে পছন্দ হলে আপনার ছেলের সাথে অবশ্যই আমার মেয়ের শাদি দেবো আমি।

তারপর?

রাজস্ব উজির বললেন– পছন্দ- পছন্দ! আমার ছেলে জব্বোর পছন্দ করেছে আপনার মেয়েকে। উজির শাহাবুদ্দীন হুজুর বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে বাসায় সবার সাথে আগে আলোচনা করে নিই। তারপর একদিন বসে শাদির দিন তারিখ পাকাপাকি করে ফেলবো।

বাইরে উচ্চকণ্ঠে কথাবার্তা শুনে অন্দর থেকে দহলিজে এলো সেলিনা বানু বেগম। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবকে প্রশ্ন করলো– কিসের দিন তারিখ দাদু?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব থতমত করে বললেন– তোমার শাদির দিন তারিখ।

সেলিনা বানু ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো– কি বাজে বকছেন? আমার শাদির দিন তারিখ মানে?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– তাই তো শুনছি। বরের আব্বাকে নাকি কথা দেয়া হয়ে গেছে।

খুন করবো। কে দিয়েছে কথা?

তোমার আব্বা।

কাকে দিলেন কথা? কে বরের আব্বা?

: রাজস্ব উজির কোরেশী সাহেব। বর তাঁর ছেলে বাহারাম কোরেশী।

তার মানে, তার মানে?

মানে আবার কি? শাহাবুদ্দীন নাকি কথা দিয়েই ফেলেছে।

খেলা? খেলা পেয়েছেন আব্বাজান? আমি গরু না ছাগল যে, যখন ইচ্ছে তখন আর যেখানে ইচ্ছে সেখানে বিক্রি কবে দিলেন? সেলিম মালিক সাহেব কৈ? সেলিম মালিক সাহেব?

এবার গাফফার আলী ভয়ে ভয়ে বললো– উনি মহাব্বত মিয়ার সাথে গেছেন। ফারজানা বেগমের নওকর মহাব্বত মিয়ার সাথে।

কোথায় গেছেন?

ওদের বাড়িতে।

সেকি! উনি কি এ খবর জানেন?

গাফফার আলী ঐ একইভাবে বললো– এ খবর শুনেই তো উনি মহাব্বত মিয়ার সাথে গেছেন।

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো সেলিনা বানু। বললো– খুন করবো! বিষ খাইয়ে মারবো! আমার শাদির কথা শুনেই উনি ফারজানার কাছে ছুটলেন? ফারজানাকে শাদি করার খাহেশ জাগলো মনে তার? জাফর মিয়া, আরে ও জাফর মিয়া? কোথায় গেলে তুমি?

ভেতর থেকে জাফর মিয়া বললো– জি, আমায় ডাকছেন?

সেলিনা বানু বললো– এক্ষণি যাও তো! ফারজানাদের বাড়িতে গিয়ে এক্ষুণি ধরে আনো তো সেলিম মালিক সাহেবকে। এক্ষুণি!

সেলিনা বানুর রাগ দেখে ভয়ে সুড়-সুড় করে সরে পড়লো গাফফার আলী ও নছর খাঁ। তারা বুঝলো, এটা মোটেই কোন সুখবর নয় আর এতে তিরষ্কার ছাড়া পুরস্কার পাওয়ার আদৌ কোন আশা নেই।

কিছুক্ষণ পরই জাফর মিয়ার সাথে সেলিম মালিক এসে হাজির হলে সেলিনা বানু বেগম শ্লেষভরে বললো– এই যে, আপনি এসেছেন? এত তাড়াতাড়িই এসেছেন?

সেলিম মালিক সেলিনা বানুর কণ্ঠ চেনে। হঠাৎ তার কণ্ঠস্বরের এই পরিবর্তনে সেলিম মালিক বিস্মিত হলো। বিস্মিতকণ্ঠে বললো– কি ব্যাপার! তুমি এভাবে কথা বলছো কেন? তোমার কথার মধ্যে কেমন যেন একটা বিদ্রূপের আভাস পাচ্ছি!

সেলিনা বানু বললো– বিদ্রূপ! না-না, বিদ্রূপ হবে কেন? বলছি এত তাড়াতাড়ি আসতে আপনি পারলেন?

সেলিম মালিক বললো– তার অর্থ?

সেলিনা বানু বললো– অর্থ, দিলে আপনার মস্ত বড় আঘাত লাগলো তো!

আঘাত! আঘাত লাগবে কেন?

বাহ! ঐকান্তিক ইচ্ছা পূরণের পথে বাধা পড়লে আঘাত কার না দিলে

লাগে!

তুমি কি বলতে চাও?

বলতে আর কি চাইবো। কত আশা নিয়ে আপনি গেলেন, মনে কত সাধ আর সুখ-স্বপ্ন! সে সব সাধ-স্বপন পূরণ হওয়ার আগেই ফিরে আসাটা রীতিমতো কষ্টের ব্যাপার বৈকি! বুকটা নিশ্চয়ই টন টন করে উঠেছে?

উঃ! তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে!

পারা কি যায়? বুকে আঘাত থাকলে কিছুই ঠিকমতো বুঝতে পারা যায় না। তা বুকটা কি একপক্ষেরই টন টন করে উঠলো, না দু'জনেরই?

খবরদার! দু'জনেরই মানে?

মানে যার কাছে গিয়েছিলেন। ভাবতে আমার অবাক লাগছে, তলে তলে ওর সাথে এতটাই মজে আছেন আপনি? সব সময় আমার কাছে থাকলেন আর আমি তা কিছুই বুঝতে পারলাম না?

দোহাই তোমার! আর হেয়ালী করো না। যা বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো।

আরো স্পষ্ট করে বলতে হবে? ফারজানা বেগমকে আপনার এতটাই পছন্দ? তার প্রতি আপনার এতটাই টান? আমার প্রতি কিছুমাত্র দরদ নেই আপনার?

সেলিম মালিক ধমকের সুরে বললো– সেলিনা বানু!

সেলিনা বানু ভারী গলায় বললো– যেই শুনলেন আমার শাদি ঠিক হয়ে গেছে, অমনি আপনি মহানন্দে ফারজানার কাছে ছুটলেন। তাকে পাওয়ার আশায় উন্মাদ হয়ে ছুটলেন। আমার মনের অবস্থা জানার কোন চেষ্টাই করলেন না। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না।

সেলিম মালিক আকাশ থেকে পড়লো। বললো– সর্বনাশ! এ তুমি কিসে কি ভেবে বসে আছো! এমন একটা আজগুবি খেয়াল কি করে মনে তোমার এলো?

আসবে না? যে রকম উন্মাদ হয়ে আপনি ওখানে ছুটে গেলেন তাতে

তাতে তোমার ধারণা হলো, আমি ফারজানাকে শাদি করতে ছুটে গেছি! সাব্বাশ! বুজদিল আর বলে কাকে!

এ্যাঁ! তা-মানে...

যে খবরটা হঠাৎ আমি পেলাম, আমি সেটা বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই

আমি তার সত্যতা যাচাই করার জন্যে ছুটে গেলাম।

সত্যতা যাচাই করতে গেলেন তো আপনি ফারজানাদের বাড়িতে গেলেন কেন?

কারণ, ফারজানাদের নওকর মহাব্বত মিয়াই আমাকে ঐ খবরটা শুনালো। কাজেই মহাব্বত মিয়া এ কথাটা পেলো কোথায়, তা যাচাই করে দেখার জন্যেই গিয়েছিলাম।

তাই কি? তা যাচাই করে কি জানলেন?

ও বাড়ির কেউই এ খবরের বিন্দু বিসর্গও জানে না। মহাব্বত মিয়াকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে সে কাঁপতে কাঁপতে বললো– এ খবর সে রাজস্ব উজিরের মকানে শুনেছে। এই নিয়ে ও বাড়ির চাকর-বাকরদের মধ্যে আলোচনারকালে নাকি সে শুনেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেলিনা বানু বললো– আচ্ছা, এই ঘটনা?

জি, এই ঘটনা। কানে হাত দিয়ে না দেখে, চিলে কান নিয়ে গেল শুনেই তুমি চিলের পেছনে দৌড়াতে শুরু করেছো।

সেলিনা বানু প্রসন্নকণ্ঠে বললো– তাই কি?

সেলিম মালিক বললো– আমি ফারজানাকে শাদি করতে গেছি, এতটাই তুমি ভাবলে? এতই হারাই হারাই ভাব তোমার?

ঈষৎ হেসে সেলিনা বানু বললো– কি জানি, পুরুষ মানুষেরই মন তো! কে কখন কার মনে দাগা দেয়, কার সাধ্য বুঝে!

শুধু সেইটেই বুঝলে? দাগা খাওয়ার ভয় সে পুরুষ মানুষেরও আছে, সে হদিস রাখো না?

মানে?

এবার যে রাজস্ব উজিরের পোলার ঘরে যেতে হবে, এ নিয়ে তোমার দুঃখ নেই?

ঝাঁটা মারি। থু থু দেই ঐ পোলার মুখে।

কিন্তু তোমার আব্বা নাকি এমন সিদ্ধান্তই নিচ্ছেন। ওখানেই নাকি শাদি দেবে তোমার।

আব্বার ইচ্ছাই কি সব? আমি রাজী না হলে আব্বা কি করবেন?

যদি জোর করেই শাদি দিতে চান?

তাহলে আমার লাশের শাদিই দেবেন। জীবিত এই আমার শাদি মাথাকুটেও দিতে উনি পারবেন না।

কেন কেন?

কেন তা বোঝেন না? ফারজানাকে শাদি করার কোন মত্তকা আপনাকে দেবো আমি ভেবেছেন?

আচ্ছা!

নিজের ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ মরে কাঁথা বয়ে। আমার দায় পড়েছে কাঁথা বওয়ার!

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব এই সময় এসে বললেন– কাঁথা বওয়া মানে? কাঁথা বইবে কেন রে নাতনী?

জবাব দিলো সেলিম মালিক। বললো– আপনার নাতনীর যে শাদি হচ্ছে রাজস্ব উজিরের ছেলের সাথে।

উপেক্ষার হাসি হেসে খলজি সাহেব বললেন– আরে দূর-দূর! শাহাবুদ্দীনের মাথা খারাপ হয়েছে বলে কি আমাদের মাথাও খারাপ হয়েছে? আমরা রাজী না হলে ওর বাপের সাধ্য আছে সেলিনার ওখানে শাদি দেয়?

সেলিম মালিক রসিকতা করে বললো– উনার বাপই যদি দেন? মানে, উনার বাপেরই যদি সে সাধ্য হয়?

খলজি সাহেব বললেন– জান গেলেও নয়। শাহাবুদ্দীনের বাপ জান গেলেও এ কাজ করবেন না।

কেন, ক্ষতি কি? ওটা তো খাশা বর।

জব্বোর ক্ষতি, জব্বোর ক্ষতি! সোনা ছেড়ে আঁচলে গেরো? হাতের কাছে হীরে থাকতে খোলাম্‌কুচি তুলে নেবো?

: দাদু!

এ ভুল আমি কখনই করবো না।

অর্থাৎ?

‘যে ভুলে তোমারে ভুলে– হীরে ফেলে কাঁচ তুলে– ভিখারী সেজেছি প্রভু! আমার সে ভুলখানি তুমি ভেঙ্গে দাও!’

–বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব।

সুলতান হুসামউদ্দীন তথা গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজির পূর্ব-জীবন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব সেদিন বর্ণনা করে শুনালেন। গরমশিরের সেই গাধাচালক কালক্রমে নিজ বুদ্ধি, সাহস ও চরিত্রগুণে যেভাবে লাখনৌতির মুসলিম রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসলেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর ব্যাপার। সেলিম মালিক ইওজ খলজি সাহেবের প্রতিবেশী হেতু ইওজ খলজি সাহেবের বাল্যজীবন সে অনেকটাই জানতো। বাল্যকাল থেকেই তারা উভয়ে উভয়ের সাথে পরিচিত। কিন্তু ইওজ খলজি সাহেবের লাখনৌতির রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার ব্যাপারটা সেলিম মালিক সম্পূর্ণ জানতেন। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবের মুখে সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ শোনার পর সেলিম মালিক স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিস্মিত হয়ে গেল সে সুলতান ইওজ খলজি সাহেবের আমন্ত্রণে লাখনৌতি এসে সুলতানের কর্মকাণ্ড দেখে।

আসলে বিস্মিত হওয়ার মতোই ব্যাপার বৈকি! সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি নিঃসন্দেহে লাখনৌতির খলজি মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ছিলেন। লাখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে তিনি শক্তিশালী ও সুসংহত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেবকোট হতে রাজধানী আবার লাখনৌতিতে স্থানান্তর করেন এবং রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্যে বসনকোট নামে একটি দুর্গ তৈয়ার করেন। বখতিয়ার খলজি সাহেব লাখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করলেও তাঁর মৃত্যুর পরে লাখনৌতির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং দেবকোট প্রাধান্য লাভ করে। পরবর্তী কয়েক বছর দেবকোটেই রাজধানী স্থাপিত ছিল। দেবকোট অপেক্ষাকৃত উত্তরে উঁচু জায়গায় অবস্থিত থাকায় দিল্লী হতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম ছিল। কিন্তু গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি সাহেব এত শক্তি সঞ্চয় করেন যে, আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তিনি রাজধানী লাখনৌতিতে সরিয়ে আনার সাহস করেন। লাখনৌতি নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যেমন উপযুক্ত ছিল, অন্যদিকে নদীপথে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাও কম ছিল না। তা ছাড়া ইওজ খলজি সাহেব আরো বুঝতে পারেন যে নদীমাতৃক পূর্ববাংলাকে জয় করতে হলে এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশকে শাসনাধীনে রাখতে হলে নৌবহরের প্রয়োজন। এতদিন তুর্কীরা শুধু অশ্বারোহী সৈন্যদের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং এই কারণে তারা নদীমাতৃক পূর্ববাংলা জয় করতে সক্ষম হয়নি। সকল দিক বিবেচনা করে ইওজ খলজি সাহেব নৌবহর গঠন করেন এবং বাঙ্গালী নাবিকদের সাহায্যে যুদ্ধ জাহাজ চালানোর ব্যবস্থা করেন। এই নৌবহরের

বইঘর ও রোকন

দ্বারা তিনি একদিক দিয়ে যেমন রাজধানী লাখনৌতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন অন্যদিকে তেমনই পূর্ববাংলা জয়ের সংকল্প করেন।

এসব ছাড়াও উল্লেখযোগ্য যে, তিনি দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেককে যতটা সমীহ করতেন, তাঁর জামাতা ইলতুতমিশ সুলতান হওয়ার পর ইলতুতমিশকে ততটা সমীহ করতেন না। তাই সুলতান ইওজ খলজি সাহেব ইলতুতমিশের নিকট থেকে সনদ (investiture) না নিয়ে সরাসরি আব্বাসীয় খলিফার নিকট থেকে সনদ (ইনভেসটিচার) নেন এবং তাঁর মুদ্রায় তিনি আব্বাসীয় খলিফার নাম অঙ্কিত করেন। এর দ্বারা তিনি নিজেকে ইলতুতমিশের সমকক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দিল্লীর সুলতানের অধীনতা অস্বীকার করে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি সাহেব নিঃসন্দেহে একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি ন্যায়বিচারক ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন আলী মর্দানের সময় খলজি আমীর ও অন্যান্য প্রজাসাধারণ যে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছিলেন তিনি তা দূর করেন এবং লাখনৌতির সকল অধিবাসীকে একতাবদ্ধ করেন। এইভাবে লাখনৌতিতে শান্তি স্থাপন করার পরে তিনি রাজ্য বিস্তারে মন দেন।

রাজ্য বিস্তারের দিকে নজর দিতে গিয়েই সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি দেখলেন, রাজ্য বিস্তারের আগে তাঁর রাজ্যের দিকে হাত বাড়িয়েছে যে বা যারা সেই বাড়ানো হাত আগে ভেঙ্গে দেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন আগে উড়িষ্যার হিন্দুরাজা তৃতীয় অনঙ্গভীম ও তার সেনাপতি বিষ্ণুর দম্ভ ও কটুক্তির সমুচিত জবাব দেয়া। সুলতান ইওজ খলজি সংবাদ পেলেন– 'লাখনৌতির রাজ্য যবন রাজ্য ও লাখনৌতির সুলতান একজন অস্পৃশ্য যবন'– এই দম্ভোক্তি করে লাখনৌতির দক্ষিণ সীমানাস্থ লাখনৌর শহরে অভিযান চালিয়ে নাখনৌর শহর দখল করেছে তৃতীয় অনঙ্গভীমের সেনাপতি বিষ্ণু। গোয়েন্দা মারফত এই সংবাদ পাওয়ামাত্র মাথায় আগুন ধরে গেল সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজির। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজি ও তাঁর আমন্ত্রিত যোদ্ধা সেলিম মালিককে জরুরী তলব দিলেন সুলতান।

সুলতানের আদেশে বার্তাবাহক দ্রুত ছুটে এলো উজির শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেবের বাসায় এবং শাহাবুদ্দীন খলজিকে সুলতানের নির্দেশের কথা জানালো। জানালো, সুলতান তাঁর ও সেলিম মালিক সাহেবের পথ চেয়ে বসে আসেন। কালবিলম্ব না করে তাঁদের এখনই সুলতান সমীপে গিয়ে হাজির

হতে হবে।

বার্তাবাহক চলে গেল। বাসায় সুলতানের বার্তাবাহক এসেছিল শুনে ঘটনা জানার জন্যে শাহাবুদ্দীন খলজির কাছে ব্যস্তপদে চলে এলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব ও সেলিনা বানু বেগম। ইয়ারউদ্দীন খলজি শাহাবুদ্দীনকে প্রশ্ন করলেন– ঘটনা কি শাহাবুদ্দীন? বার্তাবাহক কি বার্তা নিয়ে এসেছিল?

উজির শাহাবুদ্দীন বললেন– যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে আব্বাজান! উড়িষ্যা রাজার সেনাপতি নাকি আমাদের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই সুলতান বাহাদুর আমাদের দু'জনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দ্রুত সেখানে যেতে হবে আমাদের।

সেলিনা বানু বললো– আমাদের মানে? আর কাকে ডেকে পাঠিয়েছেন আব্বাজান?

উজির শাহাবুদ্দীন বললেন– সেলিম মালিককে।

সেলিনা বানু বললো– কেন কেন? সেলিম মালিককে ডেকে পাঠালেন কেন?

কেন আবার! এই জন্যেই তো সুলতান বাহাদুর সেলিম মালিককে আমন্ত্রণ করে এনেছেন।

অর্থাৎ?

সুলতানের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যেই তো সুদূর গরমশির থেকে ডেকে এনেছেন তাকে।

সে কি! তাকেও তাহলে যুদ্ধ করতে হবে?

সুলতান যদি চান এই মুহূর্তে তাকে উড়িষ্যার সেনাপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে– তাহলে তাকে শুধু যুদ্ধেই যেতে হবে না, বাহিনী সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে অধিনায়করূপে বাহিনীর অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হবে তাকে।

:ওমা, সেকি!

এতে তো তাজ্জব হওয়ার কিছু নেই! যুদ্ধ করাই তো সৈনিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

আপনাকেও কি সরাসরি লড়াইয়ে নামতে হবে?

আমি এই বিভাগের উজির। পরামর্শ দেয়া আর লড়াইয়ের ব্যবস্থা করা আমার কাজ। সেলিম মালিকের মতো দক্ষ যোদ্ধা না হলেও প্রয়োজনে আমাকেও নামতে হতে পারে বৈকি!

বইঘর ও রোকন

সেলিম মালিক সাহেব একজন যোদ্ধা, শুনেছি। উনি কি খুবই দক্ষ যোদ্ধা?

দক্ষ- দক্ষ। একজন অত্যন্ত দক্ষ যোদ্ধা বলেই তো সুলতান তাকে সুদূর গরমশির থেকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন।

তাহলে...

শাহাবুদ্দীন সাহেব বাধা দিয়ে বললেন– আর কথা নয়। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আগে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করি, পরে সব জানাবো।

সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করে ঐ দিনই সাঁঝওয়াক্তে ফিরে এলেন উজির শাহাবুদ্দীন খলজি। গেলেন সেলিম মালিকসহ তাঁরা দুইজন। ফিরে এলেন শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব একা। তা দেখে সেলিনা বানু বেগম বললো– সেকি আব্বা! গেলেন আপনারা দু'জন অথচ আপনি একা এলেন যে!

শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– বললাম না, যুদ্ধ যাত্রা করতে হবে। সেলিম মালিক যে কাজে এসেছিল সেই কাজে আটকে আছে সে। এক্ষণে তার ফিরে আসার কোন অবকাশ নেই।

তাই কি? তা কোথায় আটকে আছেন? সেনা ছাউনিতে?

হ্যাঁ, সেনাছাউনিতে কিছুক্ষণ ছিল। এখন সে ফয়েজউদ্দীন বেগ নামক এক চৌকস যোদ্ধার সাথে শলা-পরামর্শ করছে।

ফয়েজউদ্দীন বেগের সাথে পরামর্শ মানে? ফয়েজউদ্দীন বেগকে তো চিনি। তার সাথে পরামর্শ মানে?

মানে, ফয়েজউদ্দীন বেগ তার নিজের মতোই চৌকস কিছু লড়াইয়ার নেতা। একজন সেনানায়ক আর কি! সেনাছাউনিতে যে বড় বড় সৈন্যাধ্যক্ষ আছেন, ফয়েজউদ্দীন বেগ তাঁদের চেয়ে আলাদা এক ক্ষিপ্র-বাহিনীর অধিনায়ক। এই ফয়েজউদ্দীন আর তার সাগরিদেরা কাজ করবে সেলিম মালিকের অধীনে।

আচ্ছা!

লড়াইয়ে অন্যান্য সেনাপতিরা গতানুগতিক লড়াই লড়বে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেলিম মালিক ঐ ছোট অথচ ক্ষিপ্র-বাহিনী নিয়ে মরণ-আঘাত হানবে শত্রুবাহিনীর হৃদপিণ্ডে অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে।

হৃৎপিণ্ড , কেন্দ্রস্থল– এসব আবার কি?

 বইঘর ও রোকন

এসব তুমি বুঝবে না। এসব লড়াইয়ের ব্যাপার। যারা সৈনিক অর্থাৎ লড়াইয়ের ময়দানে নেমে যারা সরাসরি লড়াই করে, তারা এসব বোঝে।

অর্থাৎ?

তোমরা মেয়ে ছেলে। অন্তঃপুরে থাকো। তোমরা এসব বুঝবে কি? যেখানে লড়াই হয় সেই লড়াইয়ের ময়দানই তো দেখোনি তুমি। যাও, নিজের কাজে যাও...

সেলিনা বানু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– আমার দেখে বা বুঝে কাজ নেই। আমাকে সেরেফ একটা কথা বলুন, সেলিম মালিক এখন কোথায় আছে?

ফয়েজউদ্দীন বেগের সাথে ওদের বাড়িতে।

ওদের বাড়িতে মানে?

মানে, হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাড়িতে।

চমকে উঠলো সেলিনা বানু। বললো– হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাড়িতে! কেন, সেখানে কেন?

শাহাবুদ্দীন সাহেব বিব্রতকণ্ঠে বললেন– বললামই তো, বাহিনী সাজানো আর লড়াইয়ের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্যে।

তা সে জন্যে হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাড়িতে কেন?

শাহাবুদ্দীন সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– খামুশ! যা বোঝো না, তা নিয়ে আমাকে বিব্রত করছো কেন? কাজ না থাকে তো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে, যাও!

গরম গরম বাৎচিৎ শুনে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব দ্রুত সেখানে চলে এলেন। বললেন– কি হয়েছে- কি হয়েছে? দুই বাপ-বেটি এত ক্ষ্যাপাক্ষেপি করছো কেন?

শাহাবুদ্দীন সাহেব বললেন– বোঝান তো আব্বাজান! এই বুরবক মেয়টাকে বোঝান। লড়াইয়ের ব্যাপার নিয়ে সেনানায়ক ফয়েজউদ্দীন বেগের সাথে সেলিম মালিক হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাসায় কেন গেল, এই নাদান মেয়েটাকে বোঝান। উঃ! আমার জান ঝালাপালা করে ফেললো!

–বলেই শাহাবুদ্দীন সাহেব ক্ষিপ্তভাবে সেখান থেকে সরে গেলেন।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব সেলিনা বানুকে বললেন– সেকি! সেলিম মালিক হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাসায় যাবে না? ফয়েজউদ্দীন বেগ তো হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাসাতেই থাকে।

বইঘর ও রোকন

সেলিনা বানু ফের রুষ্টকণ্ঠে বললো– তা ঘুরে ফিরে ঐ হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাসায় কেন? যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। বার বার তিনি ফারজানার সান্নিধ্যে ছুটে যাবেন কেন?

: বার বার ছুটে গেল মানে?

গেল না? সেদিন দেখলেন না, আব্বা রাজস্ব উজিরের ছেলের সাথে আমার শাদি ঠিক ঠাক করে ফেলেছেন শুনেই উনি কি মহানন্দে ফারজানার কাছে ছুটে গেলেন?

ফিরে এসে সে তো বললোই, খবরটা ঠিক কিনা সেটা জানতে গিয়েছিল।

: তা সেটা জানতে সেখানে কেন?

আরে জ্বালা! সেলিম মালিক তো বললোই, ওদের নওকর মহাব্বত মিয়ার ঐ খবরটা মানে, তোমার শাদি ঠিক ঠাক হয়ে যাওয়ার খবরটা সত্যি না একটা উড়ো খবর– সেটা যাচাই করতে গিয়েছিল। খবরটার উৎপত্তিস্থল কোথায়, সেটা খুঁজে দেখতে।

সেটা সেলিম মালিক সাহেবের মনগড়া কথা। সেখানে যে সে হদিস উনি পাননি, তা উনিই বলেছিলেন। পাবেন যে না, সেটা উনিও জানেন, আমিও বুঝি।

; তাজ্জব! কি বুঝো তুমি?

উনি ফারজানার টানে গিয়েছিলেন। একটা দিন ফারজানাকে দেখতে না পেলে উনি অস্থির হয়ে উঠেন। ঐ অজুহাতে উনি ফারজানার কাছে গিয়েছিলেন।

সেলিনা!

ফারজানার প্রতি তার আকর্ষণ অত্যন্ত গভীর, মানে দুর্বার– সেটা বুঝতে আমার বাকী নেই। নানা ঘটনা আর পরিস্থিতির মাধ্যমে সেটা আমি নিশ্চিতভাবে বুঝে গেছি।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব নাখোশকণ্ঠে বললেন– এই হলো তোমাদের মেয়েদের এক শুচিবাই। অকারণেই এক সন্দেহ বাতিক।

সন্দেহ বাতিক? কখ্খনো না। লড়াইয়ের পরিকল্পনার অজুহাতে উনি ওখানে কামড়ে পড়ে থাকতে গেছেন। আপনি অচিরেই দেখতে পাবেন আমার কথা ঠিক কিনা?

আরে দূর! ফের ঐ সন্দেহ! সেলিম মালিক আজকেই কিংবা আগামীকাল

সকালেই ফিরে আসবে, দেখো। তখনই যুদ্ধে যেতে হলেও যাওয়ার আগে আমাদের সাথে এক ঝলক দেখা করতে সে আসবেই।

দাদু!

ও না এসে পারেই না। তেমন ছেলেই সেলিম মালিক নয়।

এই ফালতু তর্কের মধ্যে আর না থেকে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব নাখোশভাবে সেখান থেকে চলে গেলেন।

কিন্তু সেলিনা বানু মনকে প্রবোধ দিতে পারলো না। সে তার বৃদ্ধ হুকুমবরদার জাফরউল্লাহ অর্থাৎ জাফর মিয়াকে তখনই ফারজানাদের বাড়িতে পাঠালো ঘটনা কি জানতে। সেলিম মালিক ওখানেই আটকে থাকছে না অচিরেই ফিরে আসছে– সেটা জেনে আসতে।

খবর নিয়ে ফিরে এলো জাফরউল্লাহ ওরফে জাফর মিয়া। সে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেলিনা বানু শশব্যস্তে প্রশ্ন করলো– কি খবর? সেলিম মালিক সাহেব আজ রাতেই আসবেন, না আগামীকাল সকালে?

জাফর মিয়া বিষণ্নকণ্ঠে বললো– জি-না আম্মা! উনি আজকেও আসছেন না, আগামীকালও নয়।

সেলিনা বানুর দুই চোখ ফুটে উঠলো। বললো– আগামীকালও নয় মানে?

মানে, উনি কমপক্ষে চার পাঁচ দিন একটানা ও বাড়িতে থাকবেন। এমন কি সুলতান বাহাদুর তাগাদা দিলে, উনি ওখান থেকেই যুদ্ধে চলে যেতে পারেন।

তার অর্থ? আমাদের সাথে দেখা করতেও আসবেন না?

জি-না। তেমন অবস্থায় উনি দেখা করতে আসার ফুরসত পাবেন না।

উনি তাই বললেন?

জি আম্মা! বললেন, অধিক জরুরী অবস্থায় হয়তো দেখা করতে যাওয়াটা আর হয়ে উঠবে না।

অধিক জরুরী অবস্থা কি এখনই সৃষ্টি হয়েছে? মানে, উনি খুবই ব্যতিব্যস্ত আছেন?

জি-না, তা নেই।

তাহলে এলেন না কেন?

সেটা আমি বলতে পারবো না আম্মা!

উনাকে কর্মব্যস্ত দেখলে না?

জি-না। আমি যখন গেলাম তখন ঐ ফয়েজউদ্দীন বেগ হুজুর আর আমাদের হুজুর অন্দর মহলে নাশতা-পানি করছিলেন। কোন কাজ তিনি করছিলেন না।

অন্দর মহলে নাশতা-পানি করছিলেন?

জি-জি। নাশতা-পানি করছিলেন আর গল্প-আলাপ, হাসি-মস্করা করছিলেন। হাসি-ঠাট্টা!

বলো কি! ফারজানা বেগম কি সেখানে ছিল?

জি ছিলেন। ঐ হুজুরাইনই তো নাশতা-পানি পরিবেশন করছিলেন আর বেশি বেশি হাসি-ঠাট্টা করছিলেন।

: কার সাথে বেশি বেশি হাসি-ঠাট্টা করছিলো, ফয়েজউদ্দীন বেগের সাথে?

না আম্মা! ফয়েজউদ্দীন বেগ সাহেব তো বেশি কথা বলছিলেন না। উনি মুখবুজে খাচ্ছিলেন আর মাঝে মধ্যে দুই-এক কথা বলছিলেন। আলাপ ঠাট্টা করছিলেন শুধু আমাদের হুজুর আর ঐ হুজুরাইন। তাঁরাই বেজায় আলাপ-ঠাট্টা আর হাসাহাসি করছিলেন। তাছাড়া...

: তা ছাড়া?

আমাদের হুজুরের পাতেই জোর করে করে খানা তুলে দিচ্ছিলেন। ঐ বেগ হুজুরের দিকে এ হুজুরাইনের ততটা নজরই দেখলাম না।

তুমি নিজে সেটা দেখলে?

জি আম্মা। আমি যে ঐ অন্দর মহলে, উনারা যেখানে খানাপিনা করছিলেন, সেখানে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে ঐ ফারজানা আম্মা বললেন– আরে জাফর মিয়া এসেছো? এসে এসো! ঐ ওপাশে বসো। আর নাশতা-পানি করো।

সেলিম মালিক সাহেব কিছু বললেন না?

জি না!

তার মানে? তাহলে তোমার সাথে কথা বললেন কখন?

: ঐ নাশতা-পানি খাওয়ার আর গল্প-আলাপের পরে। উনাদের ঐভাবে ব্যস্ত দেখে 'আমি নাশতা-পানি করে এসেছি, এখন আর কিছু খেতে পারবো না' বলে বাইরে এসে বসে রইলাম। সেলিম মালিক হুজুর অন্দর থেকে বেরিয়ে এলে ঐসব কথাবার্তা হলো।

 বইঘর ও রোকন

অর্থাৎ?

কখন বাসায় ফিয়ে আসবেন– এ কথা সেলিম মালিক হুজুরকে জিজ্ঞাসা করলে উনি বললেন, চার পাঁচ দিনের মধ্যে তো নয়ই; সুলতান বাহাদুরের জরুরী তাকিদ এলে এভাবেই যুদ্ধে চলে যাবো, বাসায় ফিরে যাওয়ার হয়তো ফুরসতই পাবো না।

সেলিনা বানু তবু প্রশ্ন করলো– তাকে কি খুবই কর্মব্যস্ত দেখলে?

জাফরুল্লাহ বললো– ঐ তো বললাম আম্মা, উনি নাশতা-পানি করছিলেন আর আলাপ-মস্করা করছিলেন। অন্য কোন ব্যস্ত অবস্থায় তাকে দেখিনি।

সেলিনা বানু স্বগতোক্তি করলো– হুঁ, সবই তাহলে তাঁর অজুহাত। কর্মব্যস্ততা ট্যাস্ততা কিছু নয়। ঐ অজুহাতে ফারজানার কাছে উনি সেঁটে থাকতে চান।

জাফরউল্লাহ বললো– জি আম্মা, কিছু বললেন?

সেলিনা বানু উত্তেজনার সাথে বললো– হ্যাঁ, বললাম। আজ রাত হয়ে গেছে। আগামীকাল সকালেই আমি ফারজানার বাড়িতে যাব। তুমিও আমার সথে যাবে, তৈরি থেকো।

www.boighar.com

–বলেই নিজ কক্ষে প্রবেশ করলো সেলিনা বানু। সকালের দিকেই আব্রু করে বেরিয়ে এলো সেলিনা বানু। জাফর মিয়াকে বললো– চলো, বেরুতে একটু দেরি হলো, তাড়াতাড়ি ফারজানাদের ওখানে যাবো, চলো...

জাফর মিয়াকে সাথে নিয়ে ফারজানার অর্থাৎ হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাসায় চলে এলো সেলিনা বানু। এসেই দেখতে পেলো– ফয়েজউদ্দীন বেগসহ দহলিজের ভেতরে বাইরে অনেকগুলো জোয়ানের সাথে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত আছে সেলিম মালিক। বিভিন্নজনের বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিচ্ছে সে।

জাফর মিয়াকে নিয়ে অদূরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সেলিনা বানু বুঝলো– এ আলোচনা আপছে আপ শেষ হবার নয়। তাই তার ইংগিতে জাফরউল্লাহ এসে সেলিম মালিকের সামনে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো। জাফরউল্লাহকে দেখে তার কাছে ছুটে এলো সেলিম মালিক এবং সালামের জবাব দিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললো– আরে সেকি! জাফর মিয়া তুমি! তুমি আবার যে?

জাফর মিয়া বললো– আম্মাজান এসেছেন হুজুর!

চমকে উঠে সেলিম মালিক বললো– আম্মাজান মানে? সেলিনা বানু এসেছে?

: জি হুজুর, জি। ঐ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন্।

: কি সর্বনাশ! বাইয়ে দাঁড়িয়ে আছে? কতক্ষণ হলো এসেছো তোমরা?

তা অনেকক্ষণ হবে হুজুর। ব্যস্ত আছেন দেখে আপনাকে ডাকতে সাহস করিনি।

কি গজব- কি গজব! এতক্ষণ সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে?

শুনতে পেয়ে ফয়েজউদ্দীন বেগ ছুটে এসে সেলিম মালিককে প্রশ্ন করলো– কে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে উস্তাদ?

সেলিম মালিক বললো– সেলিনা বানু। সেলিনা বানু বেগম।

ব্যতিব্যস্তকণ্ঠে ফয়েজউদ্দীন বেগ বললো– তার মানে– তার মানে! উনি এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? কি গোস্তাকী, কি গোস্তাকী!

–বলেই ফয়েজউদ্দীন বেগ তার জোয়ানদের উদ্দেশ্য করে বললো– এই এই, তোমরা শুনো। আজকের আলোচনা তো প্রায় শেষ হয়েই গেছে। এখন তোমরা সেনাছাউনিতে যাও। সেলিম মালিক উস্তাদের সাক্ষাতে উস্তাদের বাসার লোক এসেছেন। উনি তাঁর সাথে কথা বলবেন। তোমরা এখনই যাও!

সঙ্গে সঙ্গে জোয়ানেরা চলে গেল আর দহলিজ ফাঁকা হয়ে গেল। ফয়েজউদ্দীন বেগ জাফর মিয়াকে বললো– ঐ হুজুরাইনকে শিগগির এই দহলিজে ডেকে আনো। আমি যাই, ফারজানা বেগমকে খবর দিই...!

ফয়েজউদ্দীন বেগ অন্দর মহলে চলে গেল। দহলিজ নির্জন হলে সেলিনা বানু সেখানে এসে হাজির হলো। সেলিম মালিক ব্যস্তকণ্ঠে সেলিনা বানুকে বললো– সেকি! তুমি! তুমি হঠাৎ এখানে?

সেলিনা বানু বললো– আপনি নাকি চার পাঁচদিন কিংবা আরো অনেকদিন বাসায় ফিরে যেতেই পারবেন না?

সেলিম মালিক বললো– অনেক দিনের কথা বলতে পারবো না, তবে চার পাঁচদিন আমার বাসায় ফেরার অবকাশ নেই।

কেন, অবকাশ নেই কেন?

দেখতেই তো পাচ্ছো, আমি ভীষণ ব্যস্ত আছি। এ ব্যস্ততা আরো তিন চারদিন চলবে।

আরো তিন চার দিন! কেন, আপনার এত ব্যস্ততা কেন?

ব্যস্ততা তো আমারই সেলিনা। শুনেছো তো, সামনেই আমাদের যুদ্ধ।

দুশমন আমাদের রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে।

শুনেছি। কিন্তু তা নিয়ে আপনার একার এত ব্যস্ততা কেন? আরো তো সেনানায়ক সৈন্যাধ্যক্ষ আছেন।

আছেন। তবে আমার উপরই সুলতান বাহাদুরের নির্ভরতা বেশি। এই উদ্দেশ্যেই উনি আমাকে দেশ থেকে আহ্বান করে এনেছেন। উনার মুখ রাখতে হবে না?

অর্থাৎ?

আমাকে আনার পর এই প্রথম লড়াই হতে যাচ্ছে। এই প্রথমবারেই আমি কি সুলতানকে হতাশ করতে পারি? প্রথমবারেই আমি যদি পরাজিত হই, তাহলে আমার উপর সুলতানের আকাশচুম্বি বিশ্বাস মিসমার হয়ে যাবে। আমার উপর তিনি আস্থা হারিয়ে ফেলবেন। আমি কি তা হতে দিতে পারি? তাইতো আমাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। কোনক্রমেই আমাকে পরাজিত হলে চলবে না।

অর্থাৎ?

সুলতান বাহাদুর আমাকেই এ লড়াইয়ের প্রধান দায়িত্ব দিয়েছেন। অন্য সেনাপতিদের উপর তিনি ভরসা করে নেই। আমার উপরই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছেন। এ লড়াইয়ে হার হলে সে হার সম্পূর্ণ আমার উপরই বর্তাবে। তাই এই লড়াইয়ে জিততেই হবে আমাদের, তথা আমাকে। জিত আমার চাই-ই।

সেলিম মালিক সাহেব!

তোমার সেই সেলিম মালিক হেরে গেলে তোমার মুখ ছোট হবে না, সেলিনা? সুলতান বাহাদুরের কাছে তোমার আর তোমার পরিবারের মর্যাদা খাটো হবে না, বলো?

তাহলে ফারজানা বগেমের সাথে এত হাসাহাসি চলছে কেন?

দহলিজে আসতে আসতে ফারজানা বেগম বললো– ফারজানা বেগমের প্রেমে যে সেলিম মালিক সাহেব হাবুডুবু খাচ্ছেন! ফারজানার সাথে হাসাহাসি করবে নাতো কার সাথে করবে, তোমার সাথে? হাসাহাসি করার জন্যেই তো উনি এখানে এসেছেন।

সেলিনা বানু নাখোশকণ্ঠে বললো– ফারজানা!

ফারজানা বেগম বললো– বেজার হচ্ছো কেন সখী? সেই খবর পেয়েই তো

বইঘর ও রোকন

তুমি ছুটে এসেছো– তোমার সেলিম মালিক সাহেবকে ফারজানা বিবি গোটাই গেলে ফেলে কিনা, তা দেখতে। ধন্যবাদ দেই তোমাকে। হারাই হারাই ভাবটা তোমার এতটাই!

ফারজানা!

নিজের উপর ভরসা তোমার এতটাই কম? নিজের ঘর সামলানোর সাধ্য নেই, ঢু মারতে আসো পরের ঘরে?

তুমি কি বলতে চাও?

বলতে চাই যে, আমার ফয়েজউদ্দীন বেগ দিনরাত তোমার দুয়ারে পড়ে থাকলেও তাকে হারানোর ভয়ে এতটুকু চঞ্চল হবো না আমি। কারণ তার প্রতি আমার ভালবাসা এতটুকু হালকা আর এতটুকু ঠুনকো নয়!

ফারজানা!

তোমার ভালবাসা এতটাই ঠুনকো আর পাতলা?

তার অর্থ?

তবুও অর্থ খুঁজছো? আমার ফয়েজ উদ্দীনের উপর আমার বিশ্বাস অটল। আমি জানি– ফয়েজউদ্দীন বেগ আমাকে ছাড়া প্রাণান্তেও অন্য কারো দিকে নজর দেবে না আর অন্য কারো দিকে ঝুঁকে পড়বে না। অথচ তোমার বিশ্বাস এতটাই কমজোর?

ফারজানা!

সেলিম মালিক সাহেব আমার এখানে এসেছেন মানেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়বেন। এই তোমার ভয়! তাহলে এতদিন তাকে আঁকড়ে ধরে রেখে করলেটা কি? ঘাস কাটলে? তার প্রতি ভালবাসা তোমার একটুও শক্ত করতে পারোনি?

এদের এই বাতবিতণ্ডায় সেলিম মালিক বিব্রত হয়ে উঠলো। ফারজানাকে উদ্দেশ্য করে বললো– থামো, থামো! কেন সেলিনা বানুকে এতটা দোষারোপ করছো? আমার উপর সেলিনা বানুর ভরসাও কম নয়। দরদ যার যত বেশি হারাই হারাই ভাবটা স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে ততটা তীব্রভাবে কাজ করে। ফয়েজউদ্দীনকে নিয়ে তোমার ভয়ও নিশ্চয়ই কম নয়।

ফারজানা বেগম বললো– না, আপনি ভুল করছেন সাহেব। আমরা বামন। মাটির সাধারণ মানুষ। তাই আসমানের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর মতো শখ আমাদের নেই, সে ভুলও আমরা করিনে। আমরা আমাদের নিয়েই তৃপ্ত

থাকতে চাই। বরং চাঁদই ভুল করে উঁকি দেয় বামনের ঘরে।

সেলিম মালিক বললো– হ্যাঁ, উঁকি দেয় ঠিকই। কিন্তু সেটা বামনের দিকে হাত বাড়ানোর জন্যে নয়। নিজেদের নিয়ে বামনদের এমন গভীরভাবে তৃপ্ত থাকার প্রশংসা করতে।

ফারজানা বেগম বললো– কিন্তু আমার সখী সেলিনা বানুতো সেটা বুঝতে চায় না সাহেব! সে ভাবে, বোধ হয় বামনের ঘরে ঢুকেছে বামনের দিকে হাত বাড়ানোর জন্যে!

সেলিম মালিক বললো– সেটা তোমার সখীকে বোঝাও! বোঝাও যে, এইসব ফালতু হাত বাড়ানোর, হাত গুটানোর ব্যাপার নিয়ে আমি এখানে এসে নেই। আমি এখানে এসে আছি আমার তলোয়ারকে শান দিতে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আসন্ন লড়াইয়ে নিশ্চিত জয়লাভের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে। জয় আমার চাই-ই। সুলতান বাহাদুর আমার উপর যে আস্থা রেখেছেন তাঁর সেই আস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে। এই লড়াইয়ে হেরে গিয়ে সুলতানের সেই আস্থা আমি মিসমার করতে চাইনে। চাইনে আমার মেজবান সেলিনা বানু আর তার পরিবারবর্গের ভাবমূর্তি ম্লান করতে। সুলতানের মুখ আমি উজ্জ্বল করতে চাই। উজ্জ্বল করতে চাই আমার সেলিনা বানুর মুখ। উদ্ভাসিত করতে চাই তার অন্তর ও ভালবাসা।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ফারজানা বেগম বললো– মারহাবা! মারহাবা! অপূর্ব-অপূর্ব!

ফারজানা বেগম অতঃপর সেলিনা বানুকে উদ্দেশ্য করে বললো– কি সখী! ভ্রান্তি কিছু ভাংলো? সমঝ্মে কুচ্ আতা হ্যায়?

সেলিনা বানু এবার সলজ্জকণ্ঠে বললো– আমাকে দু'জনই তোমরা মাফ করে দাও ফারজানা। আর আমি এখানে থেকে তোমাকে আর উনাকে অনর্থক বিব্রত করতে চাইনে। আমি এখনই বাসায় ফিরে যাই!

ফারজানা বেগম বললো– বাসায় ফিরে যাবে?

সেলিনা বানু বললো– হ্যাঁ, বাসায় ফিরে যাবো। এখনই বাসায় ফিরে আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে মোনাজাত করতে বসবো। কায়মনপ্রাণে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করবো– আল্লাহ তায়ালা যেন আমার সেলিম মালিকের

মুখ উজ্জ্বল করেন। সেই সুবাদে উজ্জ্বল করেন আমার মুখও।

লাখনৌতি রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত শহর লাখনৌর (অর্থাৎ নগৌর)-এর উত্তর প্রান্তে সুলতান ইওজ খলজির বাহিনী সন্নিবেসিত হলো। বার্তা পেয়েই উড়িষ্যারাজ তৃতীয় অনঙ্গভীমের সেনাপতি হা হা করে হেসে উঠলেন। আস্ফালন করে সবাইকে শুনিয়ে বললেন– শুনো শুনো, তোমরা সবাই শুনো! তুচ্ছ যবন রাজার সেনাপতিরা লাখনৌর শহরের উত্তর প্রান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে। কথায় বলে, 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে' কীটাণুকীট যবনদের সাহস দেখে বলিহারী যাই। এই মুহূর্তেই নরাধমদের কেমন করে পায়ের তলে পিষে মারি আমি, তোমরা সবাই তা দেখো।

–বলেই তিনি তার সৈন্যদের আদেশ দিলেন– অগ্রসর হও। এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো নরাধমদের ঘাড়ের উপর!

সুলতান ইওজ খলজি বাহাদুর এই লড়াইয়ের দায়িত্ব সেলিম মালিকের উপর দিলেও লাখনৌতির প্রধান প্রধান সেনাপতিরা নিজের ইচ্ছা মতো সৈন্য সমাবেশ করলেন। ছোট্ট সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগের তোয়াক্কাই রাখলেন না। তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৈন্যবাহিনীর সামনের কাতারে রইলেন তাঁরা প্রধান কয়েকজন সেনাপতি। তাঁদের পেছনের কাতারে রইলেন তাঁদের চেয়ে কিছুটা নিম্ন-পদবীর সেনাপতিরা এবং তাদেরও পেছনের কাতারে রইলেন স্বল্পদক্ষ সাধারণ সেনাপতিরা। সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগকে তাদের সৈন্য নিয়ে সকলের পেছনের কাতারে রেখে দিলেন। অথচ প্রয়োজন ছিল কায়দামতো জায়গায় এদের উপস্থিত থাকতে দেয়া। কিন্তু বাহিনীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাতারে তাদের জন্যে কোন স্থানই রাখলেন না। উদ্দেশ্য, সুলতানের কাছে এই যুদ্ধ জয়ের তামাম কৃতিত্ব তাঁরাই কয়জন নিতে চান। সেলিম মালিকের দক্ষতার কথা সুলতানের কাছে শুনলেও, তারা সেলিম মালিককে সে দক্ষতা প্রকাশের কোন সুযোগই দিতে চান না। তুচ্ছ উড়িষ্যা-রাজার তুচ্ছ সেনাপতি বিষ্ণুকে তাঁরা গণ্যের মধ্যেই নিলেন না। এক তুড়িতেই এই যুদ্ধ জিতে নেবেন তাঁরা– এমনি বিবেচনায়– এই যুদ্ধের কোন কতিত্বই সেলিম মালিকদের দিতে চাইলেন না তাঁরা।

শুরু হলো যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে লাখনৌতির এই অহংকারী

প্রধান কয়জন সেনাপতি বুঝতে পারলেন, বিষ্ণুকে তাঁরা যতটা তুচ্ছ মনে করেছিলেন, রণবিদ্যায় বিষ্ণু আদৌ ততটা তুচ্ছ নন। প্রকৃতই তিনি তুচ্ছ হলে, লাখনৌতির রাজ্য সীমানায় পদার্পণ করার কোন সাহস কখনই করতেন না। বরং বিষ্ণুর ধারণাটাই অনেকটা সঠিক ছিল। লাখনৌতির সেনাপতিদের তিনি যে অদক্ষ মনে করেছিলেন, প্রথম কাতারের প্রধান কয়জন সেনাপতি সেই অদক্ষতার পরিচয়ই শুরুতেই দেয়া শুরু করলেন। উড়িষ্যার সৈন্যদের প্রচণ্ড মার সহ্য করতে না পেরে তাঁদের সৈন্যেরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পলায়ন শুরু করলো। বিষ্ণুর তরবারির ঘা প্রতিহত করতে না পেরে প্রধান কয়জন সেনাপতিও তাঁদের সৈন্যদের পথ অনুসরণ করলেন। অর্থাৎ প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে সৈন্যদের দলে ঢুকে পড়ে সৈন্যদের সাথে পালিয়ে গেলেন।

লাখনৌতির ব্যূহের প্রথম কাতার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় উড়িষ্যার সেনাপতি বিষ্ণু ও তাঁর সহকারীরা অট্টহাসি হাসতে হাসতে এসে সসৈন্য চড়াও হলেন লাখনৌতির ব্যূহের দ্বিতীয় কাতারের উপর। পদবীতে কিছুটা খাটো হলেও, দ্বিতীয় কাতারের সেনাপতিরা ছিলেন ঈমানদার ও দেশভক্ত লোক। প্রথম কাতারের সেনাপতিরা ও সৈন্যরা পালিয়ে গেলেও এবং বিষ্ণুর সৈন্য সংখ্যা অগণিত হলেও, এই দ্বিতীয় কাতারের সেনাপতিরা তাঁদের সৈন্য নিয়ে বিষ্ণুর অগ্রগতি প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ এইভাবে চলার পর প্রথম কাতারের কোন প্রকার সাপোর্ট (সহায়তা) না থাকার কারণে লাখনৌতির এই সেনা-সৈন্যেরা অবশেষে হীনবল হয়ে পড়তে লাগলেন এবং বিষ্ণুর বিজয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় কাতারের পতন ঘটার সাথে সাথে তৃতীয় কাতার অকেজো হয়ে যাবে বুঝে বিষ্ণুর শিবিরে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠতে লাগলো।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগের স্ট্রাইকিং ফোর্সের অর্থাৎ মারণ-বাহিনীর মরণ-ছোবল বিষ্ণু ও তাঁর সহকারীদের কাছে তখনও অপরিচিত ছিল। এইবার সেই ছোবল এসে পড়লো তাঁদের মাথায়। বিষ্ণু আর তাঁর সহকারীরা বিশাল বাহিনী নিয়ে লাখনৌতির ব্যূহের প্রথম ও দ্বিতীয় কাতারের মোকাবেলা করারকালে পেছন থেকে অলক্ষ্যে সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগ তাদের ছোট আকারের মারণ-বাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়ে লাখনৌতির কাতারগুলোর ডান ও বাম পার্শ্ব দিয়ে চলে এলো বিষ্ণুর বাহিনী একদম কাছে এবং একযোগে ও অতর্কিতে ঝটিকা আক্রমণ চালালো বিষ্ণুর গোটা বাহিনীর উপর। বিষ্ণু ও তার সহকারীরা কিছু বুঝে

ওঠার আগেই কচুগাছের মতো পলকেই কেটে পড়লো বিষ্ণুর সৈন্যদের অসংখ্য মাথা। দুইদিক থেকে আক্রমণ আসায় কোন দিক আগে সামলাবে ভেবে উঠতে উঠতেই বিষ্ণুর অর্ধেক সৈন্য ধরাশায়ী হলো। তাদের রক্ষার্থে এসে ধরাশায়ী হলো বিষ্ণুর সহকারীদের প্রায় সকলেই। মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে পালিয়ে গেল বিষ্ণুর বাদবাকী সৈন্যরা। বিষ্ণু বন্দি হলো সেলিম মালিকের হাতে।

কর্পূরের মতো উবে গেল বিষ্ণুর আস্ফালন ও বীরত্ব। লাখনৌর (নগৌর) শহর পুনরায় মুসলমানদের হস্তগত হলো। শিবিরে বেঁধে এনে বিষ্ণুকে হত্যা করার উৎসবে মেতে উঠলেন লাখনৌতির সেনাসৈন্য সকলেই।

খবর গেল উড়িষ্যায়। খবর শুনে মাথায় হাত দিলেন উড়িষ্যারাজ তৃতীয় অনঙ্গভীম। তাঁর সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত। এবার মুসলিম বাহিনী ছুটে এলে গোটা উড়িষ্যাটাই তাদের হস্তগত হবে আর তার প্রাণটাও সেই সাথে যাবে। এবম্বিধ চিন্তা করে কাঁপতে কাঁপতে লাখনৌতির শিবিরে ছুটে এলেন অনঙ্গভীম। এসেই তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং লাখনৌতির সুলতানকে অনেক হাতী ঘোড়া, প্রচুর ধন-সম্পদ ও অসংখ্য মূল্যবান সামগ্রী উপঢৌকন দিয়ে সুলতানের অনুমতিক্রমে নিজের প্রাণ, বিষ্ণুর প্রাণ ও উড়িষ্যা রাজ্য রক্ষা করলেন।

অনঙ্গভীমের সেনাপতি হলেও বিষ্ণু ছিলেন উড়িষ্যার একজন সামন্ত রাজা। বিষ্ণু লাখনৌতির সুলতানকে কর দিতে বাধ্য হলেন।

যুদ্ধ শেষে লাখনৌতির সেনা-সৈন্যরা যখন লাখনৌতিতে ফিরে এলেন, লাখনৌতিতে আনন্দের তুফান ছুটতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বীরোচিত সম্বর্ধনা দেয়া হলো। সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগকে সুলতান বাহাদুর নিজে ভূয়সী প্রশংসা করার সাথে পৃথক করে বিপুল সম্বর্ধনা দিলেন। শুধু তাই নয়, সেই সাথে সুলতান বাহাদুর ফয়েজউদ্দীন বেগের ও সেলিম মালিকের স্থানীয় অভিভাবক হিসাবে মুক্তকণ্ঠে মোবারকবাদ জানালেন যথাক্রমে হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেব ও তাঁর পরিবারবর্গকে এবং সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজি ও তার পরিবারবর্গকে।

এতে করে আনন্দের ফোয়ারা ছুটলো এই দুই পরিবারে। বিশেষ করে ফয়েজউদ্দীন বেগকে নিয়ে মেতে উঠলো ফারজানা বেগম এবং সেলিম মালিককে নিয়ে খুশিতে বিহ্বল হয়ে উঠলো সেলিনা বানু বেগম। কোন রাখঢাক না করে ফারজানা বেগম ফয়েজউদ্দীন বেগকে বললো– আমার বুক

ফুলে উঠেছে! গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছে! তোমাকে এখন আমি কোথায় রাখি? বুকে, না মাথায়?

ফয়েজউদ্দীন বেগ ঈষৎ হেসে বললো– কেন, কেন?

ফারজানা বেগম বললো– মাগো মা! তুমি একজন বীর আমি তা জানতাম কিন্তু এত বড় বীর আমি সেটা জানতাম না! তোমার বীরত্বে খোদ সুলতান বাহাদুর পর্যন্ত যারপর নেই অভিভূত হয়ে গেলেন।

অভিভূত হয়ে গেলেন?

হবেন না? উড়িষ্যার তামাম সৈন্য দলিত-মথিত করে জয় ছিনিয়ে আনলে, আমাদের শহর পুনর্দখল করলে, সুলতান বাহাদুর এতে অভিভূত হবেন না?

আচ্ছা!

কি করে উড়িষ্যার সৈন্যবল বিধ্বস্ত করলে তুমি?

আমি! আরে না-না, বিধ্বস্ত করেছেন আমার উস্তাদ সেলিম মালিক খলজি সাহেব। আমি তাঁকে সাহায্য করেছি মাত্র।

বললেই হলো? আমি কি শুনিনি? তোমরা দু'জনই সমানভাবে বিধ্বস্ত করেছো!

ভুল শুনেছো। আক্রমণের পরিকল্পনা (প্ল্যান) কায়দা-কৌশল তামামই উদ্ভাবন করেছেন উস্তাদ সেলিম মালিক সাহেব। আমি আমার সেপাইদের নিয়ে সেই পরিকল্পনা (প্ল্যান) অনুযায়ী কাজ করেছি মাত্র। তাঁর নির্দেশ পালন করেছি। অতিরিক্ত কিছু করিনি।

ফারজানা বেগম সেসব কথা আমলে না নিয়ে বললো– তা তুমি যতই কও, সেলিম মালিক সাহেব অধিকটা করেছেন, এটা ঠিক। কিন্তু তুমিও কম করোনি। এমনি কি সুলতান বাহাদুর আমাদের এতটা মোবারকবাদ জানিয়েছেন? তোমার বীরত্বে মোহিত হয়ে গেছেন বলেই জানিয়েছেন। তোমার এই গৌরব আনন্দে মাতোয়ারা করে তুলেছে আমাকে। আনন্দে আমি দিশেহারা হয়ে গেছি। তোমায় এখন আমি কোথায় রাখবো? আমার এই ক্ষুদ্রবুকে তোমার কি স্থান সংকুলান হবে, দেখি–

বলেই ফারজানা বেগম ফয়েজউদ্দীন বেগকে জড়িয়ে ধরতে গেল। চমকে উঠে ফয়েজউদ্দীন বেগ ছিটকে পেছনে সরে গেল। সরতে সরতে বললো– এই, এই! করো কি করো কি? আমরা তো পরস্পর এখনো বেগানা। বেগানা কেউ কাউকে এইভাবে জড়িয়ে ধরা গুনাহ! মহাপাপ!

ফারজানা বেগমের আবেগ ও ভালবাসা উদোম, উলঙ্গ। কিন্তু সেলিনা বানুর আবেগ ও ভালবাসা আবৃত ও চাপা। ফারজানা বেগম অসংযত। সেলিনা বানু সংযত। ফারজানা বেগমের আবেগ উচ্ছৃঙ্খল। সেলিনা বানুর আবেগ সুষমামণ্ডিত, সুবাসিত।

সেলিম মালিক বাসায় আসার সাথে সাথে তাকে ঘিরে আগে সেলিনা বানুর দাদু ইয়ারউদ্দীন খলজি ও আব্বা শাহাবুদ্দীন খলজি চাকর নফর, বান্দা-বান্দী ও দ্বারী-প্রহরী নিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠলেন। সকলেই তারস্বরে সেলিম মালিকের প্রশংসা করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললো– বাপের বেটা বটে এই সেলিম মালিক হুজুর! বাপরে বাপ! বছপনকালে তাঁর আম্মা তাঁকে বাঘের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছিলেন কি না কে জানে! কিন্তু যা শুনলাম, তাতে তিনি বাঘের চেয়েও ভয়ংকর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ঐ উড়িষ্যা বাহিনীর উপর। চোখের পলকে সকলের ঘাড় থেকে মাথাগুলো আলাদা করে দিয়েছেন।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব কলকণ্ঠে বললেন– দেবেই তো, দেবেই তো! অমনি কি আর সুলতান বাহাদুর তাকে ঐ সুদূর গরমশির থেকে এই লাখনৌতিতে দাওয়াত করে এনেছেন? তিনি জানতেন, এই সেলিম মালিক খলজি একটা বাঘের বাচ্চা। বখতিয়ার খলজি সাহেবরই লগভগ এক মানুষ। বলা যায়, বখতিয়ার খলজি সাহেবেরই এক দ্বিতীয় সংস্করণ।

উপস্থিত সকলেই সমর্থন দিয়ে বললো– ঠিক ঠিক। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– সুলতান বাহাদুরের মুখ রেখেছে ভায়া আমার। বড় মুখ করে সবাইকে ভায়ার বীরত্ব নিয়ে যে বড় বড় কথা শুনিয়েছিলেন সুলতান বাহাদুর, তাঁর সে মুখটা ভায়া আমার ষোলআনাই রেখেছে। উজ্জ্বল করেছে সুলতান বাহাদুরের মুখ।

শাহাবুদ্দীন খলজি বললেন– সেই সুবাদে আমাদের মুখও উজ্জ্বল হয়েছে আব্বাজান! আমরাই সেলিম মালিকের স্থানীয় অভিভাবক হেতু সুলতান বাহাদুর আমাদের যে সুনাম-সুখ্যাতি করেছেন তাতে সকলের কাছে আমাদের মুখও উজ্জ্বল হয়ে গেছে। সবাই আমাদের আগের চেয়েও অধিক সমীহ করা শুরু করেছে।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব সদম্ভে বললেন– করবেই তো, করবেই তো! আমরা কি আর পথ থেকে একটা বিড়ালছানা ধরে এনে বাড়িতে তুলেছি? বাঘের বাচ্চা! জাত বাঘের বাচ্চা এনে আমরা বাড়িতে রেখেছি।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব গর্বে দুলতে লাগলেন। সেলিনা বানু এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে সকলের বাহবা তারিফ শুনছিলো। এবার সে গলা ঝেড়ে বললো– দাদু সাহেব কি সেরেফ তারিফ দিয়েই পেট ভরাবেন সেলিম মালিক সাহেবের? এতবড় একটা যুদ্ধ জয় করে উনি ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে এসেছেন! তাঁর আহার আপ্যায়ন আর আরাম বিরামের দিকে নজর না দিয়ে আর সকলের মতো সেরেফ উল্লাস করবেন আর প্রশংসার বুলি কপচাবেন? আহার বিশ্রামের দরকার কি নেই উনার?

হুঁশে এসে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– আরে হ্যাঁ- হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো! ঠিকই তো! বড় জরুরী কথা বলেছে নাতনী আমার!

অতঃপর সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন– সরো, সরো, এখন তোমরা সরো! আর যা কিছু বলার আছে, উৎসব উল্লাস করার আছে, ও বেলায় করো। এখন ভায়াকে আমার ছেড়ে দাও। সেলিম বানু এখন ওর আহার বিশ্রামের দিকটা দেখুক। ঝি-আয়াদের ডেকে সেলিম মালিকের আহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করুক। চলো- চলো, সবাই আমরা সরে যাই এখন।

বাসায় এসে সেলিম মালিক তার কক্ষের দিকে যাচ্ছিল। এই সময় টের পেয়ে ইয়ারউদ্দীন খলজি ও শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব এসে ঘিরে ধরলেন তাকে। সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়ে এসে ঘিরে ধরলো ঝি-চাকরানী, চাকর-নফর ও দ্বারী-প্রহরীরাও। সবাই মিলে অনেকক্ষণ আনন্দে মাতামাতি করলেন। এবার সবাইকে ডেকে নিয়ে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব সরে গেলে সে স্থান নির্জন হয়ে গেল। রইলো শুধু সেলিম মালিক আর অদূরে দণ্ডায়মান সেলিনা বানু বেগম।

দ্রুতপদে এসে সেলিনা বানু এবার ঝুপ করে বসে পড়লো সেলিম মালিকের পায়ের কাছে এবং তাকে কদমবুচি করলো। তা দেখে সেলিম মালিক পিছু হটে বললো– একি করছো, একি করছো?

অকম্পিতকণ্ঠে সেলিনা বানু বললো– সম্মানীজনকে সম্মান প্রদর্শন করছি!

সেলিম মালিক বললো– সম্মানীজন!

সেলিনা বানু বললো– অবশ্যই সম্মানীজন। সবাই যাঁকে সম্মান করে, ছোটদের কাছে তিনি শুধু সম্মানীজনই নন, গুরুজন। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা ছোটদের সবারই একান্ত কর্তব্য।

তোমারও একান্ত কর্তব্য?

অবশ্যই! আমি তো বয়সে আপনার চেয়ে ছোট। আপনাকে তো শ্রদ্ধা নিবেদন করবোই।

বটে! তা শ্রদ্ধা নিবেদনের হঠাৎ এই ঘটা?

ঘটা তো হবেই। আল্লাহ তায়ালা আমার আরজ মঞ্জুর করেছেন যে। আপনি যুদ্ধে জয়ী হন– এই আরজ যে আল্লাহ তায়ালার কাছে আমি অবিরাম কায়মনপ্রাণে করেছি।

আচ্ছা!

আপনার জয়লাভের খবর পাওয়ার পর থেকেই আমি আল্লাহ তায়ালার লাখো লাখো শুকরিয়া আদায় করে আসছি। এক্ষণে আপনি আমার সামনে হাজির। আপনার এই অতুলনীয় কৃতিত্বের জন্যে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করবো না?

সেলিনা বানু!

আল্লাহ তায়ালা আপনার মুখ রেখেছেন। আপনার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। সেই সুবাদে উজ্জ্বল হয়েছে আমার মুখও। আমার চেয়ে এত বেশি খুশি আজ আর কেউ নয়।

তাই নাকি?

এতবড় অসাধ্য সাধন কেমন করে করলেন সাহেব?

: অসাধ্য সাধন!

অসাধ্য সাধন নয়? এ রাজ্যের তাবড়ো তাবড়ো প্রধান সেনাপতিরা উড়িষ্যার বাহিনীর সামনে টিকতে না পেরে প্রাণ নিয়ে শৃগালের মতো পালিয়ে গেলেন। প্রথম কাতার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় কাতারও যায় যায় অবস্থা। উড়িষ্যার শিবিরে তুমুল জয়ধ্বনি উঠে গেল। লাখনৌতির পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেল। এমন অবস্থায় এই বিজয় আপনি কি করে ছিনিয়ে আনলেন, বলুন তো?

সেলিনা!

আপনি যে একজন মস্তবড় বাহাদুর, প্রথমদিন গাছ চাপা পড়ে মরা থেকে আমাদের বাঁচানো দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আপনি যে এত বড় বীর তা বুঝতে পারিনি। একটা নিশ্চিত পরাজয়কে জয় বানানোর ঘটনায় আমি স্তম্ভিত হয়ে তা বুঝতে পেরেছি। একি এক সাংঘাতিক বাহাদুর লোক আপনি!

: বটে! তা তুমি সব জানলে কি করে?

বার্তাবাহকের মুখে শুনে। যুদ্ধে জয়লাভের বার্তা নিয়ে যে বার্তাবাহক এসেছিল তার মুখে শুনে। ঐ বার্তাবাহককে যে এখানেও ডেকে এনেছিলাম।

: বটে!

এতবড় জয়টা আপনি কেমন করে করলেন?

আমি? না- না, আমি একা নই। ফয়েজউদ্দীন বেগ আর আমি। মানে আমরা দু'জনে মিলে এই জয়লাভ করেছি। আমার একার পক্ষে কি এতটা সম্ভব?

শুনেছি। ঐ বার্তাবাহকের মুখে সেটাও শুনেছি। ফয়েজউদ্দীন বেগ সাহেব তাঁর চৌকস সেপাইদের নিয়ে আপনাকে এ কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, সেটাও শুনেছি। কিন্তু আসল কাজটা তো করেছেন আপনি একাই।

অর্থাৎ?

যুদ্ধের পরিকল্পনা, কায়দা-কৌশল সবকিছু আপনিই উদ্ভাবন করেছেন এবং কাজটাও মূলত আপনিই করেছেন। ফয়েজউদ্দীন বেগ সাহেব আর তাঁর সেপাইরা আপনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই নির্দেশ পালন করে আপনাকে সহায়তা করেছেন।

তবে, সেটাই বা কম কি সে?

মোটেই কম নয়। তাঁদের অবদানকে আমি মোটেই খাটো করে দেখছিনে। কিন্তু আপনার বীরত্বের তুলনা কোথায়? আপনার এই অতুলনীয় বীরত্বের মূল্যায়ন করতে গিয়ে গর্বে বুকটা আমার কেবলই ফুলে ফুলে উঠছে।

সেলিনা বানু!

www.boighar.com

আল্লাহর কাছে তাই এখন থেকে আমার একমাত্র আরজ হবে- আল্লাহ তায়ালা যেন আজীবন এই বীরের পাশে রাখেন আমাকে আর প্রতিদিন প্রভাতে এই বীরের কদমবুচি করার কিসমত যেন আমার হয়।

সেলিনা!

এইটেই আমার একমাত্র আকিঞ্চন।

এই সময় আবার সেখানে এসে হাজির হলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব এবং ব্যস্তকণ্ঠে বললেন- আরে আরে সেকি! আমাদের সরিয়ে দিয়ে তুমিও আবার সেই তারিফ গেয়েই চলেছো? বেচারার আরাম বিরামের এখনো কোনই ব্যবস্থা করোনি?

শরম পেয়ে সেলিনা বানু বললো– জি দাদু, জি-জি, এখনই করছি- এখনই করছি।

এখনই করছি মানে? এখনো করোনি কেন?

ভুলে গেছি দাদু। আপনার এই মেহমানের অতুলনীয় বাহাদুরীর কথা স্মরণে আসতেই আমিও আবার দিশেহারা হয়ে গেছি।

বলেই সেলিম মালিককে উদ্দেশ্য করে সেলিনা বানু বললো– আসুন- আসুন, আগে খাবার ঘরে আসুন। এর পরে বিরাম। অনেক দেরি হয়ে গেছে। দয়া করে শিগগির খাবার ঘরে আসুন।

সেলিম মালিককে তাকিদ দিয়ে নিয়ে খাবার ঘরের দিকে রওনা হলো সেলিনা বানু বেগম।

কয়েকদিন পরের কথা। কয়েকদিন পরে হঠাৎই সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি সাহেব সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজির দহলিজের সামনে এসে হাজির হলেন। শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেবের আব্বা ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব দহলিজেই ছিলেন। হঠাৎ সুলতানকে আসতে দেখে তিনি বিস্ময় ও আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলেন। দহলিজ থেকে ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে এসে শশব্যস্তে বললেন– একি! মহামান্য হুজুর যে! আসসালামু আলায়কুম! হুজুর হঠাৎ এই গরীবের বাসায়!

সালামের জবাব দিয়ে সুলতান বাহাদুর বললেন– কোষাধ্যক্ষের দপ্তর পরিদর্শনে এই দিকেই এসেছিলাম। ফিরে যাওয়ার সময় তাই একটা প্রয়োজনে আপনাদের এখানে চলে এলাম।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব তাজিমের সাথে বললেন– হুজুরের অশেষ মেহেরবানী! আসুন হুজুর, দয়া করে এই দহলিজে উঠে এসে আসন গ্রহণ করুন।

সুলতান বাহাদুর বললেন– হ্যাঁ, যে জন্যে এসেছি সে জন্যে বসতে একটু হবেই।

সুলতান দহলিজে উঠে এলে সসম্মানে আসন দিয়ে ইয়ারউদ্দীন খলজি বললেন– তা হুজুর সেরেফ একা যে! হুজুরের লোক-লস্কর কোথায়?

লোক-লস্কর আনবো কেন? আমি আমার নিজের রাজ্যে নিজের রাজধানীতে কাজে বেরিয়েছি, তাতে লোক-লস্কর লাগবে কেন?

: হুজুর!

সাথে দু'জন দেহরক্ষী এনেছি। তারা অদূরেই আছে।

সেরেফ দুইজন দেহরক্ষী! সাথে আর কোন নিরাপত্তা বাহিনী নেই!

না। দরকার পড়ে না।

গোস্তাকী মাফ হয় হুজুর! হুজুর দেশের সুলতান। অনেকের অনেক দুশমনী প্রতিহত করে হুজুরকে এই মসনদে আরোহণ করতে হয়েছে। সুতরাং হুজুর তো অজাতশত্রু নন! বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক্ষণে কোন দুশমন দৃশ্যমান না থাকলেও কোথায় কোন দুশমনের প্রিয়জন প্রতিহিংসার জ্বালা বুকে নিয়ে ওঁৎ পেতে, মানে আত্মগোপন করে আছে, কে বলতে পারে?

আপনার সন্দেহ অমূলক নয় মুরব্বী। তা থাকতে পারে বৈকি। কিন্তু প্রত্যক্ষ দুশমন যেখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেখানে নিরাপত্তা নিয়ে পরোক্ষ দুশমনের ভয়ে সুলতানকে এত তটস্থ থাকলে চলবে কেন?

হুজুর!

মুরব্বী, হায়াত-মউতের মালিক আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তায়ালা না চাইলে কার সাধ্য আমার গায়ে কাঁটার আঁচড় কাটে!

তা ঠিক। তবে...

আল্লাহ তায়ালা যদি আমার মউত চান, আমার শত সতর্কতা কোন কাজে আসবে কি?

তা বটে- তা বটে।

সুতরাং এসব কথা থাক। আমি যে জন্যে এসেছি, সেই কথা বলি। উজির শাহাবুদ্দীন সাহেব কি মকানে আছেন?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব একটু থেমে বললেন– জি না হুজুর! শাহাবুদ্দীন একটু আগে সেনাছাউনিতে কি যেন কাজে গেল। ডেকে দেবো হুজুর?

না, তাঁকে না হলেও চলবে। আপনাদের মেহমান সেলিম মালিক কি বাসায় আছে?

জি হুজুর, আছে- আছে। সে তার কামরাতেই আছে।

তাকে জলদি পাঠিয়ে দিন। তার সাথে আমার জরুরী কিছু কথা আছে।

জি আচ্ছা হুজুর!

ব্যস্তপদে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব অন্দর মহলে ছুটলেন। একটু পরেই

 বইঘর ও রোকন

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো সেলিম মালিক। এসেই তাজিমের সাথে সালাম দিয়ে বিনীতকণ্ঠে বললো– একি জাঁহাপনা যে! জাঁহাপনা হঠাৎ এখানে?

সালামের জবাব দিয়ে সুলতান বাহাদুর স্মিতহাস্যে বললেন– আমি তোমার কাছেই এসেছি নওজোয়ান।

সে কি জাঁহাপনা! সে কি! আমাকে তলব দিলেই তো আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জাঁহাপনার সামনে হাজির হতাম। সে জন্যে জাঁহাপনাকে–

না, আমি সেরেফ সে জন্যেই এখানে আসিনি। নিকটেই কিছু কাজ থাকায় আমি এদিকে এসেছিলাম। ফিরে যাওয়ার পথে তাই তোমাদের এখানে এলাম।

জাঁহাপনার অশেষ মেহেরবানী।

তোমাদের কুশলটা নেয়াও প্রয়োজন মনে করলাম আর সেই সাথে কিছু দরকারও আছে আমার তোমার সাথে।

আদেশ হোক জাঁহাপনা!

আগে স্থির হয়ে ঐ আসনে বসো!

সেলিম মালিক অদূরে একটি আসনে বসলে সুলতান বাহাদুর বললেন– ত্রিহূতের খবর কিছু জানো কি? আমাদের রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের অমুসলিম রাজ্য ত্রিহূত্যের?

জি না জাঁহাপনা। ইদানীং ত্রিহূতের কোন খবর আমি জানিনে। জাঁহাপনা যদি মেহেরবানী করে কিছু আভাস দেন...!

কিঞ্চিৎ গম্ভীরকণ্ঠে সুলতান বললেন– ত্রিহূতটা ইদানীং কিছু ঝামেলা সৃষ্টি করছে। জানো তো, ত্রিহূতের পশ্চিমে দিল্লী সাম্রাজ্য আর পূর্বে আমাদের এই লাখনৌতি। অর্থাৎ ত্রিহূত দুই দিকেই মুসলমান রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত। সুতরাং কোন ঝামেলা পয়দা না করে ক্ষুদ্র ঐ হিন্দু রাজ্যটার চুপচাপ থাকার কথা, আর এতদিন তাই ছিল।

জি জাঁহাপনা, তাই ছিল বলেই তো জানতাম।

কিন্তু সেই চুপচাপ আর নেই। কর্নাটরাজ অরিমল্লদেবের মৃত্যুর পরে সে দেশে অমাত্যদের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সেই অন্তর্বিরোধের হাওয়া এসে ত্রিহূতেও লেগেছে। মূলত কর্নাটের কিছু দুষ্ট অমাত্যদের প্ররোচনায় ত্রিহূতের অমাত্যদের মধ্যেও সেই অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, ত্রিহূতের কিছু কিছু অমাত্য ত্রিহূতের পূর্ব সীমান্তে নিজস্ব ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে

গিয়ে ত্রিহূতের পূর্ব দিকে অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে ঢুকে পড়ছে। সেখানে তারা কেউ কেউ আমাদের প্রজাদের মারপিট করে উচ্ছেদ করছে।

এ খবরে সেলিম মালিক গরম হয়ে উঠলো। নিজেকে সংযত করে সে বললো– সে কি জাঁহাপনা! এতটাই সাহস হয়েছে তাদের?

সুলতান বাহাদুর বললেন– হ্যাঁ এতটাই। সেখান থেকে আমাদের অনেক প্রজা এসে এই অভিযোগ করেছে আর কাতরকণ্ঠে তারা এই জুলুমের প্রতিকার চেয়েছে।

; তাজ্জব! বড় তাজ্জব ব্যাপার!

আমি তাই তোমার উপর সেই প্রতিকারের দায়িত্ব দিতে চাই। তুমি কি তাতে রাজী আছো? মানে, তোমার কি কোন অসুবিধা?

সেলিম মালিক দীপ্তকণ্ঠে বললো– আমি তৈয়ার জাঁহাপনা!

সুলতান খোশকণ্ঠে বললেন– শাব্বাশ! যেহেতু এটা বড় কোন লড়াই বা যুদ্ধ বিগ্রহ নয়, সেই হেতু তুমি আর ফয়েজউদ্দীন বেগ তোমাদের ঐ চৌকস বাহিনীটা নিয়ে গিয়ে সেখানে একটা হামলা করলেই ঐ উচ্চাভিলাষী অমাত্যেরা খামুশ হয়ে যাবে।

জি জাঁহাপনা! শুধু ঐ উচ্চাভিলাষী অমাত্য কয়জনই নয়, ওদের অন্তর্বিরোধটাও আমরা খামুশ করে দিয়ে আসবো। ত্রিহূত যাতে করে আগের মতোই চুপচাপ থাকে সেই ব্যবস্থা করে আসবো।

তাতে করে ত্রিহূতে তোমাদের একটা ছোটখাটো লড়াইও হয়ে যেতে পারে। সে জন্যে তোমরা আরো কিছু সৈন্য আর কয়েকজন সেনাপতিও সাথে নিতে পারো।

দরকার হবে না জাঁহাপনা। তবু জাঁহাপনা যদি নির্দেশ দেন, তাহলে অবশ্য তা নেবো।

নেবে। সাবধানের মার নেই। এই অভিযানে তুমিই প্রধান সেনাপতি। যে যে সেনাপতিকে তুমি পছন্দ করো তাদের আর অতিরিক্ত সৈন্য যা নেয়া বিবেচনা করো, তা নেবে।

জো হুকুম জাঁহাপনা!

ইতোমধ্যে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব আবার এসে অদূরে নতমস্তকে দাঁড়ালেন। তা দেখে সুলতান বাহাদুর বললেন– কি মুরব্বী, কিছু কি বলতে চান?

ইয়ারউদ্দীন বেগ সাহেব বরলেন– জি হুজুর! সেলিম মালিকের সাথে হুজুরের কথাবার্তা কি শেষ হয়েছে?

জি মুরব্বী, আমাদের আলোচনা শেষ। এবার আমি উঠবো।

দু'হাত জোড় করে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বিনীতকণ্ঠে বললেন– তাহলে হুজুর আমার একটি নিবেদন আছে।

জি- জি, বলুন মুরব্বী, বলুন?

হুজুরের সম্মান যথাযথ রক্ষা করতে পারবো কিনা জানি না। তবু অনুরোধ, গরীবের বাসায় দয়া করে যখন তশরিফ এনেছেন, তখন কিছু মুখে না দিয়ে হুজুরকে আমি ছাড়তে পারবো না।

সেকি- সেকি!

এমন খোশ-কিসমত তো আমাদের সহজে হয় না হুজুর! আজ যখন সে খোশ-কিসমতি হয়েছে, হুজুরকে দয়া করে আমার এই আবেদন রক্ষা করতেই হবে আজ।

বড় বেকায়দায় ফেললেন মুরব্বী। মস্তবড় বেকায়দায় ফেললেন!

হুজুর!

আসল কথা হলো, আমি বাইরে কোথাও কিছু খাইনে। আমার নিরাপত্তা রক্ষার্থে হেকিম সাহেব আমার খাবার নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর পরীক্ষিত খাবারই আমি খাই।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব হতাশকণ্ঠে বললেন– সেকি হুজুর! তাহলে

তাহলে মানে, কিছু মুখে দিলে একমাত্র আপনার এখানে আমি তা দিতে পারি। একমাত্র আপনার এখানেই আমি খেতে রাজী আছি, নইলে অন্য কোথাও নয়। কারণ, আপনারা সবাই আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনাদের নিয়ে আমার কোন নিরাপত্তাহীনার ভয় নেই।

এ কথায় ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন– হুজুর মেহেরবান!

কিন্তু আজ খুবই ব্যস্ত আছি আমি। আমার অনেক সময় এখানে গেল। আর দেরি করা তো সম্ভব নয়!

হুজুর!

আজ থাক মুরব্বী। সময় করে অন্যদিন এসে আরামে আর পেটপুরে

আপনার মেহমানদারী কবুল করে যাবো।

আবার হতাশ হলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব। বললেন– কিন্তু হুজুর, আমার নাতনী যে হুজুরের আগমনবার্তা পেয়ে মহানন্দে কিছুটা যোগাড়-যন্তর করেই ফেলেছে! সে সব ফেলে রেখে গেলে বেচারী যে মনে খুবই কষ্ট পাবে হুজুর!

: হায় সর্বনাশ! আপনার নাতনী মানে সেই ফুটফুটে কচি মেয়েটা?

জি হুজুর, জি! হুজুরকে বড়ই শ্রদ্ধা করে নাতনী আমার। কথা উঠলেই হুজুরের সাদাসিদে চালচলনের প্রশংসায় খৈ ফুটে নাতনীটার মুখে। তার আয়োজন নষ্ট হয়ে গেলে নাতনী আমার...

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। মনে বড় কষ্ট পাবে!

হুজুর!

আরে আপনার নাতনী মানে তো আমারও নাতনী। তার মনে কষ্ট দেবো? অসম্ভব! আনতে বলুন, আমার যত অসুবিধেই হোক, নাতনীর সাথে আপনাদের সকলের মুখ রক্ষার্থে কিছু আমাকে মুখে দিতেই হবে। তাই রেখে ঢেকে যৎসামান্য কিছু আনতে বলুন। দয়া করে আধিক্যে যাবেন না।

সুলতান একা আছেন জেনে আব্রুর বাহুল্যে না গিয়ে সেলিনা বানু বেগম হুকুমবরদার জাফর মিয়া সহকারে খাবারের আনযাম নিয়ে সুলতানের সামনে হাজির হলো এবং 'আর না, আর না' করতে করতে সুলতানকে সে বেশ খানিকটা পেটপুরে খাইয়েই তবে ছাড়লো।

সে যাই হোক, দিন দুইয়েক পরেই সুলতান বাহাদুরের নির্দেশ অনুযায়ী সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগ কিছু অতিরিক্ত সৈন্য ও দুই তিনজন বিশ্বস্ত সেনাপতি সহকারে গিয়ে ত্রিহূতে হাজির হলো। এতটার প্রয়োজন ছিল না। শুধু সুলতান বাহাদুরের নির্দেশ পালনেই অতিরিক্ত সেনাসৈন্য সাথে আনতে হলো তাদের। কারণ, সেলিম মালিকদের সামাল দেয়ার ক্ষমতা ত্রিহূতের ছিল না। ত্রিহূতের সমবেত শক্তির সাথে সেলিম মালিকদের একটা ছোটখাটো যুদ্ধ হলেও কয়েক পলকের মধ্যেই ত্রিহূতের সমুদয় শক্তি ধরাশায়ী হয়ে গেল এবং ত্রিহূতের সকল অমাত্য ও নেতৃবৃন্দের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে উঠলো। তাই প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজনে তারা সেলিম মালিকদের কাছে নতিস্বীকার করে এই মর্মে ওয়াদা করলো যে, অতঃপর ত্রিহূতের আর কেউ কোন শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করবে না বা ত্রিহূত

লাখনৌতির কোন অসন্তোষের কারণ হবে না। শুধু তাই নয়, এই ওয়াদা অক্ষুণ্ন রাখার নিশ্চয়তা দিতে ত্রিহূত লাখনৌতির প্রভুত্ব মেনে নিয়ে লাখনৌতির সুলতানকে কর দিতে বাধ্য হলো।

ত্রিহূতের পরে এলো কামরূপের পালা। করোতোয়া নদীর পূর্বদিকে কামরূপে সে সময় অনেকগুলো সামন্ত রাজা রাজত্ব করতো। এই রাজাদের মধ্যে কোন বানিবনা ছিল না। সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি সাহেব কখনো সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগকে পাঠিয়ে এবং কখনো অন্যান্য সেনাপতিদের পাঠিয়ে এই সব সামন্ত রাজাদের অনেককে পরাজিত করে কর দিতে বাধ্য করেন। সুলতান ইওজ খলজি সাহেব নিজেও একবার পূর্ববাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ তাকে বাধা দেয়ায় এই অভিযান তেমন ফলপ্রসু হয়নি। এই অভিযান করেন তিনি ১২২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে। এ সময় লক্ষ্মণ সেনের এক পুত্র বিশ্বরূপ সেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করতেন। এই বিশ্বরূপ সেন গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করলে সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি সাহেব পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেন এবং বিশ্বরূপ সেনের এই ঔদ্ধত্য দমন করেন।

এক কথায়, সুলতান বখতিয়ার খলজি সাহেবের পর সুলতান ইওজ খলজি সাহেবই সর্বপ্রথম রাজ্য বিস্তারে মন দেন এবং তিনি উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সকল দিকেই লাখনৌতি রাজ্যের সীমান্ত বর্ধিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম লাখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে বাংলার মুসলিম রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন। দিল্লী সুলতান ইলতুতমিশ বাধা না দিলে হয়তো তাঁর সে স্বপ্ন সফল হতো। কিন্তু ইলতুতমিশের বিরোধিতাই তা বরবাদ করে দেয়। সে কথা পরে।

পরে মানে, দিল্লীর সুলতানের অধীনতা স্বীকার করার পরিবর্তে নিজেকে দিল্লীর সুলতানের সমকক্ষ প্রতিপন্ন করতে বাগদাদের খলিফার নিকট থেকে সুলতানীর সনদ নেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি সাহেব। এতে করে দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশ ইওজ খলজি সাহেবের চির দুশমনে পরিণত হন এবং সর্বদাই তাঁর (ইওজ খলজি সাহেবের) দুশমনী করতে থাকেন।

৬

সেরেস্তার দপ্তরী গাফফার আলী আর খানসামা নছর খাঁর সামনেই রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী সাহেবকে তাঁর প্রবীণ কর্মচারী মাসুদ গজনবী এসে বললো– হুজুর! আর তো পারিনে। আপনার ছেলে বাহারাম কোরেশী বাবাজী যে আমার জানটা ঝালাপালা করে ফেললো।

আজমতুল্লাহ কোরেশী সাহেব বললেন– ঝালাপালা করে ফেললো মানে? কি কারণে ঝালাপালা করে ফেললো?

মাসুদ গজনবী বললো– শাদি করার জন্যে হুজুর, শাদি করার জন্যে।

শাদী করার জন্যে?

জি হুজুর। বয়সটা তো কম হয়নি। এখনো শাদি না হলে এমনটি তো করবেই।

বটে! তা তোমার কাছে কেন? তুমি শাদি দেবে?

শরম পেয়ে মাসুদ গজনবী বললো– কি যে বলেন হুজুর! আমি শাদি দেবার কে? শাদি তো দেবেন আপনি।

কোরেশী সাহেব বললেন– তাহলে তোমার কাছে সে কি বলে? মানে কি চায়?

সুপারিশ হুজুর, সুপারিশ। তাকে তাড়াতাড়ি শাদি দেয়ার জন্যে আমি আপনাকে সুপারিশ করি– এই জন্যে বাবাজী অবিরাম আমার পেছনে ঘুরছে। কোথায় যেন শাদিটা তার ঠিক করেই রেখেছেন?

হ্যাঁ, রেখেছিই তো। সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেবের মেয়ের সাথে শাদি তার ঠিকঠাক করাই আছে।

জি হুজুর, জি-জি। ঐ মেয়েই নাকি বাহারাম বাবাজীর বেজায় পছন্দ। ঐ মেয়েকে শাদি করতে না পারলে বাবাজী নাকি আত্মঘাতী হবে।

: বলো কি!

জি হুজুর! ঐ মেয়েকে শাদি করার জন্যে সে উন্মাদ। ঠিকঠাক করাই আছে যখন তখন আর গড়িমসি করছেন কেন হুজুর? ইতিমধ্যে ও পক্ষ থেকে কি কোন আপত্তি টাপত্তি এসেছে?

কোরেশী সাহেব সরবে বললেন– আরে না-না। আপত্তি আসবে কি! আমার ছেলের সাথে তাদের মেয়ের শাদি দিতে তারা এক পায়ে খাড়া। বিশেষ করে মেয়ের বাপ এমন ঘরবর পেয়ে একদম বর্তে গেছেন। এক কথায় রাজী হয়েছেন। মানে কথাবার্তা সব পাকা। আমি ব্যস্ত থাকায় দিন তারিখটা ঠিক করতে যেতে পারিনি। তাই শাদিটা আটকে আছে।

: হুজুর!

দিন তারিখ ঠিক করতে গেলে হাতে চাঁদ পাবেন তাঁরা। খুশিদে গদ গদ হয়ে যাবেন সবাই।

তাহলে যান হুজুর। শুভ কাজে দেরি করা ঠিক নয়। আপনার ছেলের ইচ্ছে, এই হপ্তার মধ্যেই ওখানে তার শাদিটা হোক।

: যাবো যাবো। দু'একদিনের মধ্যেই যাবো। আর দেরি করবো না।

: হুজুর!

যাও! বাহারামকে গিয়ে বলো, আর অস্থির হওয়ার দরকার নেই। শিগগিরই তার শাদিটা সম্পন্ন করে ফেলবো।

: ঠিক বলছেন হুজুর?

ঠিক-ঠিক। একদম ঠিক। আগামীকাল কি পরশুই আমি সেখানে যাবো। তুমি এখন যাও...!

বলেই রাজস্ব উজির সেখান থেকে সরে গেলেন। কর্মচারী মাসুদ গজনবীও খুশি হয়ে চলে গেল সেখান থেকে। এদের এই আলোচনা শুনে আওয়ারা বনে গেল দপ্তরী গাফফার আলী আর তার দেখা দেখি খানসামা নছর খাঁও। নছর খাঁকে লক্ষ্য করে গাফফার আলী লাফিয়ে উঠে বললো– মার দিয়া কেল্লা। এক ঢিলে দুই পাখি। ওদিকে মোটা ইনাম আর এদিকে খাজাঞ্চির পদ।

নছর খাঁ প্রশ্ন করলো– মানে-মানে? তার মানে?

গাফফার আলী বললো– আর মানে! এই খবরটা আজকেই গিয়ে কনের

বাপকে দিলে কনের বাপের মোটা ইনাম। আর আগাম খবর দিয়ে কনের বাপকে খুশি করেছি জানলে বরের বাপের পুরস্কার খাজাঞ্চির পদ– মারদিয়া কেল্লা!

খানসামা নছর খাঁ ক্রোধভরে বললো– বটে! কনের বাড়িতে তুই যাবি এই খবর নিয়ে?

গাফফার আলী রুষ্টকণ্ঠে বললো– আমি যাবো না তো কি তুই যাবি?

একশো বার আমি যাব। তোর পা আছে আর আমার পা নেই? আমি হাঁটতে জানিনে? তোর আগেই যাবো। এখনই...!

নছর খাঁ ঘুরে দাঁড়াতেই বাঘের মতো তার সামনে এসে পড়ে গাফফার আলী বললো– খবরদার নছর! তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো!

নছর খাঁও গর্জে উঠে বললো– হুঁশিয়ার গাফফার! তোর ঠ্যাং গুঁড়িয়ে দেবো। পথ ছাড়!

সাবধান!

খামোশ!

তবে রে! ইয়া আলী!

তবে রে। হক মওলা!

দু'জন দু'জনের উপর পড়ে পড়ে– এই সময় সেখানে ফের ফিরে এলেন রাজস্ব উজির সাহেব। তিনি ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– এই-এই, কি হলো? তোমরা এত গোলমাল করছো কেন? তোমাদের কি ভূতে ধরেছে?

চুপসে গেল গাফফার আলী আর নছর খাঁ। দু'জনই মিন মিন করে বললো– হু-জু-র!

হুজুর বললেন– সারাদিন কেবলই মাম্‌দোবাজি! তোমাদের কাজ নেই, কাজে যাও! গাফফার...

গাফফার আলী ভয়ে ভয়ে বললো– যাই হুজুর!

হুজুর নছর খাঁকে লক্ষ্য করে বললেন– নছর খাঁ!

নছর খাঁও ভয়ে ভয়ে বললো– যাই হুজুর!

হুজুর বললেন– হ্যাঁ, তাই যাও। সুলতান বাহাদুরের দরবারে আমার কিছু কাজ আছে। আমি সেখানে যাচ্ছি। তোমরা গোলমাল করো না শুধু। কাজে

যাও। কাজ না থাকে, ঘরে গিয়ে ঘুমোও গে। হৈ চৈ করে লোক জড়ো করো না।

আবার চলে গেলেন উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী। উজির সাহেব অদৃশ্য হয়ে গেলে ওখানেই থপ্ করে বসে পড়লো দপ্তরী ও খানসামা। নছর খাঁ নেতিয়ে পড়ে বললো– গোলমাল করে লাভ নেই রে গাফফার! একটা মিটমাট করে নে!

গাফফার বললো– মিটমাট!

নছর বললো– হ্যাঁ, মিটমাট। মিটমাট করে না নিয়ে একা যেতে চাইলে ফের গোলমালটাই হবে। একা যেতে পারবো না কেউ আমরা।

গাফফার একটু চিন্তা করে বললো– তা ঠিক, তা ঠিক। কিন্তু কিভাবে মিটমাটটা করবি?

সহজভাবে। তুই দুই পাখির কথা বললিনে? একটা পাখি তুই নে, একটা পাখি আমাকে দে। এইভাবে মিটমাট করে নিয়ে চল দুইজন এক সাথেই যাই।

সেই ভাল, সেই ভাল। তা দুই পাখির কোন পাখিটা নিবি? খাজাঞ্চির পদ কিন্তু জান গেলেও ছাড়বো না আমি!

ঠিক আছে। তুই সেরেস্তার দপ্তরী। জ্ঞান-বুদ্ধিওয়ালা মানুষ। খাজাঞ্চির যোগ্য লোক। আমি খানসামা। মুখ্যশুখ্যু মানুষ। কাজেই খাজাঞ্চির পদটা নিবি, নে। কিন্তু কনের বাপের মোটা ইনামটা আমাকে দিতে হবে কিন্তু!

ইনামটা নিবি?

হ্যাঁ। তুই খাজাঞ্চির পদ নে, আমি ইনাম নিই। ব্যস, মিটে গেল। এর চেয়ে আর ভাল মিটমাট হবে কি?

গাফফার আলী খুশি হয়ে বললো– ঠিক হ্যায় মেরে ইয়ার। ইয়ে বাত বড়ি আচ্ছা হায়। চল, এবার দুইজনই একসাথে যাই–

তখনই উঠে দুইজন এক সাথে হাঁটা দিল সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজির বাসার দিকে।

শাহাবুদ্দীন সাহেবের বাসায় এসে গাফফার আলী ও নছর খাঁ দহলিজের সামনে দাঁড়ালো। সেখানে কাউকে না দেখে দুইজন এদিক ওদিক চাইতে লাগলো আর স্বাভাবিককণ্ঠে 'কে আছেন– কে আছেন' বলে ডাকতে

লাগলো। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করেও কোন কাজ না হওয়ায় মেজাজ বিগড়ে গেল দুইজনের। এবার তারা দুইজন এক সাথে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে হাঁক দিলো– বাসায় কে আছেন?

চিৎকার শুনে ছুটে এলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব। রুষ্টকণ্ঠে বললেন– কে? গাধার মতো চিৎকার করে কে?

গাফফার আলী ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো– কি? আমরা গাধা? বাসার লোকজন সব থাকে কোথায়? কোথায় থাকো তোমরা? নাকে তেল দিয়ে দিনরাত শুধু ঘুমাও?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব গর্জে উঠে বললেন– খামুশ কমবকতের দল! কে তোমরা?

গাফফার আলী ভারিক্কী চালে বললো– মেহমান! মস্তবড় মেহমান। কতবড় মেহমান তা শুনলে মাথা তোমার ঘুরে যাবে। কোথায় বসাবে, কি খাওয়াবে ভেবে দিশেহারা হয়ে যাবে!

: চুপ রও! কে তোমরা? কেন এখানে এসেছো?

: কথা বলতে এসেছি। দুর্দান্ত খুশির কথা।

: খুশির কথা। কি কথা, বলো?

: বলবো কাকে? যাঁকে বলবো, তাঁকেই তো দেখছিনে। উনি কোথায়?

: উনি মানে?

: উজির সাহেব। সৈন্য বিভাগের উজির শাহাবুদ্দীন সাহেব। তিনি কোথায়?

সে বাসায় নেই।

: বাসায় নেই? তাহলে আর বলবো কাকে!

আমাকে বলো, আমি শাহাবুদ্দীনের আব্বা।

: আব্বা? আসল লোক বাদ দিয়ে আব্বাকে বলে কি কোন ফায়দা হবে?

এবার কথা ধরলো নছর খাঁ। বললো– হবে রে গাফফার। উজির সাহেবের আব্বা। মানে মেয়ের দাদা। আসলের উপর আসল লোক। ওঁকেই বল।

গাফফার বললো– বলিস কি!

নছর খাঁ নীচু গলায় বললো– হ্যাঁ রে! আমার খেয়াল হয়েছে। গতবার এসে এই লোককেই দেখেছিলাম।

গাফফার বললো– তাই নাকি? তাহলে বলবো?

নছর খাঁ বললো– হ্যাঁ বল। একটু তাজিমের সাথে বল!

তবু গাফফার আলী ইতস্তত করতে লাগলো। তা দেখে আবার ক্ষেপে গেলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব। বললেন– তবে রে! কি বলবে চটপট বলো, নইলে বিদেয় হও।

নড়েচড়ে উঠে গাফফার আলী বললো– এতবড় খুশির খবর এইভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে বলবো? আমাদের সম্মান নেই?

: সম্মান?

হ্যাঁ সম্মান! বললাম না, আমরা মানী লোক? মস্তবড় সম্মানী মেহমান? আমাদের দহলিজের ভেতরে নিয়ে বসান। দামী দামী কুরসি (চেয়ার) পেতে দিন।

বটে!

শুধুই কি কুরসি দিলে হবে? কুরসি পেতে দিয়ে বাড়ির ভেতরে যান। জলদি জলদি পান শরবত আনুন।

সঙ্গে সঙ্গে নছর খাঁ বলে উঠলো– সেই সাথে ইনামটাও আনুন। মোটা ইনাম হওয়া চাই কিন্তু। এতবড় সুখবরের ইনাম দুই দশ তংকার ফালতু ইনাম না হয় যেন। তংকা দিলে থলে ভরা হওয়া চাই।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললো– আরে, শুধুই সুখবর সুখবর করছো মানে? কি সে সুখবর?

গাফফার আলী গদগদকণ্ঠে বললো– আপনার নাতনীর শাদি। ঐ সুন্দরী নাতনীর।

শাদি! কবে?

পরশু বা তরশু। আগামীকাল বরের বাপ আসছে শাদির দিন তারিখ পাকা করতে। দিন তারিখ হয়ে গেলেই পরশু বা তরশুই শাদি।

বটে! কে সে বরের বাপ?

মস্তবড় মানুষ। আসমান সমান মান-সম্মান। মহামান্য রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী হুজুর।

আর বর?

: উনার ছেলে বাহরাম কোরেশী। আসমানের আস্ত চাঁদ।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব দাঁত পিষে বললেন– চাঁদ, না আস্ত বাঁদর?

চমকে উঠে গাফফার আলী বললো– কি কি? বাঁদর?

ইয়ারউদ্দীন খলজি বললেন– হুতুমধুম! আমড়ার ঢেকি!

আমড়ার ঢেঁকি!

ভুষির বস্তা!

: ভুষির বস্তা মানে? সে কি মানুষ নয়?

: না, আস্ত একটা উদ বিড়াল।

পারবেন? বলার সাহস আছে? কাল যখন রাজস্ব উজির হুজুর শাদির দিন ঠিক করতে আসবেন, তখন একথা বলতে পারবেন? এই এতবড় অপমানের কথা?

শুধুই বলা! শাদির কথা নিয়ে এলে ঐ উজিরেরই মান থাকবে না, তার ছেলের আবার মান অপমান!

উজির হুজুরেরই মান থাকবে না?

শাদির কথা নিয়ে এলে তাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। বাড়িতে বসতে দেয়াও হবে না।

উত্তেজিত হয়ে উঠলো গাফফার আলী ও নছর খাঁ দু'জনেই। দু'জনই একসাথে চিৎকার করে বললো– হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার!

উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবও। বললেন– নিকালো, নিকালো হিঁয়াসে! উল্লুকের দল কাঁহাকার। তাঁর প্রস্তাব তো অনেক আগেই নাকোচ করে দেয়া হয়েছে। তবু তিনি প্রস্তাব নিয়ে আসবেন কোন আক্কেলে? লাজ না থাকলে যোগ্য লাজই দেয়া হবে তাঁকে।

সেকি- সেকি!

ফের সেকি! ভাগো, ভাগো জলদি! এই কে আছিস?

হাঁক দিতেই বল্লম হাতে ছুটে এলো এক পাহারাদার। চক চক করছিল তার বল্লমের ফলাটা। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– বিদায় করো এই উল্লুকদের!

পাহারাদার বল্লমটা ঘুরিয়ে ধরতেই আঁতকে উঠলো গাফফার আলী ও নছর খাঁ

 বইঘর ও রোকন

দুইজনই। 'ওরে মরেছিরে! পালা পালা!' বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো দুইজন।

রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ্ কোরেশী সাহেব বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরতে তাঁর রাত হলো। এ কারণে নছর খাঁরা ঘটনার কথা উজির সাহেবকে সেদিন বলতে পারলো না। পরের দিন সকালে সাজগোজ করে উজির সাহেব বাইরে যাওয়ার উদ্যোগ করলে খানসামা নছর খাঁ ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলো– কোথায় যাবেন হুজুর?

উজির সাহেব আনমনে বললেন– সে খবরে তোমার কাজ কি?

নছর খাঁ বললো– না, মা-নে এমনি একটু জানার আগ্রহ হলো হুজুর, তাই!

যাই, সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেবের বাসাতে আজ যাই। আমার বাহারামের শাদিটা বেশ কিছুদিন হলো আটকে আছে তো, আজ গিয়ে শাদির দিন তারিখ চূড়ান্ত করে আসি।

শুনে চমকে উঠলো নছর খাঁ। বললো– যাবেন না, দোহাই হুজুর যাবেন না। আমি অনুরোধ করছি।

উজির সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– যাবো না মানে?

মানে ও বাড়িতে ছোট হুজুরের শাদির কথা নিয়ে যাবেন না হুজুর! দোহাই আপনার!!

তাজ্জব! কেন যাবো না, সে কথাটা তো বলবে?

কসুর নেবেন না হুজুর! যারপর নেই অপমান তো হবেনই, আপনার পিঠও বাঁচবে না।

উজির সাহেব ধমক দিয়ে বললেন– নছর খাঁ!

নছর খাঁ তখন আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে গেল না। সে সরাসরি বললো– আমরা, মানে আমি আর গাফফার খুব দৌড়াতে পারি তো তাই কোনমতে পিঠ বাঁচাতে পেরেছি। আপনি তো দৌড়াতে পারেন না। আপনি পিঠ বাঁচাতে পারবেন না।

উজির সাহেব ফের ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– হুঁশিয়ার বেয়াদব! কি বাজে কথা বলছো?

বাজে নয় হুজুর, বাজে নয়। একদম হক কথা। ওখানে গিয়ে শাদির কথা বললে আপনার পিঠের চামড়া তুলে নেবে! বাপরে! বল্লমের ফলাটা কি

চকচকে।

: থামো! কে চামড়া তুলে নেবে?

: কনের দাদা হুজুর! দুলহিনের দাদা!

দুলহিনের দাদা আমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে!

দুলহিনের দাদা নিজে হাত লাগাবেন না। উনি বাড়ির পাইক প্রহরীদের হুকুম করবেন। ঐ পাইক প্রহরীরা তুলে নেবে।

খামুশ! পাইক-প্রহরীরা আমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে?

নেবে হুজুর! তুলে নিয়ে ঐ চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বানাবে।

খুন করবো!

ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়ে এলেন আজমতুল্লাহ কোরেশী সাহেব। এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো গাফফার আলী। সে ব্যস্তকণ্ঠে বললো– কি হলো হুজুর? নছর ভাইয়ের উপর এত ক্রুদ্ধ হলেন কেন?

কোরেশী সাহেব সরোষে বললেন– হবো না? ব্যাটার এতবড় স্পর্দা যে, সে আমাকে যা নয় তাই বলছে!

গাফফার নছরকে প্রশ্ন করলো– সেকি! হুজুরকে তুমি কি বলেছো?

নছর খাঁ করুণকণ্ঠে বললো– গতকাল ঐ শাহাবুদ্দীন উজির সাহেবের বাসায় যা ঘটেছিল তাই বলেছি। আমাদের হুজুর যে আজ আবার ওখানে শাদির কথাবার্তা পাকা করতে যাচ্ছেন!

শুনে চমকে উঠলো গাফফার আলী। ব্যস্তকণ্ঠে বললো– যাবেন না। হুজুর, ওখানে যাবেন না! গেলে মান-সম্মান তো থাকবেই না, আপনার পিঠও বাঁচবে না। রাগে ওরা ফুঁসছে। আপনাকে আর ছোট হুজুরকে ওরা জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে।

গাফফারের মুখেও ঐ একই কথা শুনে থমকে গেলেন রাজস্ব উজির সাহেব। গাফফার আলীকে প্রশ্ন করলেন– সেকি! তুমিও এই কথা বলছো? ঘটনা কি বলো তো! তোমরা এসব কথা কার কাছে শুনলে?

গাফফার আলী নতমস্তকে বললো– কসুর মাফ হয় হুজুর! এসব কথা শোনা কথা নয়। নিজের চোখে দেখা আর নিজের কানে শোনা। হুজুরকে না জানিয়ে আমি আর নছর ভাই ও বাড়িতে গিয়েছিলাম খবরটা জানাতে। মানে, হুজুর যে আজ ও বাড়িতে শাদির দিন তারিখ পাকা করতে যাবেন, সেই কথা

বলতে। ওরে বাপরে! সে কথা বলার সাথে সাথে কি তাদের রাগ আর কি গালাগাল! আপনাকে আর বাহারাম হুজুরকে তো কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিলোই, তার উপর পাইক ডেকে এনে আমাদের মারার ব্যবস্থা করলো। চকচকে ফলাওয়ালা বল্লম হাতে পাইক এসে আমাদের উপর চড়াও হতেই আমরা দৌড় দিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম। নইলে ঐ বল্লম দিয়ে আর না হোক, খুবলে খুবলে আমাদের পিঠের চামড়া তুলে নিতো।

কোরেশী সাহেব তাজ্জব হয়ে বললেন– বলো কি! এমন ঘটনা!

এমন ঘটনাই হুজুর, এমন ঘটনাই।

এরপর ঘটনাটা আগাগোড়া বর্ণনা করে গাফফার আলী বললো– ওদের মেয়ের শাদি তো ওরা জান গেলেও ছোট হুজুরের সাথে দেবেই না, এ কথা যে বলতে যাবে তারও জান-মান কিছুই থাকবে না। ও বাড়িতে খবরদার যাবেন না হুজুর!

কোরেশী সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– বটে! ওখানে কি শাহাবুদ্দীন সাহেব ছিলেন?

না হুজুর, উনি ছিলেন না। কিন্তু শাহাবুদ্দীন সাহেবের আব্বা এমন ব্যবহারই করলেন।

ঠিক আছে। আমি ও বাড়িতে যাবো না। আমি যাবো শাহাবুদ্দীন সাহেবের দপ্তরে। দেখি তার কি সাধ্য আমাকে অপমান করে আর কথা দিয়ে কথার বরখেলাপ করে!

সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব তাঁর দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। এই সময় হুড়মুড় করে তার কক্ষে ঢুকে পড়লেন রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী সাহেব। চোখ তুলে শাহাবুদ্দীন সাহেব কোরেশী সাহেবের চোখ মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলেন ঘটনাটা। তবু ভদ্রতা করে বললেন– আরে কোরেশী সাহেব যে! আসুন- আসুন! সামনের ঐ কুরসিটাতে বসুন।

কোরেশী সাহেব ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– থাক, ওরকম দশটা কুরসী আমার দপ্তরেও আছে। আমি বসতে আসিনি। আমি জানতে এসেছি।

জানতে এসেছেন! কি জানতে এসেছেন?

আপনি যে ওয়াদা করেছিলেন, সে ওয়াদা আপনি রাখছেন কিনা।

ওয়াদা! কোন ওয়াদা?

 বইঘর ও রোকন

আমার ছেলের সাথে আপনার মেয়ের শাদি দেওয়ার ওয়াদা। আপনি এ শাদি দিচ্ছেন কি না?

তা কথা হলো...

রাজস্ব উজির চাপ দিয়ে বললেন– আমি কোন কথা শুনতে আসিনি। আমি সরাসরি উত্তরটা শুনতে চাই। আপনি এ শাদি দিচ্ছেন কিনা?

শাহাবুদ্দীন সাহেব গম্ভীর ও স্পষ্টকণ্ঠে বললেন– না, দিচ্ছি না।

দিচ্ছেন না? কেন? সে কথা তো আপনি আমাকে আগে বলেননি?

আপনি আগে তা জানতে আসেননি বলে বলিনি।

অর্থাৎ?

যাঁরা জানতে এসেছিলেন, তাঁদের অনেক আগেই আমার না জবাবটা জানিয়ে দিয়েছি।

যাঁরা এসেছিলেন মানে? কারা এসেছিলেন?

আপনারই লোকজন।

কৈ, তারা তো কেউ সে কথা আমাকে বলেনি?

সে দোষ তাদের, আমার নয়।

বটে! কেন আপনি না জবাব দিয়েছিলেন? আপনি তো সরাসরি কথা দিয়েছিলেন আমাকে।

না, ঠিক সরাসরি কথা দেয়া নয়। আপনার অতি আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমি আমার সম্মতিটা দিয়েছিলাম মাত্র।

তাহলে এখন অসম্মত হচ্ছেন কেন?

বাড়ির কেউই এ শাদিটা মেনে নিতে চায়নি বলে।

মেনে নিতে চায়নি কেন?

বাড়ির সকলেই এ শাদিটা পছন্দ করেনি।

বাড়ির সকলের সাথে তো আমার ছেলের আমি শাদি দিতে চাইনি। আমি শাদি দিতে চেয়েছি আপনার মেয়ের সাথে।

আমার মেয়েও এ শাদি মেনে নিতে চায়নি।

কেন মেনে নিতে চায়নি?

 বইঘর ও রোকন

শাহাবুদ্দীন সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেলেন এবং বিরক্তির সাথে বললেন– এক কথা কয়বার বলবো? মেয়ের ঘরবর কোনটাই পছন্দ হয়নি, তাই মেনে নিতে চায়নি।

কোরেশী সাহেব তবুও জোর দিয়ে বললেন– তাতে কি এসে যায়? আপনি যেখানে কথা দিয়েছেন সেখানে মেয়ের পছন্দ অপছন্দে কি এসে যায়? শাদির ব্যাপারে এমন অপছন্দ অনেক মেয়েই করে। অনেক মেয়েই প্রথমে নরাজী জানায়। সেটা দেখতে গেলে চলে? ওসব ফালতু রাজী গররাজীকে পাত্তা না দিয়ে আপনি শাদিটা দিয়ে দেবেন!

শাদিটা দিয়ে দেবো? মেয়ে আমার গরু না ছাগল যে, তার চরম অনিচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যেখানে সেখানে তাকে বেচে দেবো?

যেখানে সেখানে বেচে দেবেন মানে? আমার ছেলে বাহারাম যেখানে বর, দশজনের নজরকাড়া নওশা...!

: আপনার ঐ নজরকাড়া নওশাকে আমার মেয়ে বিন্দুমাত্র পছন্দ করেনি।

তাই আপনার আব্বা আমার ছেলেকে উদবিড়াল, বাঁদর, ভুষির বস্তা ইত্যাদি বলে গালাগাল দিয়েছে?

হ্যাঁ, তাই শুনলাম।

আমার লোকেরা সেই শাদির কথা নিয়ে যাওয়ার জন্যেই তাদের অশ্রাব্য ভাষায় তিরস্কার করেছে?

হ্যাঁ, শুনলাম গতকাল নাকি দুইজন উল্লুখ না বাঁদর আমার আব্বার কাছে গিয়েছিল।

কি বললেন? তারা উল্লুক? তারা বাঁদর?

বাঁদরামী করলে লোকে তাদের বাঁদরই বলে।

বাঁদরামী করেছিল? তারা বাঁদরামী করেছিল?

চূড়ান্ত বাঁদরামী! তারা নাকি গিয়েই যে তম্বিতম্বা আর দম্ভ-অহংকার শুরু করেছিল, তা কোন সভ্য লোকের ছেলেরা করে না। বাঁদর উল্লুকেরাই করে।

আর সেই জন্যেই তাদের হত্যা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল? পাইক ডেকে এনে হত্যা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল?

নেহায়েতই কেউ যদি কাউকে গায়ে পড়ে আক্রমণ করে, তাহলে সে পাল্টা আক্রমণ করবেই।

: বটে! জানেন এগুলো জঘন্য অপরাধ? কানুন বিরোধী আচরণ?

কোনগুলো?

: সবগুলোই। আপনি আর আপনারা যা করেছেন, তা সবগুলোই।

যেমন?

আপনি আপনার মেয়ের শাদি দেয়ার ওয়াদা করে, ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন, আমার মতো একজন সম্মানী উজিরকে আর আমার ছেলেকে আপনারা জঘন্য ভাষায় গালাগাল করেছেন, সর্বোপরি আমার কর্মচারীরা আপনাদের বাসায় গেলে তাদের হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। জানেন, এগুলো, বিশেষ করে কাউকে হত্যা করার চেষ্টা গুরুতর আর চরম দণ্ডনীয় অপরাধ?

: না, গুরুতর অপরাধও নয়, দণ্ডনীয় অপরাধও নয়।

নয়?

না, নয়। কেউ কারো উপর অকারণে হামলা করলে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা হামলা করা মোটেই কোন অপরাধ নয়। আত্মরক্ষার অধিকার সব লোকেরই আছে।

কি বাজে কথা বলছেন! আমার কর্মচারীরা হামলা করেছিল?

করেছিল বই কি? তাদের আচরণে অতিষ্ট হয়ে পুনঃপুনঃ তাদের বিদায় হওয়ার কথা বলা সত্ত্বেও তারা বিদায় না হয়ে উল্টো আরো শক্ত হয়ে ঘাড়ে চেপে বসার চেষ্টা করলে তাকে হামলা করাই বলে।

কোরেশী সাহেব ক্রোধে অন্ধ হয়ে চিৎকার করে বললেন– ফালতু অজুহাত। ঠ্যাং ভাঙ্গা অজুহাত। এসব অজুহাত ধোপে টিকবে না। সুলতান বাহাদুর থুৎকারের সাথে এসব উড়িয়ে দেবেন।

: সুলতান বাহাদুর! এর মধ্যে আবার সুলতান বাহাদুরের কথা আসছে কেন?

অমনি ছেড়ে দেবো? এই অভিযোগ নিয়ে আমি এখনই সুলতান বাহাদুরের কাছে যাবো আর নালিশ জানাবো। ওয়াদা ভঙ্গ অশ্রাব্য গালিগালাজ আর হত্যা করার উদ্যোগ নেয়ার আমি বিচার চাইবো। দেখি, এসব গুরুতর অপরাধ সুলতান বাহাদুর কি করে উপেক্ষা করেন!

তাই কি?

করবেন না- করবেন না। আমাদের সুলতান বাহাদুর সর্বজন বিদিত একজন ন্যায়পরায়ণ সুলতান আর নিরপেক্ষ বিচারক। আপনাদের কাউকে

তিনি রেহাই দেবেন না। আমি চললাম সেখানে...

যান। আমরাও জানি তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ সুলতান আর সুবিচারক। কাজেই আমাদের কোন ভয় নেই। আপনি তাই যান...

শাহাবুদ্দীন সাহেবের এই শেষের কথায় কোন কান না দিয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেলেন রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী।

সুলতান বাহাদুর লোকজনের সাথে কিছু জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। আগে যোগাযোগ না করে আর প্রচলিত আদব কায়দা প্রদর্শন করা বাদ দিয়ে রাজস্ব উজির উত্তেজিতভাবে সুলতানের ব্যস্ততার মধ্যে ঢুকে পড়লে সুলতান বাহাদুর বিস্মিত হলেন। অন্যের সাথে কথাবার্তা শেষ করে তিনি যথাসম্ভব সংযতভাবে বললেন– একি! রাজস্ব উজির কোরেশী সাহেব যে! আপনি হঠাৎ এই জরুরী...

সুলতানকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কোরেশী সাহেব উত্তেজনার সাথে বললেন– আমি অভিযোগ নিয়ে এসেছি জাঁহাপনা। গুরুতর অভিযোগ।

সুলতান বাহাদুর বললেন– গুরুতর অভিযোগ! কার বিরুদ্ধে?

: সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজির বিরুদ্ধে।

আরো অধিক বিস্মিত হলেন সুলতান। বললেন– কি অভিযোগ?

কোরেশী সাহেব বললেন– একাধিক অভিযোগ জাঁহাপনা। তিন তিনটে অভিযোগ।

যথা?

আমার প্রথম অভিযোগ হলো শাহাবুদ্দীন সাহেব আমার ছেলের সাথে তাঁর মেয়ের শাদি দেয়ার কথা দিয়ে সে কথার বরখেলাপ করেছেন। আমাকে প্রতারণা করেছেন।

কেন তিনি তা করলেন? কথা রাখলেন না কেন?

তার মেয়ে আমার ছেলেকে পছন্দ করলো না– এই ফালতু কারণে।

পছন্দ করলো না? আপনার কোন ছেলেকে?

ছেলে আমার একটাই জাঁহাপনা। আমার ছেলে বাহারাম কোরেশীকে।

বাহারাম কোরেশী? তার মানে? তাকে পছন্দ করবে কেন?

 বইঘর ও রোকন

কেন করবে না জাঁহাপনা?

আমি তো আপনার বাহারাম কোরেশীকে চিনি। সে যেমনই অযোগ্য অপদার্থ, তেমনই দৃষ্টিকটু তার চেহারা। পেটে বিদ্যাও তার নেই তেমন কিছু। এমন ছেলেকে শাহাবুদ্দীন সাহেবের ঐ বিদূষী আর পরমা সুন্দরী মেয়ে পছন্দ করবে কেন? জান গেলেও সে আপনার ছেলেকে শাদি করতে পারে না।

জাঁহাপনা!

শাহাবুদ্দীন সাহেবের কথার বরখেলাপের অভিযোগ এখানে টিকে না। মেয়ে রাজী না হলে তার কি করার আছে! আপনার দ্বিতীয় অভিযোগ কি?

আমাকে আর আমার ছেলেকে তারা কুৎসিৎ আর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেছে জনাব!

করেছে? কথাটা একটু সম্মানের সাথে, মানে উজির মানুষ তো!

হ্যাঁ, মানে, করেছেন জাঁহাপনা।

কে করেছেন? শাহাবুদ্দীন সাহেব?

জি না জাঁহাপনা, তাঁর আব্বা।

তাঁর আব্বা? মানে, ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব? বলেন কি? ঐ মুরব্বীর মতো একজন ভদ্র, মার্জিত আর স্মিতভাষী মানুষ কুৎসিৎ ভাষায় গালাগাল করতে পারলেন? আপনি নিজে তা শুনেছেন!

জি-না জাঁহাপনা। ঠিক আমি নিজে না শুনলেও, আমার দুই কর্মচারী শুনেছে।

www.boighar.com

আপনার কর্মচারী? তাঁরা কিভাবে শুনলেন?

এই শাদির কথাবার্তা নিয়ে আমার দুই কর্মচারী শাহাবুদ্দীন সাহেবের বাসায় গিয়েছিল। সেখানে ঐ ইয়ারউদ্দীন খলজি তাদেরকে এবং তাদের সাথে আমাকে আর আমার ছেলেকে অশ্রাব্য, জঘন্য আর কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করেছে জাঁহাপনা!

সুলতান বাহাদুর থমকে গেলেন। বললেন– বলেন কি! আপনার কর্মচারীদের উনি এভাবেই গালিগালাজ করেছেন? আমি যে বিশ্বাস করতে পারছিনে!

কোরেশী সাহেব জোর দিয়ে বললেন– এইভাবেই জাঁহাপনা, এইভাবেই। আমি হলফ করে বলছি!

তারা আপনার কোন পর্যায়ের কর্মচারী?

আমার অত্যন্ত নিকট কর্মচারী জাঁহাপনা, একদম কাছের।

অর্থাৎ?

একজন আমার সেরেস্তার দপ্তরী, আর দ্বিতীয়জন আমার খানসামা মানে, বাবুর্চি জাঁহাপনা!

সুলতান বাহাদুরের মাথায় আগুন ধরে গেল। ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– খামুশ! একজন দপ্তরী আর একজন খানসামা গেছে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবের মতো একজন শিক্ষিত আর সম্যশান্ত মুরব্বীর কাছে শাদির কথা নিয়ে! তাদের মুখে ঐ গালিগালাজের কথা শুনেছেন আপনি?

জি জাঁহাপনা, জি! শুধু গালিগালাজই করেননি জাঁহাপনা, তাদের হত্যা করতেও উদ্যত হয়েছিল।

: শুধুই উদ্যত? তাদের হত্যা করেননি কেন?

: জাঁহাপনা!

দপ্তরী আর খানসামা না বাবুর্চি গেছে আপনার প্রতিভূ হয়ে ঐ দেশবরেণ্য মুরব্বীর কাছে? তাদের হত্যা করাই তো উচিত ছিল। ঐ মুরব্বীকে অপমান করার জন্যেই কি ঐ দপ্তরী আর খানসামাকে পাঠিয়েছিলেন সেখানে?

তা কথা হলো–

আপনার অভিযোগ সবই ফালতু অভিযোগ! যান, বিদেয় হন। এখন আমি খুব ব্যস্ত আছি। খামোখা বিরক্ত করবেন না, যান!

যাবো?

হ্যাঁ, বলছিই তো যান, বিদেয় হন!

আজমতুল্লাহ কোরেশী কম্পিতকণ্ঠে বললেন– কাজটা কিন্তু আপনি ভাল করলেন না জাঁহাপনা!

সুলতান বাহাদুর তাঁর আসন থেকে লাফিয়ে উঠে বললেন– খামুশ! আমার কাজের ত্রুটি ধরেন আপনি? বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান! নইলে এখনই...

ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন সুলতান বাহাদুর। চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন কোরেশী সাহেব। আর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে এলাকা ত্যাগ করলেন।

সেখান থেকে এসে দপ্তরে ঢুকতেই রাজস্ব উজির কোরেশী সাহেবের সামনে পড়লো তাঁর সেরেস্তার প্রবীণ কর্মচারী মাসুদ গজনবী। মাসুদ গজনবী শংকিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলো– সেকি হুজুর! আপনার চোখ-মুখের চেহারা এমন দেখছি কেন? কি বললেন উজির শাহাবুদ্দীন সাহেব? শাদির দিন তারিখ ঠিক করলেন না?

রাজস্ব উজির ক্রোধে ফুলতে ফুলতে বললেন– দিন- তারিখ ঠিক করা! ঐ বেঈমান অপমান করে বের করে দিয়েছে আমাকে!

সেকি! আপনাকে অপমান! সুলতানের কাছে নালিশ জানালেন না কেন?

জানিয়েছি। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

হুজুর!

গাধা চালানো সুলতানও আমাকে অপমান করে বের করে দিয়েছে।

সেকি হুজুর! তিনি এই দেশের, মানে সবার মুনিব। মুনিব এই আচরণ করলে আর প্রতিকার কি?

প্রতিকার মনিব বদল। মনিব বদল করতে হবে, আর তা করবোই!

: তার মানে? তার অর্থ কি হুজুর?

সেটা তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলবো। পরে শুনো– বলেই তাকে পাশ কাটিয়ে দপ্তরে প্রবেশ করলেন রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী সাহেব।

৭

রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী আসলেই একজন অল্প শিক্ষিত ও অমার্জিত লোক। সুলতান এটা বুঝতে পারলেন রাজস্ব উজির পদে তাঁকে নিয়োগ দেয়ার পরে। সেই সাথে আরো বুঝতে পারলেন, কর্কশ ও গরম মেজাজের দরুন রাজস্ব আদায়ে কোরেশীর সাফল্যও কিছুটা তারিফের হকদার। এ কারণেই স্বভাবটা অমার্জিত হওয়া সত্ত্বেও কোরেশীকে ঐ পদ থেকে অপসারণ করার ইচ্ছা করেও সুলতান বাহাদুর তা করেন নি। কারণ যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও সহ্য করতে হয়।

এক্ষণে শাহাবুদ্দীন খলজির বিরুদ্ধে কোরেশীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঘটনাটা কি তা যাচাই করে দেখার বড় আগ্রহ হলো সুলতানের। বিশেষ করে, কোরেশীর ছেলে বাহারাম কোরেশী একটা অপদার্থ আর কদাকার চেহারার ছেলে হওয়া সত্ত্বেও, শাহাবুদ্দীন সাহেব সেই ছেলের সাথে তাঁর বিদূষী ও সুন্দরী মেয়ের শদি দেয়ার কথা দিলেন কি করে কিংবা আদৌ কথা দিয়েছিলেন কি না, তা জানার দুর্বার আগ্রহে শাহাবুদ্দীন সাহেবকে পরের দিনই ডেকে পাঠালেন সুলতান।

সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজি সুলতানের সামনে এসে দাঁড়ালে সুলতান বাহাদুর প্রশ্ন করলেন– কি ব্যাপার শাহাবুদ্দীন সাহেব? রাজস্ব উজির কোরেশী সাহেবের ছেলের সাথে আপনার মেয়ের শাদি দেয়ার ওয়াদা করে সে ওয়াদা ভঙ্গ করলেন কেন?

শাহাবুদ্দীন সাহেব বললেন– ঠিক ওয়াদা তো করিনি জাঁহাপনা! ওয়াদা ভঙ্গের প্রশ্ন আসবে কেন?

ওয়াদা করেননি?

: জি না, জাঁহাপনা! আমি যা বলেছি তা আদৌ ওয়াদার পর্যায়ে পড়ে না।

অর্থাৎ?

বইঘর ও রোকন

তাঁর ছেলের সাথে আমার মেয়ের শাদি দেয়ার কথাবার্তারকালে কোরেশী সাহেবের দুর্বার আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমি বলেছিলাম– 'আচ্ছা সেটা দেখা যাবে।' কোরেশী সাহেব তবু নাছোড়বান্দা হয়ে বলেছিলেন, 'না ভাই সাহেব! দোহাই আপনার! দেখা যাবে নয়। আমার ছেলের সাথে আপনার মেয়ের শাদি দিতে আপনি সম্মত কিনা, দয়া করে সেটা বলুন!

তাকে বিদায় করার প্রয়োজনে আমি বাধ্য হয়ে শুধু এইটুকুই বলেছিলাম যে, 'আমার পরিবারের সবাই যদি এ শাদিতে সম্মত হয় আর হন, তাহলে আমার অসম্মত হওয়ার আর কি থাকবে?'

সুলতান বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– ব্যস! শুধু এইটুকুই বলেছিলেন?

জি জাঁহাপনা! শুধু এইটুকুই। আর এটাকেই তিনি ওয়াদা ধরে নিয়ে হইচই জুড়ে দিয়েছেন।

আচ্ছা! তা আপনার পরিবারের সবাই এ শাদিতে অসম্মত হয়েছিলেন?

সবাই জাঁহাপনা, সবাই। বিশেষ করে আমার মেয়ে সেলিনা বানু ঘোরতর আপত্তি তুলে একেবারেই অসম্মত হয়েছিল।

সুলতান বাহাদুর প্রশান্তকণ্ঠে বললেন– তাই তো তার হওয়া উচিত। তার মতো মেয়ে ঐ রকম একটা অপদার্থ ছেলেকে শাদি করতেই পারে না। সে ঠিকই করেছে।

জাঁহাপনা!

আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন, এই মর্মে কোরেশী সাহেব আমার কাছে অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। ঘটনা শুনে আমি তাঁর অভিযোগ এক কথায় নাকোচ করে দিয়েছি। আরো কিছু ফালতু অভিযোগ এনেছিলেন, সেগুলোও নাকোচ করে দিয়েছি।

: জাঁহাপনা মেহেরবান!

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে থেকেই যাচ্ছে শাহাবুদ্দীন সাহেব।

শাহাবুদ্দীন সাহেব বিনীত কণ্ঠে বললেন– মেহেরবানী করে প্রকাশ করুন জাঁহাপনা।

মেয়ের তো আপনার শাদির বয়স যথেষ্টই হয়েছে। এতদিনও তার শাদি দিচ্ছেন না কেন?

তেমন ছেলে তো আজও পাইনি জাঁহাপনা!

চেষ্টা না করলে পাবেন কি করে?

বইঘর ও রোকন

মেয়ের তরফ থেকে কোনই আগ্রহ না আসায় চেষ্টা করাটা তেমন হয়নি জাঁহাপনা।

কোন আগ্রহ না আসায় মানে? মেয়ে কি আপনার শাদি করতে আদৌ আগ্রহী নয়?

তেমন আগ্রহ তো তার দেখি না জাঁহাপনা!

বলেন কি!

অবস্থাটা এই রকমই আর কি।

: নাকি সে অন্য কাউকে ভালবাসে? মানে, অন্য কেউ তার পছন্দ?

শাহাবুদ্দীন সাহেব নতমস্তকে বললেন– এটা তো আমার জানার কথা নয় জাঁহাপনা। এসব ব্যাপারে যা জানার তা সবটুকুই জানেন তার দাদু। মানে, আমার আব্বা। দাদু নাতনীতে এসব ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা হওয়াই স্বাভাবিক।

সুলতান বাহাদুর স্মিতহাস্যে বললেন– ঠিক-ঠিক, আপনি ঠিক বলেছেন।

এরপর থেমে গেলেন সুলতান। ক্ষণিক চিন্তা করে হাসিমুখে বললেন– আপনার বাসায় আমার কিন্তু একটা খানা পাওনা আছে শাহাবুদ্দীন সাহেব! সেদিন আপনার মেয়ের মানে আমার নাতনী সেলিনা বানু বেগমের খানাটা পেটপুরে খেলেও তাড়াহুড়া থাকার জন্যে তৃপ্তির সাথে খেতে পারিনি। তাই ভাবছি...!

উল্লসিত হয়ে উঠে শাহাবুদ্দীন সাহেব বললেন– মেহেরবানী হোক, জাঁহাপনার মেহেরবানী হোক। জাঁহাপনা মেহেরবানী করে আমাদের মেহমানদারী কবুল করলে আমি ধন্য হবো। আমরা সবাই কৃতার্থ হবো। আমি দাওয়াত করছি, মেহেরবানী করে দু'একদিনের মধ্যেই আমার দাওয়াত রক্ষা করতে আসুন জাঁহাপনা।

আসবো?

জাঁহাপনার এ মেহেরবানী আমাকে আর আমার পরিবারের সবাইকে চিরঋণে আবদ্ধ করবে জাঁহাপনা।

বেশ! তাহলে আগামী পরশু আমি আসছি। আপনি আপনার পরিবারের সবাইকে উপস্থিত থাকতে বলবেন।

জাঁহাপনা মেহেরবান, জাঁহাপনা মেহেরবান!

সুলতান বাহাদুর অতঃপর আর দু'এক কথা বলে বিদায় করলেন শাহাবুদ্দীন

সাহেবকে।

নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব ফয়েজউদ্দীন বেগের চৌকস সৈন্যের ঐ ছোট্ট দল নিয়ে গিয়ে সুলতান বাহাদুরকে পাহারা দিয়ে (এক্স্কর্ট করে) নিজ আলয়ে নিয়ে এলেন। জনা দুয়েক দেহরক্ষী নিয়ে সুলতানকে ঐ ঢিলেঢালাভাবে আসতে দিলেন না।

পূর্ব-নির্দেশ মতো চাকর-নফর ও ঝি-চাকরানীসহ পরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সুলতান বাহাদুর এসে পৌঁছার সাথে সাথে আনন্দ উল্লাসে মুখরিত হয়ে উঠলো শাহাবুদ্দীন সাহেবের বাসস্থান। কাতারবদ্ধভাবে এসে সকলেই সুলতানকে সালাম ও খোশ-আমদেদ জানালেন। ঝি-চাকরানীরাও দূর থেকে কুর্নিশ করতে লাগলো সুলতানকে। সেলিনা বানুর তো কথাই নেই। যথাযথ আব্রু করে এসে সে সুলতানের সামনে দাঁড়ালো আর ঝুপ করে বসে পড়ে সুলতানকে কদমবুচি করলো।

সুলতান বাহাদুর খোশকণ্ঠে 'আরে করো কি, করো কি' বলার পরে 'তোমার কল্যাণ হোক, ভবিষ্যৎ জিন্দেগী তোমার আনন্দ-খুশিতে ভরে উঠুক' বলে দোয়া-খায়ের করলেন।

এরপর সুলতান বাহাদুরকে নিয়ে গিয়ে সেদিনের জন্যে বিশেষভাবে সজ্জিত দহলিজে তোলা হলো। কমে গেল ভিড়। পরিবারের কয়েকজন বিশিষ্ট লোক এসে সুলতানের সামনে বসলে, শুরু হলো আলোচনা। সকলের কুশলাদির খবর নেয়ার পর সুলতান বললেন– আমি শুধু দাওয়াত খেতেই আসিনি, সেই সাথে আমার সেলিনা বানু নাতনীর ব্যাপারে কিছু জানতেও এসেছি।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব খোশকণ্ঠে বললেন– কি কথা হুজুর? কি ব্যাপারে জানতে চান?

সুলতান বাহাদুর বললেন– বলবো, বলবো। আপনার কাছেই জানতে চাইবো। নাতনীটার বয়সটা তো ভালই হলো।

বুঝতে পেরে শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন– আপনারা কথা বলুন জাঁহাপনা। আমি ভেতর থেকে একটু আসি।

সুলতান বাহাদুর সমর্থন দিয়ে বললেন– হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো, সেই ভাল! এরপর অন্যদের লক্ষ্য করে বললেন– আপনারাও একটু এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে আসুন। আমি এই মুরব্বীর সাথে একটু খোলামেলা কথা বলি।

শাহাবুদ্দীন সাহেব ও অন্যরা চলে গেলেন। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব অত্যন্ত

আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করলেন– কি কথা হুজুর? কি কথা বলতে চান?

সুলতান বাহাদুর হাসিমুখে বললেন– আমাদের নাতনী সেলিনা বানুর কথা। তার শাদির ব্যবস্থা করছেন না কেন আপনারা? নাতনীটা তো বেশ বড়ই হয়ে গেছে!

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব ইতস্তত করে বললেন– হঠাৎ আজ এ প্রশ্ন করছেন কেন হুজুর? রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী সাহেবের ব্যাপারটা জেনেই কি?

জি হ্যাঁ মুরব্বী, তাঁর কথা জেনেই। বেয়ারা ঐ লোকটাকে আমি পাত্তা দেইনি কিছুই। কিন্তু নাতনীটার তো শাদির ব্যবস্থা করতে হয় একটা, হয় না বলুন?

জি হুজুর, তা অবশ্যই করতে হয়।

সেই কথাই বলছি। তা করছেন না কেন? বয়সটা তো তার বেড়েই চলেছে।

তা ঠিক, তা ঠিক কিন্তু...

কিন্তু কি মুরব্বী? ভাল কোন ছেলে খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই?

না হুজুর, প্রশ্ন সেটা নয়। এ ব্যাপারে সেলিনার তরফ থেকেই যে কোন ব্যস্ততা নেই।

বলেন কি। সোমত্ত মেয়ে, তবু ব্যস্ততা নেই মানে? সে কি কাউকে মন দিয়ে বসে আছে?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব সহাস্যে বললেন– এই ধরে ফেলেছেন হুজুর! মন দেয়া মানে কি! মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে বসে আছে। ঐ ভায়াটা যে দিন চাইবে, সে দিনই সে শাদি করবে। সব ঐ ভায়ার উপরই নির্ভর করছে। এর আগে নয়।

সোবহান আল্লাহ! সোবহান আল্লাহ! বলেন কি মুরব্বী! তাহলে কে সে ভাগ্যবান? এমন একজন সুন্দরী আর বিদূষী রমণীর মন যে পায়, সে ভাগ্যবানটি কে?

আপনারই লোক হুজুর। আপনারই ডেকে আনা লোক।

উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সুলতান বাহাদুর বললেন– অর্থাৎ?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব হাসিমুখে বললেন– সেলিম মালিক হুজুর! সেলিম খলজি।

আনন্দে সুলতান প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন– বলেন কি! সেলিম মালিক!

জি হুজুর, জি!

মারহাবা! মারহাবা! কৈ, কোথায় সেলিম মালিক?

এখানেই তো ছিল। এই! তোমরা কে আছো এখানে? সেলিম মালিককে এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও!

একটু পরে সেলিম মালিক এসে দহলিজে ঢুকলে সুলতান বাহাদুর সরবে বলে উঠলেন– এই যে বীর বাহাদুর! শুধু লড়াইয়ের ময়দানেই কেবল বাহাদুর নও, মুহাব্বতের ময়দানেও দেখছি জব্বোর এক বাহাদুর তুমি। তলে তলে এতো!

নতমস্তকে কুর্নিশ করে সেলিম মালিক বললো– জাঁহাপনা!

জাঁহাপনা বললেন– একদম মগডালে কণ্ঠা লাগিয়েছো হে! বেছে বেছে একদম বসরাই গোলাপ।

সেলিম মালিক ফের সলজ্জকণ্ঠে বললো– জাঁহাপনা!

সুলতান বললেন– কিন্তু আমি ভাবছি, কণ্ঠাটা আগে লাগালো কে? দু'জনই তো তোমরা 'একে জিনে ও, ওকে জিনে এ।' একজন মণি আর একজন কাঞ্চন। একদম মণিকাঞ্চন যোগ। এই অবস্থায় কে কাকে পাকড়াও করলো আগে!

কথা ধরলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব। তিনি সানন্দে বললেন– আমার নাতনীই আগে পাকড়াও করেছে হুজুর। আমার নাতনী সেলিনাই আগে পাকড়াও করেছে।

বলেন কি!

জি হুজুর! এরপরে একে ও আর ওকে এ শক্তভাবে গেঁথে ফেলেছে।

শাব্বাশ!

এই মণির সাথে কাঞ্চনের যোগ ঘটেছে বলেই শাদির ব্যাপারে নাতনী আমার কোন উচ্চবাক্য করছে না। হুজুরের যে কাজে সেলিম মালিক এসেছে সে কাজ নাকি এখনও শেষ হয়নি, তাই শাদিতে দেরি হচ্ছে।

সুলতান কিঞ্চিৎ ভারী কণ্ঠে বললেন– ঠিকই ধরেছেন মুরব্বী। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারটা অনেকটা সামনে আছে এখন। বাংলাদেশ গোটাটাকেই মুসলমানদের শাসনাধীনে আনতে চাই আমি। আর তা আনতে হলে পূর্ববাংলাটা জয় করতে হবে আমাকে। ওদিকে আবার দিল্লীর সুলতান

ইলতুতমিশও আমার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কখন যে তার হামলা এসে এই লাখনৌতির উপর পড়বে, কে জানে!

: হুজুর!

এই ঝুট-ঝামেলাগুলো সামাল দিয়ে নেয়া হলেই সেলিম মালিক শাদি করবে সেলিনা বানুকে। আমি দেবো শাদি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শাদি দেবো এদের। মহা ধুমধামে শাদি দেবো।

এই সময় ফয়েজউদ্দীন বেগ এসে সুলতানকে কুর্নিশ করে বললো– জাঁহাপনা! আমার সেপাইরা বলছে– বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই নিরাপত্তা নিয়ে। আল্লাহর রহমে একটা মাছিও এদিকে ভিড়তে পারবে না। কাজেই, তাড়াহুড়া না করে জাঁহাপনা এখানে যতক্ষণ থাকতে চান, থাকুন। রাত হলেও উদ্বেগের কোন কারণ নেই।

জাঁহাপনা খুশি হয়ে বললেন– শাব্বাশ! তবে খুব বেশিক্ষণ এখানে আমি থাকবো না। মাগরিবের অনেক আগেই ফিরে যাবো। তোমার সাগরিদদের আমার সাবাশী জানাও।

জো হুকুম জাঁহাপনা!

কুর্নিশ করে চলে গেল ফয়েজউদ্দীন বেগ। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– এই আর এক আসামী হুজুর। লড়াইয়ের ময়দানের মতোই মুহাব্বতের ময়দানেও এই বাহাদুর সমানে তুফান ছুটিয়ে চলেছে।

সুলতান বাহাদুর আনন্দ বিস্ময়ে বললেন– বলেন কি, বলেন কি! সেলিম মালিক, তুমি কি এ খবর কিছু রাখো?

নীচু মাথায় সেলিম মালিক সলজ্জকণ্ঠে বললো– জি জাঁহাপনা, রাখি।

রাখো?

জি জাঁহাপনা, সবটুকুই রাখি।

আরে, এরা তো দেখছি এক একজন এক একটা বর্ণচোরা! তা কি খবর রাখো? এ আবার কোন গাছে কণ্ঠা লাগিয়েছে?

উঁচু গাছেই জাঁহাপনা। হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেবের নাতনী ফারজানা বেগমকে ফয়েজউদ্দীন বেগ জব্বোর ভালবাসে। ওরা নাকি এক জায়গারই লোক। ফারজানা বেগমও ঐ একই রকম ভালবাসে এই ফয়েজউদ্দীন বেগকে।

কি বললে? হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেবের নাতনী? সোবহান

আল্লাহ! হাফিজ সাহেবের পরিবারের সবাই খুব ভাল মানুষ। ঈমানদার আদমী। আমি ওঁদের সবাইকে খুব ভালবাসি। প্রীতির চোখে দেখি।

: জাঁহাপনা!

কুচ্ পরোয়া নেহি। তোমাদের দু'জনেরই শাদি-মোবারক একের পর এক আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সম্পন্ন করবো। লড়াইয়ের এই ঝুট-ঝামেলা মিটে গেলে আর একদিনও দেরি করবো না। আগে তোমারটা আর তার পরে পরেই ওদেরটা। হাসতে লাগলেন সুলতান। সুলতানের মনোষ্কামনা পূর্ণ হোক– দুই হাত তুলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই মর্মে মোনাজাত করতে লাগলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব।

দাওয়াত কবুল করে সুলতান বাহাদুর হৃষ্টচিত্তে বিদায় হলে সেলিম মালিক সেলিনা বানুকে ধাওয়া করে বললো– এই- এই, এটা কি হলো?

সেলিনা বানু কপট রোষে বললো– হাতী ঘোড়ার ডিম হলো।

সেলিম মালিক থমকে গিয়ে বললো– তার মানে?

সেলিনা বানু বললো– কিসের কি হলো তা আমি কি জানি?

তুমি জানো না?

কি করে জানবো? বুঝিয়ে না বললে আপনি কি বলছেন তা বুঝবো কি করে?

সুলতান বাহাদুর কি বলে গেলেন তা শুনোনি?

সুলতান বাহাদুর তো অনেক কথাই বললেন। তার কোন কথা?

আরে, বলে কি! তোমার শাদির কথা।

ধ্যাৎ! সে কথা কি উনি আমার সামনে বলেছেন যে আমি শুনবো?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব কাছে এসে বললেন– এই খবরদার! মিথ্যা বলবে না। আড়ালে দাঁড়িয়ে দুই কান খাড়া করে সব শুনলে, তবু বলছো তুমি শুনোনি?

কৈ, কি শুনলাম?

তোমার শাদির কথা। শুভ পরিণয়ের কথা।

কার সাথে?

এই বুরবকটার সাথে।

ইশ্! আমার বয়েই গেছে। কোন বুরবক আহম্মককে শাদি করতে বয়েই

 বইঘর ও রোকন

গেছে আমার।

কি? কি বললে? সেলিম মালিক আহম্মক!

নয়তো কি? গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! তামাম লড়াই শেষ হলে তবেই সুলতান দেবেন শাদি। এর মধ্যে উনি কোন লড়াইয়ে পটল তুলে ভূত হয়ে কোন ভাগারে পড়ে থাকবেন, তার ঠিক আছে?

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব ধমকের সুরে বললেন– সেলিনা বানু, খবরদার!

সেলিনা বানু অভিমানের সুরে বললো– আমাকে ধমকাচ্ছেন কেন দাদু? সুলতান বাহাদুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে উনার শাদি দেবেন, এই আনন্দেই উনি ডগমগ। কিন্তু সেই শাদিটা আদৌ হবে কিনা, হলেও চুল-দাড়ি পেকে সাদা হওয়ার আগে হবে কিনা, সেটা না বুঝেই উনি আনন্দে দুই হাত তুলে নাচতে শুরু করেছেন!

ওরে বাপরে! ছুঁড়ির যে মোটেই তর সইছে না দেখছি! তা শাদির এত আগ্রহ এর আগে তো কোনদিন দেখলাম না। সে কথা আগে জানলে তো মাওলানা ডেকে এনে ইতোমধ্যেই দুই কলেমা বাতিয়ে দিতাম।

দাদু!

না- উম্মিদ হতে নেই রে বিবিজান! আল্লাহ তায়ালার যেদিন ইচ্ছে হবে, সেদিন সঙ্গে সঙ্গে শাদিটা হয়ে যাবে তোমাদের। কোন অপেক্ষাতেই থাকতে হবে না। সুলতানের ইচ্ছা কি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার চেয়ে বড়? বলো, বড় কি?

আমি জানিনে।

জানতে হবে, জানতে হবে। আল্লাহ যদি চান সব লড়াই শেষ হওয়ার আগেই তোমাদের শাদি হবে, তাহলে তাই হবে। এত জানো আর এটা জানো না?

দাদু!

এছাড়া, এই গোটা বাংলাটা মুসলমানদের শাসনাধীনে আসুক– সে ইচ্ছা আমাদেরও তো হওয়া উচিত। শাদির চেয়ে ঐ মহৎ কাজটা সম্পন্ন হওয়াটা তো ঢের ঢের আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত আমাদের।

আমি কি বলছি, তা নয়? এই মহৎ কাজটা এই সুলতানের দ্বারা সম্পন্ন হোক, এটা আমিও চাই।

তাহলে শাদির ব্যাপারে অধৈর্য হলে চলবে কেন?

তা তো ইইনি। সেলিম মালিক সাহেবকে এখন লড়াইয়ের ময়দানেই পড়ে থাকতে হবে সব সময়, তাঁর শাদি নিয়ে চিন্তা করলে চলবে না, এটা কি আমি বুঝি না?

: তবে?

তবে বলে কোন কথা নেই। যে কথাটা আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি, সেই কথাটা পাকা হয়ে গেল আজ। আমার পরম বাঞ্ছনীয় এই বুরবক মানুষটার সাথেই শাদি হবে আমার– এটা চূড়ান্ত হয়ে গেল। এর চেয়ে অধিক আনন্দের বিষয় আর কি আছে আমার কাছে? শাদিটা যখন হয়, হোক।

: তাহলে আর এত কথা বললে কেন?

বললাম এই সেলিম মালিক হুজুরের পাগলামিটা দেখে। তাঁর অতি উৎসাহের রাশটা টেনে ধরার জন্যে। অন্য কোন কারণে নয়।

ওরে চতুর মেয়ে–

জি হাদারাম, সেলাম–

হাসতে হাসতে দৌড় দিলো সেলিনা বানু।

কিন্তু দৌড়টা শেষ হলো না এখানেই। এ নিয়ে চলতেই লাগলো দৌড়াদৌড়ি। সেলিনা বানুর বয়স্ক হুকুমবরদার জাফরুল্লাহ ওরফে জাফর মিয়া দৌড়ে এলো বাসার বয়স্ক কাজের লোকটার কাছে। এসেই জাফর মিয়া কাজের লোকটাকে উদ্দেশ্য করে উৎফুল্লকণ্ঠে বললো– খবর কিছু জানো জাবেদ মিয়া? মানে শুনেছো কি?

বাসার সেই বয়স্ক কাজের লোক জাবেদ মিয়া বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসুকণ্ঠে বললো– খবর!

কণ্ঠে জোর দিয়ে জাফর মিয়া বললো– ফাটাফাটি খবর! শুনেছো কিছু?

জাবেদ মিয়া প্রশ্ন করলো– কি সে ফাটাফাটি খবর!

জাফর মিয়া বললো– সেলিনা বানু আম্মাজানের শাদি।

সেলিনা বানু আম্মাজানের শাদি মানে? খোয়াব দেখছো?

খোয়াব নয়, খোয়াব নয়। কথাবার্তা সব পাকা।

পাকা?

একদম পাকা।

কি রকম পাকা। ঐ যে রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশীর ছেলের সাথে

শাদির কথার মতো পাকা?

জাফর মিয়া বিপুল উৎসাহে বললো– আরে না- না, এ পাকা সে পাকা নয়, এ পাকা আলাদা পাকা।

আলাদা পাকা?

বিলকুল আলাদা পাকা। কোরেশীর ছেলের সাথে শাদিতে সেলিনা বানু আম্মাজানসহ বাড়ির কারো কোন মত তো ছিলই না, সেলিনা বানু আম্মাজানের আব্বারও সত্যিকারের তেমন কোন মত বা সম্মতি ছিলো না। কিন্তু এখন ব্যাপারটা একদম উল্টো।

উল্টো!

একদম। বাড়ির সকলের– মানে আম্মাজানের দাদু, আব্বা আর অন্যান্য সকলের তো পুরোদস্তুর সম্মতি আছেই তার উপর সেলিনা বানু আম্মাজান এ শাদির ব্যাপারে যারপর নেই আগ্রহী। মানে বিলকুল আওয়ারা। এই শাদিই তিনি করতে চান।

: বলো কি! তা কাকে শাদি করার জন্যে তিনি আওয়ারা?

হুঁ-হুঁ, বাবা! যাকে তাকে নয়। একদম আসমানের চাঁদের মতো বরকে।

আরে জ্বালা! সেই চাঁদের মত বরটা কে?

শুনলে চমকে যাবে। সে বর হলেন সেলিম মালিক হুজুর।

সেকি! সেলিম মালিক হুজুর মানে? কি বলছো তুমি!

বললাম না, শুনলে চমকে যাবে? ঐ সেলিম মালিক হুজুরের সাথেই শাদি।

সেলিম মালিক হুজুর তাতে রাজী আছেন?

রাজী মানে কি? সেলিনা বানু আম্মাজানের জন্যে তিনি দিওয়ানা। পান তো এখনই শাদি করেন।

জাবেদ মিয়া বিস্মিতকণ্ঠে বললো– আমি যে বিশ্বাস করতে পারছিনে। এও কি সম্ভব! এমন যোগাযোগ, একেবারে আস্ত মণি-কাঞ্চন যোগ– কি তাজ্জব ব্যাপার! এ যে অবিশ্বাস্য আর অসম্ভব কথাবার্তা।

জাফর মিয়া বললো– কিসের অসম্ভব! সুলতান বাহাদুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যে শাদি দিতে চেয়েছেন, সেটা কি আর অসম্ভব থাকে?

কিন্তু সুলতান বাহাদুর এ ব্যাপারে–

www.boighar.com

আরে কি বলছো জাবেদ মিয়া? মিয়া-বিবি রাজী তো কেয়া করেগা কাজী!

দুইজনই যেখানে মহব্বতের দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছেন, সেখানে সুলতান বাহাদুর কি আর নীরব থাকতে পারেন?

এক পলক দম ধরে থাকার পর জাবেদ মিয়া বললো– তুমি যে আমাকে তাজ্জব করলে জাফর ভাই! এদের দুইজনের অবস্থা এমন, আগে তো কিছুই বুঝতে পারিনি!

জাফর মিয়া বললো– আমিও কি ছাই তা পেরেছি। এঁদের দুইজনের মধ্যে ভাল লাগালাগির একটা ব্যাপার আছে– এ যাবত শুধু এইটুকুই বুঝে এসেছি। কিন্তু ঐ ভাল লাগালাগির ব্যাপারটা যে তলে তলে গভীর মুহব্বতের ব্যাপার হয়ে আছে আর এখন সেটা একদম শাদি পর্যন্ত গড়াচ্ছে, এটা কি কল্পনা করতে পেরেছি!

জাফর ভাই!

তুমিও কি পেরেছো জাবেদ ভাই, বলো?

না, কস্মিনকালেও তা কল্পনা করতে পারিনি। এ ভালই হলো জাফর ভাই। এমন বরের সাথে এমন কনেরই শাদি হওয়া উচিত। আমাদের আম্মাজানই বা এমন বর পাবেন কোথায়, আর সেলিম মালিক হুজুরই বা এমন কনে পাবেন কোথায়? এমন জোড় না হলে কি আর মানিকজোড় হতো, না দেখে চোখ জুড়াতো দশজনের!

ঠিক- ঠিক, একদম চোখ জুড়ানো জুটি।

'কৈ, জাফর মিয়া কোথায়? জাফর মিয়া–'

জাফর মিয়া চমকে উঠে বললো– এইরে, আমার ডাক এসেছে! যাই জাবেদ মিয়া। আল্লাহ হাফেজ...!

পাক ঘরে পাকশাক নিয়ে ব্যস্ত আছে পাক করা ঝি। তার কাছে ছুটে এলো সেলিনা বানুর খাস পরিচারিকা। এসেই সে বললো– কিছু শুনেছো, না কেবলই চুলা ঠেলে মরছো?

মুখ তুলে ঝি বললো– কোন্ কথা?

পরিচারিকা বললো– হুজুর বাহাদুরের কথা। হুজুর যা বলে গেলেন, সেই কথা।

সেটা আমি কি করে শুনবো? আমি তো এই পাকঘরে। আমি কি আর ঐ দহলিজে গিয়েছি?

বটে!

: হুজুর বাহাদুর কি বলে গেলেন গো?

: শাদির কথা। শাদির কথা বলে গেলেন।

: শাদির কথা। কার শাদি?

আমাদের হুজুরাইনের। মানে সেলিনা বানু হুজুরাইনের।

ওমা সেকি? হুজুরাইনের? এই তো সেদিন এই শাদি নিয়ে মার মার কাট কাট কাণ্ড ঘটে গেল এই বাড়িতে। হুজুরাইনের দাদু প্রহরী ডেকে তাড়ালেন ঐ শাদির ঘটকদের। আজ আবার কার সাথে শাদির কথা বলে গেলেন সুলতান বাহাদুর?

সেলিম মালিক হুজুরের সাথে। কোন আলতু ফালতু লোকের সাথে নয়।

হাতের খন্তা ঠক করে কড়াইয়ের উপর রেখে পাকের ঝি বিপুল বিস্ময়ে বললো– সেকি! কি বলছো! সেলিম মালিক হুজুরের সাথে?

একদম সেলিম মালিক হুজুরের সাথে।

: কি তাজ্জব- কি তাজ্জব! সেলিম মালিক হুজুর কি এতে রাজী আছেন?

এক পায়ে খাড়া আছেন। এ শাদি করার জন্যে তিনি এক পায়ে খাড়া আছেন।

তা সুলতান বাহাদুর জানলেন কি করে যে, তিনি এক পায়ে খাড়া হয়ে যাবেন?

সব কথা ফাঁশ হয়ে গেল। দহলিজে আজ সব গোপন কথা ধরা পড়লো। বলা হলো, দুলাহ্ দুলহিন দু'জনই দু'জনকে যারপর নেই ভালবাসে। দু'জন দু'জনকে শাদি করার জন্যে একদম মুখিয়ে আছে।

এটা কি সত্যি?

: সত্যি-সত্যি! সেলিম মালিক হুজুর নিজে যে ধরা দিলেন। দাদু হুজুর আরো ভেঙ্গেচুড়ে শুনালেন। উনি সবই জানতেন যে!

ওমা! আমরা তো কিছুই জানতে পারিনি। তাই তো লোকে বলে, মানুষের বাইরের দিক দেখে ভেতরের খবর করে সাধ্য কার?

তাহলেই বুঝো, ওদের দু'জনকে বাইরে থেকে দেখলাম কি আর ঘটে আছে ভেতরে কি!

তা যাই ঘটুক। এ বড় ভালই হলোরে ভাই! এঁদের দু'জনের শাদি হলে একটা দেখার মতো শাদি হবে। এ জুটি দেখলে দুই চোখ জুড়িয়ে যাবে

সবার। এমন বরের কোনো নাদান কনের সাথে আর এমন কনের কোনো বুরবক বরের সাথে শাদি হলে সেটা কি সহ্য করার মতো শাদি হতো, না সে জুটি দেখা যেতো দুই চোখে।

ঠিক- ঠিক। তোমার কথা বিলকুল ঠিক। এখন এ জুটি দেখলে শুধু আমাদের কেন, এ দুনিয়ার তামাম লোকের জুড়িয়ে যাবে দুই চোখ।

সেলিনা বানুকে এদিকে আসতে দেখেই সেখান থেকে দ্রুত সরে গেল তার খাস পরিচারিকা।

জাফর মিয়াকে ডেকে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– তুমি একটু জলদি হিসাব-রক্ষক হাফিজ সাহেবের কাছে যাও তো! গিয়ে তাঁকে বলো, সাংসারিক খরচের জন্যে আমার কিছু বেশি টাকা তুলতে হবে আগামীকাল। হিসাব-নিকাশ আর লেখালেখি যা করা দরকার, আগেই যেন উনি তা করে রাখেন। আমি গিয়ে কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না। আগামীকাল আমার আরো জরুরী কিছু কাজ আছে।

আদেশ শুনে তখনই হাফিজ আহম্মদ সাহেবের বাসায় চলে এলো সেলিনা বানুর হুকুমবরদার জাফর মিয়া। এসে দেখে হিসাব-রক্ষক সাহেব বাসায় নেই। কি এক কাজে একটু বাইরে গেছেন। তাঁর দহলিজের বারান্দায় বসে আছে ওঁদের কাজের লোক মহব্বত আলী মিয়া।

মহব্বত আলী মিয়া জাফর মিয়াকে দেখেই সানন্দে বলে উঠলো– আরে জাফর মিয়া যে! এসো মিয়া, এসো। বসো আমার পাশে।

জাফর মিয়া বললো– তোমার পাশে বসলে তো আমার চলবে না মহব্বত মিয়া। হিসাব-রক্ষক হুজুরকে আমার দরকার।

মহব্বত মিয়া বললো– ও, তাই নাকি? কিন্তু হিসাব-রক্ষক হুজুর তো বাসায় নেই। বাসায় ফারজানা আপা আছে। তাঁকে ডেকে দেবো?

আরে না- না, তাঁর সাথে আজ আমার দরকার নেই। আজ আমার দরকার হিসাব-রক্ষক হুজুরের সাথে।

: খুবই জরুরী দরকার?

খুবই- খুবই!

তাহলে আমার পাশে বসে পড়ো জাফর মিয়া। হুজুর বাইরে গেছেন, একটু পরেই ফিরে আসবেন। যতক্ষণ উনি ফিরে না আসেন, ততক্ষণ আমার পাশে বসে থাকো। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে?

বসবো?

হ্যাঁ বসো, আর গল্পগুজব করো। দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।

পাশে বসতে বসতে জাফর মিয়া বললো– কি গল্প আর করবো!

তোমাদের বাসার কথা বলো। সেখানে সবাই ভাল আছে তো?

জাফর মিয়া উৎসাহিত হয়ে উঠে বললো– আছেন- আছেন। জব্বোর ভাল আছেন। সবাই বেজায় খুশি আছেন।

খুশি আছেন! কেন- কেন, বেজায় খুশির কি ঘটলো?

সেলিনা আম্মাজানের শাদি যে!

এ্যাঁ, কি বললে? ঐ হুজুরাইনের শাদি? কার সাথে শাদি?

সেলিম মালিক হুজুরের সাথে।

: বাহবা- বাহবা! মস্তবড় খবর তো! কবে সে শাদি?

: সুলতান বাহাদুর যেদিন দেবেন, সেই দিন।

সেকি! সুলতান বাহাদুর শাদি দেবেন?

: হ্যাঁ, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শাদি দেবেন।

মারহাবা- মারহাবা! জব্বোর খবর! মস্তবড় খবর!

শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলো ফারজানা বেগম। বললো– কি জব্বোর খবর মহব্বত আলী?

মহব্বত মিয়া বললো– সেলিনা হুজুরাইনের নাকি শাদি!

এ্যাঁ, সেলিনা বানুর শাদি! কি বলছো?

: জি আপা! সুলতান বাহাদুর নাকি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেবেন সে শাদি!

ফারজানা বেগম আওয়ারা বনে গেল। চিৎকার করে বললো– কে বললে- কে বললে?

মহব্বত মিয়া বললো– এই জাফর মিয়া।

এবার জাফর মিয়ার উপর ঝুঁকে পড়লো ফারজানা বেগম। বললো– কি খবর জাফর মিয়া? সেলিনা বানুর শাদি?

জাফর মিয়া বললো– জি হুজুরাইন!

ফারজানা বেগম বললো– কি তাজ্জব! সত্যি বলছো?

জি হুজুরাইন।

পাত্র কে? বর?

সেলিম মালিক হুজুর।

ওম্মা। কি তাজ্জব ব্যাপার! সেলিম মালিক সাহেবের সাথে শাদি? তা হঠাৎ এই শাদির ঘটনা ঘটলো মানে?

; তাঁরা দু'জনই খুব আগ্রহী হলেন, তাই।

তাঁরা যে একে অন্যকে শাদি করতে আগ্রহী, তা আমি ওঁদের ভাবসাবেই বুঝে নিয়েছিলাম। কিন্তু সে ব্যাপারটা এত শিগগির এমন পাকাপাকি হবে...

সুলতান বাহাদুর পাকাপাকি করে দিলেন বলেই তাড়াতাড়ি পাকাপাকি হয়ে গেল।

সুলতান বাহাদুর পাকাপাকি করে দিলেন কিভাবে?

জাফর মিয়া ব্যাখ্যা করে বললো– সুলতান বাহাদুর আমাদের বাসায় দাওয়াত খেতে এসে ওঁদের দু'জনের মনের কথা জেনে নিলেন আর তাই খুশি হয়ে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওঁদের শাদি দিতে চাইলেন।

উদ্বেলিতকণ্ঠে ফারজানা বেগম বললো– কি তাজ্জব! কি তাজ্জব! সুলতান বাহাদুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওঁদের শাদি দিতে চেয়েছেন। ওহ্! ওরা কি ভাগ্যবান!

: হুজুরাইন!

ওরা খুব খুশি এখন, তাই না?

: জি?

ওদের খুব খুশি দেখেছো এখন?

: জি হুজুরাইন, তাই দেখেছি।

আমিও যাবো, যত শিগগির পারি আজকালের মধ্যেই ওদের খুশি-আনন্দ দেখতে আমিও যাবো।

যাবেন হুজুরাইন?

হ্যাঁ- হ্যাঁ, অবশ্যই যাবো। ওদের শাদির খবর পাওয়ার পরও আমি কি ওদের সাথে দেখা না করে পারি?

এরপর ফারজানা বেগম আপন মনে বললো– একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। স্বয়ং সুলতান বাহাদুর দাঁড়িয়ে থেকে ওদের শাদি দেবেন– এ কি কম ভাগ্যের কথা! আমার তো আর ওদের মতো উমদা নসীব নয় যে, আমার শাদি সুলতান বাহাদুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেবেন।

এই সময় ফিরে এলেন হাফিজ আহম্মদ সাহেব এবং জাফর মিয়াকে দেখে

তার আগমনের কারণ জানতে চাইলে জাফর মিয়া ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেবের কথাগুলো তাঁকে জানালো। শুনে হাফিজ আহম্মদ সাহেব বললেন– ঠিক আছে, আমি সব ঠিকঠাক করে রাখবো। আগামীকাল উনি এলেই প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়ে যাবেন। তুমি যাও। গিয়ে তাঁকে এ কথা বলো।

হাফিজ আহম্মদ সাহেব তার দপ্তরে এসে ঢুকলেন আর খুশি হয়ে চলে এলো জাফরুল্লাহ ওরফে জাফর মিয়া।

পরের দিনই ফারজানা বেগম চলে এলো সেলিনা বানুদের বাসায়। বাসায় ঢুকে শোরগোল করে বলতে লাগলো– কৈ, ভাগ্যবতী ললনাটি কৈ? শানদার নসীবওয়ালী সখীটি আমার কোথায়?

শুনতে পেয়ে এগিয়ে এলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব। ফারজানাকে দেখেই তিনি প্রফুল্লকণ্ঠে বলে উঠলেন– আরে ফারজানা বেগম যে! এসো নাতনী এসো! এসো, ভেতরে এসো!

ফারজানা বেগম বললো– আসবোই তো দাদু। আসার জন্যেই তো এসেছি।

তার কথায় কান না দিয়ে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব হাঁক দিলেন– কৈ রে সেলিনা বানু, শিগগির এসো। কে এসেছে দ্যাখো।

সেলিনা বানুও এসে ফারজানাকে দেখেই খোশকণ্ঠে বলে উঠলো– আরে ফারজানা যে! এসো সখী এসো। সামনের এই আসনে এসে বসো।

ফারজানা বেগম বললো– বসবোই তো! বসে বসে শানদার নসীবটা দেখবো বলেই তো এসেছি।

ফারজানা গিয়ে আসনে বসলো। সেলিনা বানু এগিয়ে এসে বললো– কি বললে? শানদার নসীব না কি?

শুধু শানদার নসীবই নয়, মার কাটারী ভালবাসাটাও দেখবো– সেই জন্যে এসেছি।

: বটে!

(কিছুটা সুর করে) ‘লোকে বলে ভালবাসা ভালবাসা, সখী ভালবাসা কারে কয়...!’

মানে?

কেউ কেউ এই বলে আফসোস করে। আমি বলি, আফসোস করার কি আছে? ভালবাসা কারে কয় তা যদি জানতে চাও, তাহলে এখানে এসে দেখে যাও– ভালবাসা কারে কয়।

সেকি! কি বলছো?

তোমার কপালটা একটু এগিয়ে দাও তো সখী, সৌভাগ্যের ভারে তোমার ফাট্ ফাট্ কপালের সাথে আমার কপালটা একটু ঘঁষে নিই। তাতে যদি সৌভাগ্যের কিছু ছোঁয়া আমার কপালেও লাগে! দাও- দাও, তোমার শানদার কপালটা একটু এগিয়ে দাও!

উঠে এলো ফারজানা বেগম। সেলিনা বানু বিব্রতকণ্ঠে বললো– আহ! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ফারজানা?

ফারজানা বেগম স্বচ্ছকণ্ঠে বললো– পাগল হবো কেন? যা সত্যি তাই বলছি।

সত্যি?

দিবালোকের মতো সত্যি। আমি সব শুনেছি।

কি শুনেছো?

হঠাৎই পাকা হয়ে গেছে তোমার শাদি– এটা সত্যি নয়?

: হ্যাঁ, সত্যি।

সেলিম মালিক সাহেবের সাথে শাদি হচ্ছে তোমার, এটা ঠিক নয়?

হ্যাঁ ঠিক।

খোদ সুলতান বাহাদুর দাঁড়িয়ে থেকে তোমার শাদি দেবেন– এটা কি মিথ্যা?

: না, মিথ্যা নয়।

তবে? বাপরে বাপ! সেলিম মালিককে পাওয়ার জন্যে সে কি তোমার দাফাদাফি! হারাই হারাই চিন্তায় সব সময় অস্থির ছিলে তুমি। তোমার নসীবটা কি তাগড়া দেখো! নসীবের জোরে সেই সেলিম মালিক সাহেবকেই পেয়ে যাচ্ছো তুমি।

তোমার হিংসে হচ্ছে?

হওয়াই তো স্বাভাবিক। এক যাত্রায় দুই ফল হলে, হিংসে কার না হয়?

: অর্থাৎ?

আমিও তো তোমার মতোই ভালবাসি আমার ফয়েজউদ্দীন বেগকে। কিন্তু আমার নসীবটা কি ফয়েজউদ্দীন বেগকে পাইয়ে দেয়ার কোন আলামত দেখাচ্ছে, না সুলতান বাহাদুরকে এনে সেই শাদি পড়িয়ে দেয়ার এতটুকু ইংগিত দিচ্ছে? কপাল লাগে সখী, উমদা নসীব লাগে সে জন্যে!

ফারজানার কণ্ঠ থেকে আফসোস ঝরে পড়লো। তা দেখে ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব অভিযোগের সুরে বললেন– আরে- আরে, এ নাদান মেয়েটা তো কিছুই জানে না দেখছি!

–বলেই ফারজানার কাছে এসে তিনি বললেন– আরে এই বোকা মেয়ে! এত খবর শুনেছো আর আসল খবরটাই শুনোনি?

ফারজানা বেগম মুখ তুলে বললো– আসল খবর!

হ্যাঁ, তোমারও তো শাদি হচ্ছে। সেলিনা বানুর শাদির পরে পরেই তোমার শাদি।

মানে? কার সাথে?

ফয়েজউদ্দীন বেগের সাথে।

বটে।

সুলতান বাহাদুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শাদি দেবেন তোমারও।

ফারজানা বেগম অবিশ্বাসের সুরে বললো– আপনি মশকরা করছেন আমার সাথে?

এটা কি মশকরা করার ব্যাপার, না আমি মিথ্যা বলছি তোমাকে?

: দাদু!

ফারজানা বেগম উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। সেলিনা বানু বললো– জি, দাদু ঠিক কথাই বলছেন। সুলতান বাহাদুর নিজে সে কথা বলেছেন। আমার তোমার দু'জনেরই লাগালাগি শাদি দেবেন তিনি। আমার বর সেলিম মালিক তোমার বর ফয়েজউদ্দীন বেগ।

সে কি! এ আমি কি শুনছি সখী! আমার নসীবটাও কি তাহলে সত্যিই শানদার!

সত্যিই-সত্যিই!

সখী!

সেলিনা বানু ব্যঙ্গ করে বললো– 'সখী ভালবাসা কারে কয়!' এসো, ভেতরে এসো। সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি আর সব ঘটনা খুলে বলছি।

ফারজানাকে টেনে নিয়ে নিজ কক্ষে প্রবেশ করলো সেলিনা বানু বেগম।

৮

দিল্লীর সুলতানেরা বাংলাদেশকে সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখতেন। বাংলাদেশ দিল্লীর সুলতানদের দ্বারা বিজিতও হয়নি। বখতিয়ার খলজি সাহেব দিল্লীর সুলতানদের মদদপুষ্টও ছিলেন না। লাখনৌতির খলজি আমীরেরা মনে করতেন, লাখনৌতি তাদেরই অধিকৃত এলাকা এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব তাঁদেরই। কিন্তু তাঁদের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সুলতান কুতুবুউদ্দীন আইবেক লাখনৌতি জয় করার সুযোগ পান এবং কুতুবউদ্দীনের উত্তরাধিকারী হিসাবে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশও লাখনৌতিকে স্বীয় রাজ্যের অংশরূপে মনে করতেন।

তাই সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজির স্বাধীনতাকে ইলতুতমিশ সুনজরে দেখেননি। কিন্তু তবুও তাঁর রাজত্বের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি নিজে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় লাখনৌতির দিকে মনোযোগ দিতে সক্ষম ছিলেন না। ইলতুতমিশ প্রথমে নিজ দেশে তাঁর বিরোধী আমীরদেরকে শায়েস্তা করেন এবং পরে প্রতিদ্বন্দ্বী গজনীর সুলতান তাজউদ্দীন ইয়ালদাজ এবং সিন্ধুর শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীন কুবাচাকে পরাজিত করেন। ১২১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে তাজউদ্দীন ইয়ালদাজ পরাজিত হন এবং ১২১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে নাসিরউদ্দীন কুবাচা পরাজিত হয়ে সন্ধি করেন।

কিন্তু তবুও সুলতান ইলতুতমিশ লাখনৌতির দিকে মনোযোগ দিতে পারেননি। কারণ, ইতোমধ্যে নিতান্তই আকস্মিকভাবে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান জালালউদ্দীন খওয়ারিজম শাহের পশ্চাদ্ধাবন করে পাঞ্জাবে আগমন করেন। জালালউদ্দীন খওয়ারিজম শাহ প্রথমে দিল্লীর ও পরে মুলতান জয় করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাই ১২২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত উপমহাদেশের সীমা অতিক্রম করে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং চেঙ্গিস খানও দিল্লী সাম্রাজ্য ত্যাগ করেন।

এবার সুলতান ইলতুতমিশ লাখনৌতির দিকে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু তাঁকে প্রকৃতপক্ষে বদায়ূন, বারানসী, কনৌজ, অযোধ্যা ইত্যাদি প্রদেশসমূহ জয় করতে হলো। প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ আনুমানিক ১২২৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইলতুতমিশ লাখনৌতির সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজির বিরুদ্ধে প্রথমে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন এবং পরে বিপুল সৈন্যবাহিনীসহ নিজে বিহার ও বাংলাদেশ জয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

গোয়েন্দা মারফত সংবাদ এলো সুলতান ইওজ খলজি বাহাদুরের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে তিনি সকল উজির ও কয়েকজন সেনাপতিকে তলব দিলেন। তলব পেয়েই রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী সাহেবও পরামর্শে বসলেন। তিনি তাঁর প্রবীণ কর্মচারী মাসুদ গজনবীকে ডেকে বললেন– গজনবী! তোমাকে দেশের মুনিব বদল করার কথা বলেছিলাম, মনে আছে? সেই মুনিব বদল করার সুযোগ এসে গেছে।

উৎসাহিত হয়ে উঠে মাসুদ গজনবী বললো– সে কি হুজুর! কি রকম- কি রকম?

আজমতুল্লাহ কোরেশী বললেন– দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ বাহাদুর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে লাখনৌতি রাজ্য জয় করতে আসছেন।

এ্যাঁ! তাই নাকি হুজুর? এ খবর সত্যি?

সত্যি- সত্যি! ষোলআনাই সাত্যি। খবর পেয়ে অতীতের গাধাওয়ালা আর বর্তমানের লাখনৌতির এই সুলতান ইওজ খলজি তটস্থ হয়ে উঠেছেন। পরামর্শ করার জন্যে তিনি আমাদের জরুরী তলব দিয়েছেন।

মাসুদ গজনবী জোশের সাথে বললো– দিল্লীর সুলতান নিশ্চয়ই আমাদের এই সুলতানকে কবর দিতে পারবেন, তাই নয় হুজুর?

তাকি বলা যায়?

: যায় না?

: না! এই গাধাওয়ালাটাও যে খুবই শক্তিশালী।

সে কি হুজুর!

লাখনৌতির এই সুলতানের সামরিক শক্তি যে ভয়ংকর। তাঁর সৈন্যেরা যেমন শক্ত, তাঁর সেনাপতিরাও তেমনি দবেজ। এর উপর আবার আছে ঐ দুই বিচ্ছু– সেলিম মালিক আর ফয়েজউদ্দীন বেগ। সংখ্যায় কম হলেও

ওদের সৈন্যরা অত্যন্ত চৌকস আর ভয়ানক দুর্ধর্ষ। কাজেই ফলাফল কিছুই বলা যায় না।

www.boighar.com

মাসুদ গজনবী হতাশকণ্ঠে বললো– তার মানে? দিল্লীর সুলতান তাহলে লাখনৌতি অধিকার করতে পারবেন না?

: না পারলেও পারাতে হবে। তাঁকে পারাতে হবে গজনবী!

: কিভাবে হুজুর?

আমাদের দিল্লী সুলতানের পক্ষ নিতে হবে। লাখনৌতির শক্তির বিপুল এক অংশকে দিল্লীর সুলতানের কাজে লাগাতে হবে। আমার আর তোমার কাজ এখন অনেক।

: যেমন?

আমি গোপনে বিশেষ দূত পাঠিয়ে দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশের আনুগত্য গ্রহণ করবো আর তাঁর পক্ষ অবলম্বন করার নিশ্চিত ওয়াদা জানাবো। সেই সাথে তাঁকে জানিয়ে দেবো, লাখনৌতির শক্তির বিপুল এক অংশকে তিনি ময়দানে তাঁর পাশে পাবেন। সরাসরি তলোয়ার হাতে না হলেও, সে শক্তি পক্ষান্তরে তাঁরই হয়ে কাজ করবে।

: হুজুর!

তোমার কাজ হবে সেনাপতি আর সেনানায়কদের হাত করা। পদ আর প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়ে যাদেরই একটু দো-মনা মনে করবে, তাদেরই হাত করে ফেলবে। আগাম অর্থ ঢালবে কাঁড়ি কাঁড়ি।

: অর্থ?

হ্যাঁ, অর্থ। আগাম প্রচুর অর্থ পেলে অনেকেই পটে যাবে অল্প চেষ্টাতেই। এর সাথে দেখাবে পদবীর হাতছানি। দিল্লীর সুলতান তো আর এই লাখনৌতি শাসন করার জন্যে লাখনৌতিতে বসে থাকবেন না। এই সময় যারাই তাঁর পক্ষে থাকবে, তাদের হাতেই এই লাখনৌতির শাসনভার দিয়ে যাবেন। সুতরাং সেনাপতিরা হবেন বেতনভুক্ত কর্মচারী থেকে মালিক। এই দেশের মালিক। সবাই তাঁরা বুদ্ধিমান। এটা বোঝাতেও বেগ পেতে হবে না তোমাকে।

: হুজুর!

এসো! আগাম টাকা ঢালবে প্রচুর। প্রচুর, প্রচুর টাকা। টাকার মুখ মরা

মানুষেও চাটে ।

: তা ঠিক, তা ঠিক । কিন্তু এত টাকা-

চিন্তা করছো কেন? আমি তো রাজস্ব উজির । রাজস্বের ভাণ্ডার উজাড় করে তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে, এসো-

জি, হুজুর জি! তাহলে অনেক সেনাপতিদেরই হাতে আনতে পারবো ।

পারবে- পারবে । যাও, কাজে লেগে যাও । সুলতানের ডাকা পরামর্শের বৈঠকেও আমি আর এক খেলা খেলবো ।

বিশেষ দূত মারফত সুলতান ইলতুতমিশের কাছে নিজের আনুগত্যের বার্তা পৌঁছে দিয়ে রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী যোগ দিলেন সুলতান ইওজ খলজি বাহাদুরের পরামর্শ-বৈঠকে । যোগ দিয়ে তিনি সত্যিই আর এক খেলা শুরু করলেন । দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশ লাখনৌতি দখল করতে বিপুল সৈন্যসহ মারমার রবে ছুটে আসছেন- সুলতান ইওজ খলজি সাহেব এ খবর সবাইকে অবহিত করার পর ইলতুতমিশের এই আক্রমণ প্রতিহত করার কলাকৌশল সম্পর্কে সকলের পরামর্শ চাইতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী । তিনি জার-জারকণ্ঠে বললেন- এ হতে পারে না । কখ্খনো হতে পারে না! কিছুতেই হতে পারে না-

হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন আজমতুল্লাহ কোরেশী । তা দেখে হকচকিয়ে গেলেন বৈঠকে উপস্থিত সকলেই । সুলতান বাহাদুর প্রশ্ন করলেন- কি হতে পারে না কোরেশী সাহেব?

কোরেশী সাহেব বললেন- দিল্লীর সুলতান কোন্ বাহাদুর যে, সে এই দেশ দখল করতে আসছে? এটা কি তার বাপের সম্পত্তি, না এ সম্পত্তির তারা কোন অংশীদার?

সুলতান বিস্মিতকণ্ঠে বললেন- এ আপনি কি বলছেন কোরেশী সাহেব?

বলছি, এ দেশ কি তাদের জয় করা দেশ? না এ দেশ জয় করতে কোন সাহায্য নেয়া হয়েছে তাদের? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এ দেশ জয় করেছি আমরা, অর্থাৎ, আমাদের বখতিয়ার খলজি সাহেব । তোমরা কোন হুলুবুলু যে এ দেশের দিকে হাত বাড়াও?

সুলতান বললেন- তাই বাড়ায় কোরেশী । শক্তি থাকলে তাই সবাই বাড়ায় । এইটাই এ দুনিয়ার নিয়ম ।

কোরেশী আরো জোরকণ্ঠে বললেন– কিসের নিয়ম আর কিসের শক্তি? আমাদের, মানে এই লাখনৌতির শক্তি কি তাদের চেয়ে এতটুকু কম যে, আমরা তা নীরবে দেখবো?

কোরেশী!

আমরা, এই লাখনৌতির উজির-নাজির সেনাসৈন্য সবাই যদি ভাই ভাই হয়ে একজোটে রুখে দাঁড়াই, তাহলে দিল্লী তো দিল্লী, দিল্লীর বাপও ফুৎকারে উড়ে যাবে!

: তা কি যাবে কোরেশী?

অবশ্যই যাবে। আমরা ভাই ভাই সবাই কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে রুখে দাঁড়াবো আর দিল্লীর সুলতানকে দিল্লীর ওপারে ফিঁকে দেবো।

: আপনি তাই বলছেন কোরেশী?

বলছি কি জাঁহাপনা! আপনি শুধু দেখুন, আমরা কি করি! আমাদের মধ্যে কিছুটা অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকার ফলে সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক একবার এ দেশটা জয় করেছেন বলে প্রতি ডুবে শুঁন্দি শালুক? বার বার তাদের সে সুযোগ দেবো?

কিন্তু সে অন্তর্দ্বন্দ্ব তো আজও কিছুটা আছে কোরেশী সাহেব। ঠিক দ্বন্দ্ব না হলেও, কারো কারো উপর আপনি তো কিছুটা নাখোশ আছেনই।

কোরেশী সাহেব প্রতিবাদ করে বললেন– কি যে বলেন জাঁহাপনা! সবাই আমরা এক পরিবারের মানুষ। ভাইয়ে ভাইয়ে কিছুটা মন কষাকষি সব পরিবারেই থাকে। কিন্তু বাইরের দুশমন এসে চড়াও হলে ভাইয়ে ভাইয়ে সে মন কষাকষি কি আর থাকে?

কোরেশী সাহেব!

বাড়িতে আগুন লাগলে সব ভাই-ই ছুটোছুটি করে পানি ঢালে ঘরে। বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে তাদের কি আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে? এই লাখনৌতিই আমাদের সকলের বাড়ি আর আমরা সবাই এক পরিবারের লোক। দুশমন এসে বাড়িটা দখল করে নিলে আমরা সবাই অর্থাৎ এই এক পরিবারের লোকগুলো গিয়ে দাঁড়াবো কোথায়?

অনেকেই এবার এক সাথে বলে উঠলেন– সাধু, সাধু!

সুলতান বাহাদুর বললেন– আমার সেনাপতি– সৈন্যাধ্যক্ষরা কি বলেন?

 বইঘর ও রোকন

সেনাপতিরা বললেন– জি জাঁহাপনা! উনি ঠিক কথাই বলেছেন। সবাই আমরা এক জোটে তলোয়ার খুললে, আমাদের হতাশ হওয়ার খুব একটা কারণ নেই। জয়লাভ আমাদের হতেই পারে।

কোরেশী সাহেব আবার বললেন– এখানে আমার একটা কথা বলার আছে জাঁহাপনা। জাঁহাপনার সেনাপতিরা সবাই জাঁহাপনার অনুকরণে এক একজন এক একটা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। মনখুলে ময়দানে নামলে এঁরা অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয়, এঁদের আটকায় কে? কিন্তু এঁরা মুখ ফুটে না বললেও আমি জানি, একটা ব্যাপারে এঁদের মন খানিকটা ভারী আছে জাঁহাপনা!

: অর্থাৎ?

যতবড় যোদ্ধাই হোক, এইসব চৌকস আর অভিজ্ঞ সেনাপতিদের বাদ দিয়ে, ছোট্ট একটা বাহিনীর অধিপতি ঐ ছেলে মানুষ সেলিম মালিক আর ফয়েজউদ্দীন বেগকে লড়াইয়ের প্রধান সেনাপতি বানালে অর্থাৎ তাদের নির্দেশ অনুযায়ী এইসব প্রবীণ আর অভিজ্ঞ সেনাপতিদের চলতে হলে, মনখুলে লড়াই করার উৎসাহ এঁরা পাবেন কি করে জাঁহাপনা?

অর্থাৎ? আপনি কি বলতে চান?

বলতে চাই, এবারের লড়াইয়ের দায়িত্ব আমাদের প্রবীণ আর অভিজ্ঞ সেনাপতিদের উপর ন্যস্ত করা হোক জাঁহাপনা। এবারের লড়াই ত্রিহূত আর কামরূপের মতো ছোটখাটো শক্তির সাথে নয়, এবারের লড়াই বিশাল দিল্লী সাম্রাজ্যের সুলতান ইলতুতমিশ আর তার অফুরন্ত সেনাসৈন্যের সাথে। কাজেই, সেলিম মালিক আর ফয়েজউদ্দীন বেগকে এবার বিশ্রাম দেয়া হোক জাঁহাপনা।

আজমতুল্লাহ কোরেশীর সমমনা জনৈক উজির বললেন– বিশ্রাম কি বলছেন কোরেশী সাহেব? রাজধানী রক্ষা করতে হবে না?

কোরেশী খোশকণ্ঠে বললেন– ঠিক-ঠিক। সেটাও একটা কথা বটে!

সুলতান বাহাদুর সমর্থন দিয়ে বললেন– আপনারা ঠিকই বলেছেন। এমন ভাবনা আমি আগেই ভেবে রেখেছি। রাজধানীর নিরাপত্তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেনাসৈন্য সকলেই লড়াইয়ের ময়দানে আটকে থাকলে, রাজধানীটা একদম অরক্ষিত হয়ে যাবে। রাজধানী একদম অরক্ষিত না রেখে রাজধানী সামলানোর দায়িত্ব আমি এবার ওদের দু'জনের উপরই দিয়ে যাবো।

কোরেশী সাহেব সোল্লাসে বলে উঠলেন– মারহাবা- মারহাবা! একেই বলে

 বইঘর ও রোকন

অভিজ্ঞতা। জাঁহাপনার এ অভিজ্ঞতার তুলনা নেই।

সেইটেই সাব্যস্ত হলো। সেলিম মলিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগের চরম আপত্তি সত্ত্বেও তাদের রাজধানীর দায়িত্বে রেখে প্রবীণ সেনাপতিদের উপর লড়াইয়ের দায়িত্ব দেয়া হলো। তাঁদের সাথে রণতরী নিয়ে সুলতান বাহাদুর দ্রুত লড়াইয়ে যাত্রা করলেন।

রণতরীসহ উজিরদের, সেনাপতিদের ও প্রচুর সৈন্য নিয়ে সুলতান ইওজ খলজি সাহেব ইলতুতমিশ ও তাঁর সেনাসৈন্যদের গঙ্গার তীরে রাজমহলে ঢালু গিরিপথ তেলিয়াগড়ে বাধা দিলেন। ঢালু গিরিপথ পার হয়ে বাহিনীসহ সুলতান ইলতুতমিশকে সমতল ভূমিতে আসার সুযোগ দিলেন না। তেলিয়াগড় গিরিপথেই শুরু হলো যুদ্ধ।

কিছুক্ষণ সুলতান ইওজ খলজির পক্ষ ভালই লড়াই করে সুলতান ইলতুতমিশের বাহিনীকে কোণঠাসা করে রাখে। এর পরই শুরু হলো বেঈমানী। সুলতানের প্রধান প্রধান সেনাপতিরা পক্ষান্তরে পক্ষ নিলেন ইলতুতমিশের। তলোয়ার হাতে তারা সরাসরি সুলতানের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালেও লড়াইয়ের নামে তারা শুধুই তলোয়ার ঘুরাতে লাগলেন। দিল্লীর একটা সৈন্য বা সেনাপতিকে আঘাত করা তো দূরের কথা, তারা কোন বাধাই দিলেন না। সুলতান যেভাবে সৈন্য সমাবেশ করেছিলো তাতে বাংলার-ব্যূহের প্রথম কাতারে ছিলেন নিজ নিজ সৈন্যসহ ঐ বেঈমান প্রধান সেনাপতিরা। তারা কোন বাধা না দেয়ায় দিল্লীর সেনাসৈন্য বন্যার বেগে আসতে লাগলো লাখনৌতির বূহ্যের সামনে এবং প্রথম কাতার ডিঙ্গিয়ে এসে তারা সবিক্রমে চড়াও হলো ব্যূহের দ্বিতীয় কাতারের উপর। দ্বিতীয় কাতারে ছিলেন লাখনৌতির কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ও তাঁদের বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনী। তাঁরাও বিপুল বিক্রমে লড়ে দিল্লীর বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। ব্যূহের প্রথম কাতারে সসৈন্যে দণ্ডায়মান সুলতানের বেঈমান প্রধান প্রধান সেনাপতিরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে তলোয়ার ঘুরাতে লাগলেন। দ্বিতীয় কাতারের সাহায্যে এক কদমও এগিয়ে এলেন না।

এতে করে পরিস্থিতি ক্রমেই নাজুক হয়ে উঠতে লাগলো। লাখনৌতির সিংহভাগ সেনাই ছিল এই বেঈমান সেনাপতিদের হাতে। এই শক্তি কোন কাজে না আসায়, ঐ বিশ্বস্ত সেনাপতিরা সীমিত সংখ্যক সৈন্য নিয়ে দিল্লীর বিশাল বাহিনীকে বেশীক্ষণ বাধা দিতে পারলেন না। অধিক সৈন্যের চাপে লাখনৌতির সৈন্যরা ক্রমেই পিছু হটতে লাগলো। পিছু হটার গতি ক্রমেই

বৃদ্ধি পেতে লাগলো দেখে সুলতান বাহাদুর শংকিত হয়ে উঠলেন। সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব দ্রুত সুলতানের ছাউনিতে এসে বললেন– সন্ধির প্রস্তাব পাঠান জাঁহাপনা, দিল্লীর সুলতানের কাছে শিগগির সন্ধির প্রস্তাব পাঠান।

হতবুদ্ধি হয়ে সুলতান বললেন– সন্ধির প্রস্তাব পাঠাবো?

জি জাঁহাপনা! জলদি জলদি সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। নইলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী!

সে কি! কেন শাহাবুদ্দীন সাহেব?

বুঝতে পারছেন না জাঁহাপনা? গাদ্দারী শুরু হয়ে গেছে। আপনার তথাকথিক অভিজ্ঞ ও প্রবীণ সেনাপতিরা সবাই বেঈমানী করেছে। সিংহভাগ সৈন্যই তাদের হাতে। অথচ ঐ সিংহভাগ সৈন্য নিয়ে তারা আমাদের পক্ষে লড়াই করছেন না তারা, পক্ষান্তরে কাজ করছেন দিল্লীর সুলতানের পক্ষে।

সে কি- সে কি! এর কারণ কি শাহাবুদ্দীন সাহেব?

কারণ, প্রতারক রাজস্ব উজির ঐ কোরেশীর কারসাজি। তিনি অর্থ ও কুমন্ত্রণা দিয়ে তলে তলে হাত করেছেন ঐ বেঈমান সেনাপতিদের আর চাতুরি করে আপনাকে বুঝিয়েছেন, সেলিম মালিক আর ফয়েজ উদ্দীন বেগকে এ যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রাখতে।

শাহাবুদ্দীন সাহেব!

আর দুষ্টের চাতুরি বুঝতে না পেরে রাজধানীর নিরাপত্তার জন্যে ঐ চৌকস দুই যোদ্ধাকে আপনি এই যুদ্ধে শরিক হতে দিলেন না।

সুলতান থতমত করে বললেন– তা- মানে! রাজধানীর নিরাপত্তাটাও যে না দেখে পারলাম না শাহাবুদ্দীন সাহেব!

সেজন্যে তাদের কি প্রয়োজন ছিল জাঁহাপনা? আমি আমার পছন্দ মতো জনা দুয়েক সৈন্যাধ্যক্ষ আর একদল সৈন্য নিয়ে রাজধানীতে থাকলেই রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিতভাবে বিধান হতো। একমাত্র এই দিল্লী ছাড়া বাইরে আর তেমন কোন শক্তি নেই যারা রাজধানীর নিরাপত্তা বিপন্ন করবে। জাঁহাপনাও তা জানেন।

তা বটে- তা বটে।

অথচ সেলিম মালিক আর ফয়েজউদ্দীন বেগ তাদের দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে

 বইঘর ও রোকন

এখানে উপস্থিত থাকলে, বেঈমান প্রধান সেনাপতিরা যতই বেঈমানী করুক এই বিশ্বস্ত কয়েকজন সেনাপতি নিয়েই ওরা দিল্লীর সুলতানকে এমন শিক্ষা দিতে পারতো, যাতে করে দিল্লীর সুলতান দাঁতে কুটা কেটে দিল্লীতে পালাতেন, জীবনেও আর তিনি লাখনৌতির দিকে হাত বাড়ানোর সাহস করতেন না।

: তা ঠিক- তা ঠিক।

কিন্তু এখন সন্ধি করা ছাড়া আর উপায় নেই জাঁহাপনা। অন্যথায় যুদ্ধে তো পরাজয় হবেই, লাখনৌতিও আমাদের হারাতে হতে পারে।

অবশ্যই- অবশ্যই! এখনই আমি দূত পাঠাচ্ছি দিল্লীর শিবিরে।

সুলতান সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালেন তখনই। চতুর রাজস্ব উজির কোরেশীর নজর ছিল সকল দিকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে ছুটে গেলেন দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশের কাছে। ইতোমধ্যে দূত মারফত সন্ধির প্রস্তাব পেয়ে লাখনৌতির সুলতানকে অধীনস্থ করার মওকা পেয়ে গেলেন দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশ। তাঁকে অধীনতা স্বীকার করানোর জন্যে উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে এ সন্ধিতে রাজী হয়ে গেলেন দিল্লীর সুলতান।

আজমতুল্লাহ কোরেশী ছুটে এসে এটা দেখে শশব্যস্তে বললেন- খবরদার জাঁহাপনা, খবরদার! সন্ধি করে এমন সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। আমার ওয়াদা মাফিক লাখনৌতির এক বিশাল শক্তি কাজ করছে জাঁহাপনার পক্ষে। এখনই না হোক, দিনমান এ লড়াই চললেই জাঁহাপনার জয় একদম সুনিশ্চিত।

দিল্লীর সুলতান বললেন- আমি সেরেফ জয়ের জন্যে আসিনি কোরেশী সাহেব। আমি এসেছি লাখনৌতির সুলতানকে আমার অধীনস্থ করতে। স্বাধীনতা তার ধুলোয় মিশিয়ে দিতে।

তার স্বাধীনতা ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন কি জাঁহাপনা! যুদ্ধ চালিয়ে যান, লাখনৌতির সুলতান নিজেই ধুলোয় মিশে যাবে আর এই লাখনৌতি রাজ্যটাও জাঁহাপনার হয়ে যাবে। তাকে অধীন করার চেয়ে তার রাজ্যটাই দখল করে নেয়াটা কি বেহতর নয়?

দখল করে নেবো?

জি জাঁহাপনা! আজ দিনমান যুদ্ধ চালিয়ে গেলেই এই লাখনৌতি রাজ্য আপনার হাতে এসে যাবে।

আর যদি বিপরীতটাই ঘটে? ইতোমধ্যে আরো কোন শক্তি এসে যদি তাঁর পক্ষে যোগ দেয়?

আসবে না- আসবে না। শক্তি একটা আছে বটে, কিন্তু কায়দা করে সে শক্তিকে আমি রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষার নামে রাজধানীতেই আটকে রেখে এসেছি। সে শক্তি আর আসবে না। নারাজ হয়ে দিল্লীর সুলতান বললেন– না- না, এ ঝুঁকি আমি নিতে পারিনে। সন্ধি অতি তাড়াতাড়ি আমারও দরকার। এই গিরিপথের ঢালু ময়দানে আমি সব সময় আতংকের মধ্যে আছি। আমার শুকনো দেশের সেনাসৈন্যেরা একজনও কেউ সাঁতার জানে না। কোন বিশেষ চাপে পড়ে আমার সেনাসৈন্য যদি এখান থেকে একটু নড়ে, তাহলে তারা সবাই সরাসরি গঙ্গা নদীতে গড়িয়ে পড়বে আর ডুবে মরবে। এমন কি আমিও। এমন বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা লড়াই করছি যে, যে কোন সময় আমাদের মহাবিপর্যয় ঘটতে পারে। সুতরাং আর আমি লড়াই চালিয়ে যেতে চাইনে।

কিন্তু জাঁহাপনা! সেলিম মালিক আর ফয়েজউদ্দীন বেগ নামের ইওজ খলজির দুই দুর্জেয় শক্তি আজ ময়দানে নেই। আজ এই সুলতানকে পরাজিত করতে না পারলে, সামনা সামনি লড়ে আর কোনদিনই তা পারবেন না। তখন ঐ দুই দৈত্য অবশ্যই সুলতানের বাহিনীতে থাকবে।

তা সামনা সামনি তাকে পরাজিত করা সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবো। সুযোগ বুঝে তাকে আঘাত করবো। কিন্তু এক্ষণে আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাইনে। লোভে পড়ে নিজে খতম হতে চাইনে।

: জাঁহাপনা!

আপনি এখন যান। আমি আমার ইচ্ছামতো শর্ত আরোপ করবো। সে শর্তগুলো মেনে নিলে অবশ্যই সন্ধি করবো আমি। মরণ-ঝুঁকি নিতে আমি এখন যাবো না। আপনি আপনাদের শিবিরে ফিরে যান। আপনাকে আমি আমার পরমহিতৈষী বলে মনে করি। প্রয়োজনে অবশ্যই আপনাকে স্মরণ করবো আমি। আপনি এখানে অধিক সময় অপেক্ষা করবেন না। কেউ দেখে ফেললে আপনার জান নিয়ে টানাটানি হবে। যান- যান, শিগগির এখান থেকে চলে যান।

চলে গেলেন আজমতুল্লাহ কোরেশী। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যে দূত এসেছিল সেই দূতের মাধ্যমে সুলতান ইওজ খলজিকে সুলতান ইলতুতমিশ যে শর্ত

দিলেন, সে শর্তগুলো হলো– এক. নগদ আশি হাজার টাকা দিল্লীর সুলতানকে প্রদান করতে হবে। দুই. বাংলার তাগড়া আটত্রিশটি হাতী প্রদান করতে হবে। তিন. দিল্লীর তথা ইলতুতমিশের অধীনতা স্বীকার করতে হবে। চার. ইলতুতমিশের নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারী করতে হবে। এই শর্তের একটিও বাদ দিলে কোন সন্ধি হবে না।

নেহায়েত বেকায়দায় পড়ার দরুন সুলতান ইওজ খলজি নগদ আশি হাজার টাকা ও আটত্রিশটি হাতী প্রদান করে ইলতুতমিশের দেয়া সকল শর্ত মেনে নিলেন ও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিলেন। সুলতান ইলতুতমিশ এতে খুশি হয়ে তখনই লড়াই বন্ধ করলেন এবং মালিক আলাউদ্দীন জানীকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কিন্তু সুলতান ইলতুতমিশের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুলতান ইওজ খলজি বাহাদুর মালিক আলাউদ্দীন জানীকে বিহার থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং সন্ধির শর্তের মধ্যে অগ্রিম দেয়া ঐ নগদ আশি হাজার টাকা ও নিজ বাহিনীর হাতী ঘোড়ার মধ্যে থেকে দেয়া আটত্রিশটি হাতী ছাড়া, সন্ধির বাদ বাকি সকল শর্ত অস্বীকার করলেন।

অধীনতা অস্বীকার করে তিনি যেমন ছিলেন তেমনই রয়ে গেলেন। সুলতান ইলতুতমিশের নামে খুতবা পাঠ না করে, নিজের নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারী চালিয়ে যেতে লাগলেন।

আজমতুল্লাহ কোরেশীর পূর্ব-হুঁশিয়ারী মতে সুলতান ইলতুতমিশ বুঝতে পারলেন যে, সর্বশক্তি সঙ্গে থাকা লাখনৌতির সুলতান ইওজ খলজিকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করা সম্ভবপর হবে না। তাই তিনি এই অপমান সহ্য করে ভবিষ্যতের সুযোগের অপেক্ষায় রয়ে গেলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজিও বুঝতে পারলেন যে, সুলতান ইলতুতমিশ একেবারে খামুশ হয়ে থাকবেন না। যে কোন সময় তিনি লাখনৌতির বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করবেন। তাই রাজমহলের যুদ্ধ থেকে আসার পর তিনি রাজধানী ছেড়ে দীর্ঘদিন আর কোথাও গেলেন না। যুদ্ধের জন্যে সদাপ্রস্তুত অবস্থায় তিনি রাজধানীতে বসে রাইলেন।

বলা বাহুল্য, লড়াই থেকে সদলবলে রাজধানীতে ফিরে আসার সাথে সাথে সুলতান ইওজ খলজির ঐ বিপর্যয়ের খবর সবার মাঝে জানাজানি হয়ে গেল। বিপর্যয়ের কারণটাও সুলতানের বিশ্বস্ত লোকদের কাছে অজ্ঞাত রইলো না।

কারণটা জানার পরই সুলতানের বিশ্বস্ত লোকেরা ঐ বেঈমানদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার দাবী করলে সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন ও সুলতান বাহাদুর স্বয়ং তাদের বুঝিয়ে বললেন– ঠিক এই মুহূর্তে সেই পদক্ষেপ নিতে যাওয়া সমীচীন হবে না। পেছনে ছুরি শানাচ্ছেন দিল্লীর সুলতান। বেঈমানেরা তো সংখ্যায় দু'একজন নয়, এক পাল। এরা একসঙ্গে বিদ্রোহ করে বসলে, বিপদ হবে। দিল্লীর সুলতানের যদি ইতোমধ্যে পুনরাগমন ঘটে, তাহলে মহামসিবতে পড়ে যাবো আমরা। তাই এখনই তাড়াহুড়া না করে বেঈমান সেনাপতিদের পেছন থেকে ধীরে সুস্থে আর কায়দামতো সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে হবে; তারপর তাদের শাস্তি বিধান করতে হবে।

ওদিকে আমাদের কোন কোন উজিরের, বিশেষ করে রাজস্ব উজির কোরেশীর ভূমিকাও সন্দেহজনক। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে আর নিশ্চিত হওয়ার পরে তাকেও উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

এই সমস্ত বিবেচনায় সুলতান বাহাদুর আর কোন অঞ্চল জয় করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করলেন না। সুলতান ইলতুতমিশের গতিবিধির দিকে নজর রেখে রাজধানীতেই বসে রইলেন।

দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশ অনেক দিন পরও আর লাখনৌতি জয় করতে এলেন না দেখে সুলতান ইওজ খলজি সাহেব ভাবলেন, সুলতান ইলতুতমিশ আর আসবেন না। কারণ, তিনি (ইলতুতমিশ)– বুঝে নিয়েছেন উজির আজমতুল্লাহ কোরেশীর আর লাখনৌতির ঐ প্রধান প্রধান সেনাপতিদের গাদ্দারী লাখনৌতির সুলতান নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে ধরে ফেলেছেন আর তাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করেছেন। তারা আর দিল্লীর সুলতানের সাহায্যে আসতে পারবে না। তারা না এলে পূর্ণশক্তিওয়ালা লাখনৌতির সুলতানকে পরাজিত করা তার একার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর হবে না। এটা বুঝেই দিল্লীর সুলতান আর আসছেন না এবং আর আসবেনও না।

সুলতান ইওজ খলজি সাহেব এই চিন্তা করে একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। তার আর কোন দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা রইলো না। অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেন– সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগের শাদি আর বেশিদিন ধরে রাখবেন না। পূর্ববাংলা জয় করলেই গোটা বাংলাদেশ বিজয় তাঁর সম্পন্ন হয়। পূর্ববাংলা জয় করে এসেই তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শাদি দেবেন

এদের।

ঘোষণা শুনে আনন্দে নেচে উঠলো সেলিনা বানু বেগম। সামনে আর যুদ্ধ নেই। শুধু ঐ পূর্ববাংলা জয় করতে একটা মাত্র যুদ্ধ। এর পরই তাদের শাদি। আনন্দের আধিক্যে সেলিনা বানু তখনই ছুটে গেল ফারজানা বেগমের কাছে। ফারজানা বেগম অন্দরমহলে ছিল। কে যেন এসেছে খবর পেয়ে সে বেরিয়ে এসেই সবিস্ময়ে বললো- একি সখী, হঠাৎ তুমি!

সেলিনা বানু বললো- হ্যাঁ, হঠাৎই এলাম। তা এতক্ষণ কি করছিলে অন্দরে?

ফারজানা বেগম বললো- ঐ মানে, ফয়েজউদ্দীন বেগ সাহেবকে খাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে দিচ্ছিলাম।

শুইয়ে দিচ্ছিলে। শুইয়ে দিচ্ছিল মানে?

মানে, বিছানাটা ঠিক করে পেতে ওর গায়ে চাদরটা তুলে দিচ্ছিলাম।

: তুমি চাদরটা গায়ে তুলে দিচ্ছিলে? সে নিজে নিতে পারে না?

ফারজানা বেগম হেসে বললো- তাই কি নেবে? আমি তুলে না দিলে নিজে তুলে নেবেই না।

: বলো কি! নিজে তুলে নেবেই না?

: না। খালি গায়ে শুয়ে থেকে মৃদু মৃদু কাঁপবে, তবু নিজে তুলে নেবে না।

তাই তুমি সব সময় নিজে তুলে দাও?

দিই তো! এখন তো কোন লড়াই নেই, সব সময় বাড়িতেই আছে। তাই সব সময়ই আমাকে তুলে দিতে হয়।

: না দিলে?

গাল ফুলিয়ে থাকবে। অভিমানে কথাই বলবে না!

বাপরে! এতটাই পিরীত তোমাদের? এতটাই দাবী?

ফারজানা বেগম ফের হেসে বরলো- তা যা বুঝো!

সেলিনা বানু সুর করে বললো- 'লোকে বলে ভালবাসা- ভালবাসা সখী, ভালবাসা কারে কয়?'

এরপরে বললো- আমি বলি, 'ভালবাসা কারে কয়'- সেটা যদি কেউ না বোঝে, তাহলে সেজন্যে আফসোস করার কি আছে? এই ফারজানাদেব বাড়িতে এলেই তো বুঝতে পারে ভালবাসা কারে কয়।

ফারজানা বেগম ঐভাবেই হেসে বললো– শোধ নিচ্ছো সখী?

সেলিনা বানু বললো– শোধ?

হ্যাঁ। একদিন আমিই তোমাকে এ কথা বলেছিলাম। সেই কথাটা ফিরিয়ে দিচ্ছো আমাকে?

হ্যাঁ, তাই দিচ্ছি!

তা হঠাৎ এমন পুলক যে?

পুলকের কি দেখেছো? সে কথা শুনলে, তোমাদের এই ভালবাসা আরো জমে একেবারে কুলফি বরফ হয়ে যাবে!

কেমন- কেমন?

শাদি হচ্ছে! অতি শিগগির শাদি হচ্ছে আমাদের। তোমাদের আমাদের দুই জুটিরই।

সেকি- সেকি!

www.boighar.com

আর সেকি! খোদ সুলতান বাহাদুর ঘোষণা দিয়েছেন। শিগগিরই তিনি শাদি দেবেন আমাদের। আর দেরি নেই।

দেরি নেই?

না, সামনে ঐ পূর্ববাংলাটা জয় করা শুধু। আর কোন যুদ্ধ নেই। পূর্ববাংলার ঐ ছোট্ট একটা যুদ্ধের পরই আমাদের শাদি।

শিশুর মতো হাততালি দিতে দিতে ফারজানা বেগম বললো– কি মজা- কি মজা!

জি, মজাটা চরমই। তা ঐ চরম মজার পরে কি করবে? আর তো যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই। ফয়েজ সাহেবকে সুলতানের আর তেমন প্রয়োজনও নেই। শাদির পরে কি বেগ সাহেবের সাথে তোমাদের ঐ সিস্তানে ফিরে যাবে?

: সিস্তানে? কেন- কেন?

কেন আবার! তোমরা দীর্ঘদিন এখানে আছো, তোমাদের কথা আলাদা। কিন্তু বেগ সাহেব তো হালে আর প্রয়োজনে এখানে এসেছে। প্রয়োজন শেষ। সে কি এখন স্বদেশে ফিরে যেতে চাইবে না?

: তা চাইলেই কি আমি যাবো, না যেতে দেবো তাকে!

: তার অর্থ?

সেখানে আমাদের বাড়ি আর বেগ সাহেবের বাড়ি পৃথক পৃথক ভিটেয়। ওখানে গেলে পৃথক বাড়িতে থাকতে হবে আমাদের। তা আমি থাকবো কেন? এখানে কি সুন্দর এক পরিবার হয়ে বেগ সাহেবকে নিয়ে একবাড়িতে আছি আমরা। ওখানে পৃথক হতে যাবো কেন?

: আচ্ছা!

তোমরা বুঝি তাই যাবে? মানে, তোমাদের ঐ গরমশিরে?

গরমশিরে!

হ্যাঁ, এখন না যাও, তোমার আব্বার চাকরি শেষ হয়ে গেলে সে প্রশ্ন তো উঠতেই পারে। তাছাড়া সেলিম মালিক সাহেবই বা এখানে শুধু শুধু বসে থাকবেন কেন?

: থাকতেই হবে।

: কি রকম- কি রকম?

সখী, আমাদের অবস্থাও তোমাদের মতোই। পৃথক পৃথক ভিটেয় বাড়ি আমাদের। পৃথক হয়ে থাকতে আমিও কি ওখানে যাবো?

: আজীবন থাকবে এখানে?

আজীবন- আজীবন। এই লাখনৌতিই আমাদের নিজ মুলুক আর নিজ বাসস্থান। বংশপরম্পরায় এদেশেই থেকে যাবো আমরা। আর কোথাও যাবো না।

এই সময় ফারজানাদের নওকর মহব্বত আলী মিয়া এসে ফারজানাকে বললো– সে কি আপা! উনাকে নিয়ে এই বাইরে আর ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে গল্প করছেন! অন্দরে যান! অন্দরে গিয়ে বসুন।

হুঁশে এসে ফারজানা বেগম বললো– ও হ্যাঁ, তাই তো! এসো সখী! এই বলেই সেলিনা বানুকে টেনে নিয়ে অন্দরমহলে চলে গেল ফারজানা বেগম। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আল্লাহ করেন আর এক।

ইতোমধ্যে অযোধ্যার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠলো। অযোধ্যার হিন্দুরা প্রিথো নামক একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করলো এবং প্রথম চোটেই কয়েক হাজার মুসলমান হত্যা করলো। আর যাই হোক, দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশ একজন মুসলমান। এ সংবাদে তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীন

বইঘর ও রোকন

মাহমুদকে বিশাল সেনাবাহিনীসহ অযোধ্যায় পাঠালেন। সুলতান ইওজ খলজি কর্তৃক বিহার থেকে বিতাড়িত শাসনকর্তা মালিক আলাউদ্দীন জানীও যুবরাজের পরামর্শদাতা হিসাবে অযোধ্যায় এলেন।

সুলতান ইওজ খলজি মনে করলেন যে, অযোধ্যার ব্যতিব্যস্ত দিল্লীর বাহিনীর পক্ষে বাংলাদেশ তথা লাখনৌতি আক্রমণ করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি এই অবসরে পূর্ববাংলা জয় করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি বেঈমান সেনাপতিদের বাদ দিয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতিদের বাহিনীসহ সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগদের এবং মস্তবড় সৈন্যদল নিয়ে পূর্ববাংলা বিজয়ে যাত্রা করলেন। রাজধানী ও লাখনৌতি রাজ্যের প্রতিরক্ষায় সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজির অধীনে কয়েকজন সেনানায়ক ও অল্পকিছু সৈন্য রেখেই সুলতান পূর্ববাংলায় গমন করলেন। লাখনৌতির প্রতিরক্ষায় পর্যাপ্ত সেনাসৈন্য না রেখেই তিনি এই কাজ করলেন।

বাঘের মাথায় গোশ্‌তের ডালি। বেঈমান সেনাপতিদের অর্ধেক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে গেলেও সুলতান বাকী অর্ধেক সৈন্যসহ বেঈমান সেনাপতিদের এবং বেঈমান রাজস্ব উজির কোরেশীকে রাজধানীতে রেখে সুদূর পূর্ববাংলায় গমন করলেন।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব উজির আজমতুল্লাহ কোরেশী দিল্লীর উদ্দেশে ছুটলেন। অযোধ্যায় যুবরাজের কাছে গেলে কাজ নাও হতে পারে বিবেচনায় কোরেশী সরাসরি সুলতান ইলতুতমিশের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। তাকে দেখে সুলতান ইলতুতমিশ কিছুটা শংকিতকণ্ঠে বললেন– কি ব্যাপার কোরেশী? কোনো মসিবত?

উজির কোরেশী গদগদকণ্ঠে বললেন– মসিবত নয় জাঁহাপনা, মসিবত নয়! মওকা, মস্তবড় মওকা!

মওকা! কিসের মওকা?

লাখনৌতি অধিকার করার মওকা। এতদিন জাঁহাপনা যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, সে সুযোগ এখন হাতের মুঠোয়।

কেমন- কেমন?

লাখনৌতির সুলতান এখন লাখনৌতিতে নেই জাঁহাপনা। তিনি এখন সুদূর পূর্ববাংলায়। এখন অতি সহজেই লাখনৌতি অধিকার করা যাবে।

তাতে কি? তাঁর বিশ্বস্ত সেনাসৈন্য তো সেখানে আছে?

কেউ নেই, কেউ নেই! সুলতান তাঁর বিশ্বস্ত সেনাসৈন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

: সবাইকে?

জি জাঁহাপনা! সুলতানের প্রধানশক্তি অর্থাৎ তাঁর দুই বাঘ– সেলিম মালিক আর ফয়েজউদ্দীন বেগকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন। তাদের ঐ বিচ্ছু সৈন্যদলও তাদের সাথে গেছে।

: তাই নাকি? তাহলে আমাদের পক্ষের সেনাপতিরা?

লাখনৌতিতেই আছে জাঁহাপনা। তাদের অর্ধেক সৈন্য সুলতান ইওজ খলজি সঙ্গে নিয়ে গেলেও আর অর্ধেক সৈন্য নিয়ে তারা রাজধানীতেই আছেন।

: আচ্ছা! তা তারা কি আমাদের সাহায্য করবেন এবার?

করবেন কি জাঁহাপনা? জাঁহাপনার বাহিনীকে সাহায্য করতে নিজ নিজ সৈন্যদল নিয়ে তারা মুখিয়ে আছেন। জাঁহাপনার সৈন্যবাহিনী কখন লাখনৌতিতে আসবে, অধীর আগ্রহে তারা সেই অপেক্ষা করছেন।

: আর সুলতানের পক্ষের সেনাসৈন্য?

কেউ নেই, কেউ নেই। কয়েকটা সেনাসৈন্য নিয়ে সামরিক উজির লাখনৌতিতে বসে আছেন। এক দাবাড়েই তারা উড়ে সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে গিয়ে পড়বে!

চমৎকার, চমৎকার! তাহলে আর এতদূরে আমার কাছে এসেছেন কেন? আমার এক বিশাল বাহিনীসহ যুবরাজ নাসিরউদ্দীন মাহমুদ তো আপনার হাতের কাছে অযোধ্যায় আছেন এখন। সঙ্গে আছে মালিক আলাউদ্দীন জানীও। অযোধ্যার যুদ্ধ শেষ। তাদের আপনি সেখান থেকে ডেকে নিয়ে যাবেন?

না জাঁহাপনা, সেটা হয়তো সম্ভবপর হতো না। কারণ, যুবরাজের সাথে আমার তেমন পরিচয়ও নেই। আর ভেতরের এত কথা তিনি জানেনও না। লাখনৌতির সুলতান যে কিভাবে জাঁহাপনার কাঙ্ক্ষিত সেই সুযোগটা উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছে। এতশত যুবরাজ বুঝতেনও না, আর তাছাড়া...!

তা ছাড়া?

আমাকে হয়তো বিশ্বাসও করতেন না। ভাবতেন, আমি লাখনৌতির চর। দিল্লীর বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্যে আমি এই ফন্দি এঁটেছি।

হ্যাঁ, পুরোপুরি না হলেও সেকথা কিছুটা ঠিক আছে। যুবরাজকে এখনই আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। কি করতে হবে তা সবই এই চিঠিতে লেখা থাকবে। চিঠিটা নিয়ে গিয়ে যুবরাজকে দিলেই যা করার সঙ্গে সঙ্গে সে তা করবে। আপনাকে কিছু বলতেই হবে না।

দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ তখনই একটা লম্বা চিটি লিখে আজমতুল্লাহ কোরেশীকে দিলেন। কোরেশী সেই চিঠি নিয়ে গিয়ে যুবরাজ নাসিরউদ্দীন মাহমুদের হাতে অর্পণ করলেন। পত্র পাঠমাত্রই যুবরাজ তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে মার মার কাট কাট করে এসে লাখনৌতি আক্রমণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাখনৌতির সেই বেঈমান সেনাপতিরা সসৈন্য এসে যোগ দিলেন দিল্লী বাহিনীর সাথে। এবার আর সেরেফ তলোয়ার ঘুরানো নয়। বেঈমান সেনাপতি ও তাঁদের সৈন্যদল সরাসরি তলোয়ার খুললেন লাখনৌতিতে অবস্থিত লাখনৌতির বিশ্বস্ত মুষ্টিমেয় সেনাসৈন্যের বিরুদ্ধে।

খবর গেল সুলতান ইওজ খলজির কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্ববাংলা বিজয় ত্যাগ করে সমুদয় সেনাসৈন্য নিয়ে ছুটে এলন লাখনৌতি রাজ্য রক্ষা করতে। কিন্তু লাখনৌতির কাছাকাছি এসেই দেখলেন, সব শেষ। লাখনৌতি দিল্লীর দখলে চলে গেছে। লাখনৌতির এক প্রান্তে বিজয় নিশান উড়িয়ে দিয়ে দিল্লীর বাহিনী রাজধানী দখল করতে ছুটছে। বেঈমান সেনাসৈন্যগণ ছাড়াও, লাখনৌতির প্রায় সকলেই উদীয়মান সূর্যের উপাসনায় দিল্লীর পক্ষ অবলম্বন করে উদাত্তকণ্ঠে দিল্লীর জয়ধ্বনি দিচ্ছে আর উল্লাসে মাতামাতি করছে।

সুলতান ইওজ খলজি তবু লাখনৌতির আরো কিছুটা কাছাকাছি আসতেই লাখনৌতির এক বিশ্বস্ত সেনানায়ক ছুটে এসে বললেন– খবরদার জাঁহাপনা! আর এগুবেন না। পালান, এইভাবেই পালান! লাখনৌতির পক্ষের সকলেই শহীদ হয়ে গেছেন। আমি কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এই খবর জাঁহাপনাকে জানানোর জন্যেই আমি পালানোর আগে এইদিকে এসেছি।

সুলতান ইওজ খলজি সাহেব উদ্‌ভ্রান্তকণ্ঠে বললেন– আর আমার রাজধানী? আমার পরিবারবর্গ?

আগন্তুক সেনানায়ক বললেন– রাজধানী আর জাঁহাপনার পরিবারবর্গ নিশ্চয়ই এতক্ষণে শত্রুর কবলে পড়েছে আর পরিবারবর্গের হয়তো সবাই শেষ হয়ে গেছেন। পালান জাঁহাপনা! সবাই আপনারা এখান থেকেই পালিয়ে যান। লাখনৌতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই এখন দিল্লীর পক্ষে।

–বলতে বলতে দ্রুত পালিয়ে গেলেন ঐ বিশ্বস্ত সেনানায়ক। সুলতান ইওজ খলজি সাহেব উন্মাদের মতো বললেন– কি গজব- কি গজব! এখন কি করবো? কি করবো সেলিম মালিক?

সেলিম মালিক বললো– আর কিছু করার নেই জাঁহাপনা। সমস্ত সেনাসৈন্য নিয়ে আপনি এখন এখান থেকেই দেবকোট চলে যান। দেবকোটে গিয়ে ওখানে অপেক্ষা করতে থাকুন। আমি আর ফয়েজউদ্দীন বেগ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি...!

জাঁহাপনা বললেন– শেষ চেষ্টা মানে?

সেলিম মালিক বললো– সবাইকে উদ্ধার করে আনার চেষ্টা। আমাদের বাহিনী নিয়ে আমরা উল্কার বেগে রাজধানীতে গিয়ে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে আমাদের পরিবারবর্গ আর ধন-সম্পদ যা কিছু পারি উদ্ধার করে আনি। ইনশাআল্লাহ! উল্লাসমগ্ন দুশমনদের ঠেকিয়ে আমরা তা পারবোই। আপনি সেনাসৈন্য সহকারে সিধা দেবকোটে চলে যান। আমরাও এসে ওখানে আপনাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। ওখানে এসেই পরবর্তী পদক্ষেপের কথা চিন্তা করবো আমরা। যান জাঁহাপনা, এক্ষুণি চলে যান। সময় নষ্ট করার আর সুযোগ নেই আমাদের। আমরা চললাম...!

সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগ তাদের চৌকস বাহিনীটা সঙ্গে নিয়ে রাজধানী অভিমুখে ছুটলো। দিল্লীর সেনাসৈন্য সেখানে সবেমাত্র প্রবেশ করেছে আর তাচ্ছিল্যের সাথে রাজধানী দখল করার চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তে অতর্কিতে গিয়ে তাদের উপর চড়াও হলো সেলিম মালিকেরা। প্রথম ধাক্কাতেই দিল্লীর বাহিনীকে একপাশে ঠেলে দিয়ে সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগ নিজ নিজ পরিবারবর্গকে উদ্ধার করে নিয়ে ধন-সম্পদ হাতের কাছে যা কিছু পেলো সেগুলো সহকারে তারা বেরিয়ে এলো শত্রুর বেষ্টনী থেকে। উভয়ের পরিবারবর্গের সকলেই তখনও অক্ষত ছিলেন। চাকর-নফরদের মধ্যে শুধু সেলিনা বানুর জাফর মিয়া আর ফারজানাদের মহব্বত আলী মিয়া সাগ্রহে এঁদের সাথে এলো। বাদবাকীরা সকলেই স্ব-ইচ্ছায় দিল্লীর অধীনে থাকার জন্যে সেখানে রয়ে গেল।

অতঃপর তারা দ্রুত দেবকোটে এলেন আর দেবকোটে এসেই মাথায় হাত দিলেন। সেখানে সুলতান বা তাঁর সেনাসৈন্য কেউ নেই। সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজি ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– কই, সুলতান বাহাদুর আর তাঁর

সেনাসৈন্য নাকি এই দেবকোটে এসে অপেক্ষা করার কথা? তাঁরা কই?

হতবুদ্ধি সেলিম মালিক বললো– কি সর্বনাশ! কথা তো তাই-ই। কিন্তু বাহিনী নিয়ে সুলতান বাহাদুর গেলেন কোথায়?

খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। দেবকোট সদরের আশপাশের সর্বত্র খোঁজ করে দেখে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন সবাই। দেখলেন, সুলতান বাহাদুর তো নেই-ই, তাঁর সেনাসৈন্যেরও কেউই দেবকোটের কোথাও নেই।

হতাশ হয়ে সকলে ভাবতেই ছুটে এলো লাখনৌতির এক বিশ্বস্ত দূত। এসেই সে ব্যস্তকণ্ঠে বললো– এই যে, আপনারা এসে পৌঁছেছেন এখানে? পালিয়ে যান, শিগগির শিগগির সরে পড়ুন এখান থেকে। সরে নিরুদ্দেশ হয়ে যান!

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– নিরুদ্দেশ হয়ে যাবো মানে? জাঁহাপনা কোথায়?

তিনি আর ইহ-দুনিয়ায় নেই। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন।

বিকট শব্দে আর্তনাদ করে উঠলেন উপস্থিত সকলেই। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– শহীদ হয়ে গেছেন, তার অর্থ?

অর্থ, দিল্লীর বাহিনীর হাতে তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে থাকা সেনাসৈন্য প্রায় সকলেই শহীদ হয়ে গেছেন।

সেলিম মালিক বললো– কি করে, কি করে? সেনাসৈন্য নিয়ে জাঁহাপনার তো এই দেবকোটে এসে থাকার কথা?

তা তিনি আসেননি। আপনারা রাজধানীর দিকে ছুটে যাওয়ার পর পরই সুলতান বাহাদুর তাঁর বাহিনী নিয়ে দিল্লীর বাহিনী আক্রমণ করেন আর তাদের সাথে যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি মস্তবড় ভুল করেন। তিনি যতগুলো সেনাসৈন্য নিয়ে গিয়ে দিল্লীর বাহিনীকে আক্রমণ করেন, দিল্লীর সেনাসৈন্য ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। এর উপর ছিল লাখনৌতির বেঈমান সেনাপতি সকলেই আর তাদের প্রত্যেকের মস্ত মস্ত সৈন্যদল। এর সাথে আরো ছিল দিল্লীর পক্ষ অবলম্বন করা লাখনৌতির সুবিধাবাদী অসংখ্য নাগরিক।

সেকি- সেকি!

তাদের সকলের চতুর্মুখী আক্রমণে আমাদের সুলতান আর তাঁর সেনাসৈন্য অল্পক্ষণেই খতম হয়ে গেছেন। এদিক ওদিক পালিয়ে দুই চার জনের অধিক

সেনাসৈন্যও কেউ প্রাণ বাঁচাতে পারেননি।

হায়- হায়! কি বিপর্যয়, কি বিপর্যয়!

আমি এই বাংলার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি। আপনারাও তাই যান। এখনই দিল্লীর বিশাল বাহিনী মার মার রবে এই দেবকোট দখল করতে আসবে। এছাড়া দেবকোটের জনগণ কেউ এখনও আসল ঘটনা জানে না। এ দেশের প্রায় সকলেই যে দিল্লীর পক্ষে গেছে এখনও তা জানে না। জানামাত্র এরাও দিল্লীর পক্ষ অবলম্বন করবে আর এরাই আপনাদের ধরিয়ে দেবে।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব করুণকণ্ঠে বললেন– হায় আল্লাহ! কি মসিবত- কি মসিবত!

মহামসিবতের মধ্যে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন মুরব্বী। এখনই না পালালে যত বড় দুর্ধর্ষই হোক সেলিম মালিক সাহেব, ফয়েজউদ্দীন বেগ সাহেব আর তাঁদের ছোট্ট সৈন্যবাহিনী, কেউই এই মসিবত থেকে আপনাদের কাউকেই বাঁচাতে পারবে না। আমার কর্তব্য শেষ। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সহায় হোন!

–বলেই সে দ্রুতবেগে ছুটতে লাগলো। দূত অদৃশ্য হতে না হতেই উদ্ভ্রান্তভাবে ছুটে এলেন সুলতানের বাহিনীর দুই বিশ্বস্ত সেনাপতি। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তারা দাঁড়াতেই সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন সাহেব আকুলকণ্ঠে বললেন– এ কি! মোয়াজ্জেম আলী আর মুহাম্মদ শাহ! সুলতান বাহাদুরের দুই অতি প্রিয় আর অতি বিশ্বস্ত সালার! আপনারা বেঁচে আছেন?

সালার মোয়াজ্জেম আলী বিষণ্নকণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ, আছি। সবাইকে খুইয়ে জাঁহাপনার শিরোচ্ছেদ চোখের উপর দেখে, আমরা প্রাণে বেঁচে আছি হুজুর! জাঁহাপনার হত্যাকারী বেঈমানদের উপর তলোয়ারের একটা ঘা মারার মওকাটাও আমরা পেলাম না।

সেলিম মালিক এবার ব্যস্তকণ্ঠে বললো– কি ঘটনা জনাব? কি খবর? সুলতান বাহাদুর আর সৈন্যদলসহ আপনাদের তো এই দেবকোটে এসেই থাকার কথা! আপনারা দুশমনদের হাতে পড়লেন কি করে?

সালার মোয়াজ্জেম আলী বললেন– সুলতান বাহাদুর এলেন না ভাই সাহেব! আপনারা চলে যাওয়ার পরে পরেই তিনি গিয়ে দিল্লীর বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হলেন।

; তা দিলেন কেন জনাব? আপনারা তাঁর প্রিয় সালার। আপনারা তাঁর একান্ত নিকটেই ছিলেন। আপনারা কেন সুলতান বাহাদুরকে এ কাজ করতে দিলেন?

পারলাম না! বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও সুলতান বাহাদুরকে আমরা থামাতে পারলাম না। তিনি জিদ ধরে তলোয়ার হাতে ঐ দিকে ছুটলেন।

বলেন কি?

কি বলবো ভাই সাহেব! আমরা অধিক পীড়াপীড়ি করায় সুলতান বাহাদুর চিৎকার করে বলে উঠলেন– পালাও! ভীরু কাপুরুষের দল! প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও তোমরা! আমার কাউকে দরকার নেই! আমি একাই দিল্লীর বাহিনীর এই ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ নেবো। শয়তানদের এত বড় দুঃসাহস! আমি জীবিত থাকতে তারা আবার এসে হানা দেয় আমার রাজ্যে!

তারপর?

তারপর আর কি! কি মরণ-নেশায় পেলো সুলতান বাহাদুরকে, কে জানে! তলোয়ার খুলে তিনি একাই ছুটলেন ঐ শত্রুবাহিনীর দিকে। আমরা আর তখন করি কি! সুলতান বাহাদুরকে তো আমরা এভাবে একা যেতে দিতে পারিনে। তাই পরাজয় নিশ্চিত জেনেও সালার-সৈন্য সবাই আমরা সুলতানের সঙ্গ নিলাম আর লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলাম।

তাজ্জব! তারপর কি ঘটলো?

যা ঘটার তাই ঘটলো। লড়াইয়ে নেমে আমরা অর্থাৎ সুলতান বাহিনীর সালার-সৈন্য সবাই, অসংখ্য আর অগণিত দুশমনের সমুদ্রে হারিয়ে গেলাম। চতুর্দিকে লাখে লাখে অগণিত দুশমন আর আমরা সুলতানের এই সীমিত সেনাসৈন্য। লড়াই নিমেষ কয়েক চলতে না চলতেই আমাদের সঙ্গীরা প্রায় সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন।

আর সুলতান ? সুলতান বাহাদুর?

সুলতান বাহাদুর দিল্লীর বাহিনীর হাতে বন্দী হলেন। বন্দি করে তারা সুলতান বাহাদুরকে শিবিরে নিয়ে যেতে লাগলেন। আমাদের একদম চোখের উপর ঘটনা। এই সময় ছুটে এলো লাখনৌতির ঐ পুরাতন বেঈমানেরা। বেঈমান সেনাপতিরা। ছুটে এসেই তারা ঘিরে ধরলো সুলতানকে। আর ঐ বন্দী অবস্থাতেই তলোয়ারের ঘায়ে সুলতানের ধড় থেকে নামিয়ে দিলো তাঁর মাথা।

এ কথায় উপস্থিত সকলেই আর্তনাদ করে উঠলেন। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– আর আপনারা? আপনারা করলেন কি?

আমরা তখনও দুশমনদের বেষ্টনীর মধ্যে আটকা। প্রাণপণ চেষ্টা করলাম ঐ বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসতে আর ঐ বেঈমানদের উপর প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, দুশমনদের বেষ্টনি ভেদ করতে সক্ষম হলাম যখন, তখন সব শেষ। লাখনৌতির ঐ বেঈমান সেনাপতিরাই বাঁচতে দিলো না সুলতানকে। সুলতানকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর বাহিনীর তাড়া খেয়ে তৎক্ষণাৎ দুশমনদের ঐ মহাসমুদ্রে হারিয়ে গেল তারা। অল্প কিছু সেনাসৈন্যসহ আমি এবং এই মুহাম্মদ শাহ ভাই সাহেব আর খুঁজে পেলাম না তাদের।

কি বদনসীব! কি বদনসীব! তা দিল্লীর বাহিনী কেন তাড়া করলো আমাদের ঐ বেঈমান সেনাপতিদের?

দিল্লীর বাহিনী চায়নি সুলতান ঐভাবে নিহত হোন। তারা আমাদের সুলতানকে বন্দি করে দিল্লীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সুলতান ইলতুতমিশের কাছে। তাদের সেই ইরাদা পণ্ড করে দিলো দেখে ঐ হত্যাকারীদের তাড়া করলো তারা।

ইশ! মস্তবড় ভুল হয়ে গেছে! পূর্ববাংলায় যাওয়ার আগে সুলতান যদি এদের শিরোচ্ছেদ করে রেখে যেতেন তাহলে আজ তারা এ সুযোগ পেতো না।

এবার কথা বললেন সালার মুহাম্মদ শাহ সাহেব। তিনি বললেন– না মুরব্বী! এতটা ঝামেলায় যেতে হতো না সুলতানকে। সেরেফ যদি ঐ বেঈমান রাজস্ব উজির কোরেশীর শিরোচ্ছেদ করে যেতেন, তাহলে আর কিছুই করতে হতো না। সকল দিক রক্ষা পেতো ঐ একজনকে সাজা দিলেই।

: কি রকম– কি রকম?

সকল অঘটনের মূল ঐ বেঈমান কোরেশী। ইতোমধ্যেই গোয়েন্দা মারফত আমরা জেনেছি, সব কিছু ঘটেছে ঐ কোরেশীর চক্রান্তে। ঐ শয়তান শয়তানী না করলে আজ কিছুই ঘটতো না।

এবার সকলেই এক সাথে প্রশ্ন করলেন– সব কিছু কোরেশীর চক্রান্তেই ঘটেছে?

সালার মুহাম্মদ শাহ বললেন– সব কিছু, সব কিছু। সব কিছু তার চক্রান্তেই

ঘটেছে। আমরা পূর্ববাংলায় যাত্রা করার সাথে সাথে ঐ বেঈমান দিল্লীতে ছুটে যায় আর সুলতান ইলতুতমিশকে জানায়– তাঁর লাখনৌতি দখল করার মহাসুযোগ উপস্থিত। জানায়, সুলতান ইওজ খলজি সেলিম মালিক আর ফয়েজউদ্দীন বেগসহ লাখনৌতি উজাড় করে তাঁর বিশ্বস্ত সমুদয় সেনাসৈন্য নিয়ে পূর্ববাংলা অধিকার করতে গেছেন। রাজধানী ও লাখনৌতি রাজ্য রক্ষার্থে পর্যাপ্ত সেনাসৈন্য কিছুই রেখে যাননি। সামান্য কয়েকজন সেনানায়ক আর গুটিকয়েক সৈন্য নিয়ে সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজি দেশের নিরাপত্তা বিধানে বসে আছেন। যা এক ফুৎকারেই উড়ে যাবে।

আচ্ছা! তারপর?

সুলতান ইলতুতমিশকে ঐ বেঈমান আরো জানিয়েছে যে, দিল্লীর সুলতানের শুভাকাঙ্ক্ষী লাখনৌতির প্রধান প্রধান সেনাপতিরা তাদের সৈন্যদল নিয়ে দিল্লীর বাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে আছেন। দিল্লীর বাহিনী লাখনৌতিতে পৌঁছার সাথে সাথে তাঁরা সসৈন্যে এসে দিল্লীর বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন আর লাখনৌতি রাজ্য তুলে দেবেন দিল্লীর সুলতানের হাতে।

বটে- বটে!

এক কথায়, মাঠ একদম ফাঁকা। এখন হানা দিলে লাখনৌতি রাজ্য অনেকটা বিনা বাধাতেই চলে আসবে ইলতুতমিশের হাতে।

: কি সাংঘাতিক! কি জঘন্য চক্রান্ত!

দিল্লীর বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ইলতুতমিশের পুত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদ অযোধ্যায় উপস্থিত ছিল এই সময়। কোরেশীর মুখে এসব কথা শুনে তবেই তিনি যুবরাজ নাসিরউদ্দীন মাহমুদকে নির্দেশ দেন লাখনৌতি আক্রমণ করার। কোরেশী গিয়ে এসব কথা না জানালে, সুলতান ইলতুতমিশ লাখনৌতি জয় করার কোন চিন্তা কস্মিনকালেও করতেন না, সে সাহসও করতেন না। অযোধ্যা থেকেই সসৈন্য দিল্লীতে ফিরে যেতেন যুবরাজ নাসিরউদ্দীন মাহমুদ। সুলতান ইওজ খলজি বাহাদুরকে প্রাণ দিতেও হতো না আর লাখনৌতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বও বিলুপ্ত হতো না। যেমন পরম সুখে কালাতিপাত করছিল লাখনৌতির জনগণ, আজ ঐ রকম সুখে-শান্তিতেই দিন কাটাতো তারা।

হায়- হায়! ঐ শয়তান কোরেশীর জন্যে কি মহাবিপর্যই না হয়ে গেল

আমাদের!

: জি জনাব! যে ক্ষতি হয়ে গেল এখন আর তা পূরণ হবার নয়।

এখন তাহলে কি করবেন আপনারা?

কি আর করবো মুরব্বী। আপাতত প্রাণ নিয়ে এখন স্বগৃহে ফিরে যাবো আর পরবর্তী চিন্তা-ভাবনা গৃহে ফিরেই করবো।

আপনারা শুধু এই দু'জনই প্রাণ বাঁচাতে পেরেছেন? লাখনৌতির সৈন্যরা কেউ বাঁচেনি?

বেঁচেছে জনাব! আমাদের বাহিনীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন বেঁচেছে। তাদের শুভ কামনা করে লড়াই থেকে বেরিয়েই তাদের বিদায় করে দিয়েছি। তারাও সবাই এখন দ্রুতপদে পথ ধরেছে স্বগৃহের।

আচ্ছা!

আমরাও যাই জনাব। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুশমন বাহিনী এখানে চলে আসবে। আপনারাও এখানে আর অপেক্ষা করবেন না। যে দিকে হোক, পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান আপনারাও।

তা যাবো। কিন্তু আপনাদের সাথে কি রাহা খরচ কিছু আছে, না আমরা কিছু দেবো!

জি-না জনাব, কিছুই দিতে হবে না। পূর্ববাংলায় যাওয়ার সময় হাত খরচ যা পেয়েছিলাম, তা আমাদের সাথেই আছে। ওতেই চলে যাবে। কিন্তু আপনারা অনর্থক দেরী করবেন না! শিগগির বেরিয়ে পড়ুন। আমরা চললাম, আল্লাহ হাফেজ...!

সালার মোয়াজ্জেম আলী আর সালার মুহাম্মদ শাহ সাহেব দ্রুতপদে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগের চৌকস ঐ সৈন্যগণ অদূরে দল ধরে বসেছিল। এবার তারা কাছে উঠে এলো এবং তাদের একজন বললো– আমাদেরও এবার বিদায় দিন হুজুর। আমরাও এবার যাই!

এ প্রশ্নে বিচলিত হয়ে উঠলো সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগ। সেলিম মালিক ধরা গলায় বললো– যাবে?

জি হুজুর! আর থেকে কি করবে? যা শুনলাম তাতে আপনাদেরও আর এখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। আপনারাও আর এদেশে থেকে করবেন

কি? সরাসরি আপনার স্ব-মুলুক আফগানিস্তানে ফিরে যান হুজুর! সেটাই সর্বাধিক নিরাপদ হবে আপনাদের জন্যে। বিশেষ করে, আপনাদের দু'জনের উপর তো দুশমনদের আক্রোশ আকাশ ছোঁয়া!

তা বটে- তা বটে। আর তোমরা? তোমরা কোথায় যাবে?

আমাদের সকলের বাড়িই এদেশে হুজুর! এই বাংলায় আর ভারতে। আমরা আপাতত নিজ নিজ গৃহে গিয়ে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবো। এরপর আবার আমরা যখন তখন একত্রিত হতে পারবো। দেখা-সাক্ষাৎও আমাদের মাঝে মাঝেই হবে।

আচ্ছা!

কিন্তু আপনাদের সাথে এ জীবনে আর দেখা হবে না আমাদের। এই বিদায়ই আমাদের চিরবিদায় হুজুর!

–বলেই বক্তা সৈন্যটি দুই চোখ মুছলো। তা দেখে এবার এক সাথে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগ। এমন কাঁদা এ জীবনে এরা দু'জন আর কখনো কাঁদেনি। কিছুক্ষণ এরা দু'জন আর কথাই বলতে পারলো না। পরে এরা দু'জন অর্থাৎ সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগ এক সাথে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ধরাগলায় বললো– তোমরা আমাদের মাফ করে দিও ভাইসব! কত তোমাদের বকেছি, কত দুর্ব্যবহার করেছি তোমাদের সঙ্গে! আজ এই চির-ছাড়াছাড়ির মুহূর্তে তোমরা আমাদের ক্ষমা করে দিও। নইলে আমরা চির গুনাহগার থেকে যাবো।

এ কথায় কয়েকজন সৈনিক একসাথে বললো– দুর্ব্যবহারের কথা কি বলছেন হুজুর! আপনাদের কাছে আপন ভাইয়ের মতো যে স্নেহ আর দরদ আমরা পেয়েছি, আজীবন তা আমরা কেউ ভুলতে পারবো না। ফিরে গিয়েও আমরা অনেকে হয়তো এত দরদ আর এত স্নেহ আর কারো কাছে পাবো না।

চোখ মুছে ফয়েজউদ্দীন বেন বললো– ভাইসব!

চোখ মুছে সেলিম মালিক বললো– গিয়ে তোমরা কি করবে ভাইসব! বাহিনীতে থেকে এমন কিছু মাহিনা তো পাওনি তোমরা! তোমাদের পরবর্তী জীবন চলবে কিভাবে?

জবাবে পূর্ববর্তী বক্তাটি বললো– সে ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালাই করবেন হুজুর। ও নিয়ে ভাবতে হবে না আমাদের।

বইঘর ও রোকন

সেলিম মালিক বললো– সংখ্যায় তোমরা দুই চারজন হলে কিছু নগদ অর্থ আমরা দিতে পারতাম তোমাদের। কিন্তু তোমরা তো দুই চারজন নও, কয়েকশ'। তোমাদের সবাইকে হাত ভরে, অর্থ দেয়ার সামর্থ তো আমাদের নেই।

দিতে হবে না হুজুর! কিছুই দিতে হবে না আমাদের। আপনাদের কাছে সামরিক বিদ্যার যে তালিম আমরা পেয়েছি, আমাদের প্রত্যেকের কাছে তা লক্ষ টাকার সমান। অর্থের অভাব আমাদের হবে না হুজুর।

কেমন?

www.boighar.com

আপনাদের এই অমূল্য তালিম পরবর্তীতে আমরা কাজে লাগাবো হুজুর! সুযোগ সুবিধে মতো আমরা একত্রিত হয়ে যে কোন রাজা-বাদশাহর বাহিনীতে নকরী নিলে অনেক অর্থ পাবো আমরা।

: নকরী নিয়ে অনেক অর্থ পাবে!

তাই পাবো হুজুর! এখানে আমরা অর্থের বিনিময়ে কাজ করিনি। করেছি এই লাখনৌতিকে ভালবেসে আর লাখনৌতির মহানুভব সুলতান ইওজ খলজি বাহাদুরকে ভালবাসে। এরপর আমরা যেখানেই নকরী নিই না কেন, কোন ভালবাসার খাতিরে আমরা নকরী করবো না। করবো অর্থের বিনিময়ে। মারা গেলে মোটা অর্থ প্রদানের চুক্তির ভিত্তিতে। আমাদের অর্থের অভাব থাকবে কেন হুজুর!

সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগ আবার ধরা গলায় বললো– ভাইসব!

সৈনিকেরাও ধরা গলায় আওয়াজ দিলো– হুজুর! আমাদের প্রিয় হুজুর!

কম্পিতকণ্ঠে প্রথম বক্তাটি বললো– আমরা এখন যাই হুজুর! আর এখানে দেরি করা কারোই উচিত হচ্ছে না আমাদের। আপনাদের এ জীবনে কখনোই ভুলতে পারবো না আমরা। চলি হুজুর! আল্লাহ হাফেজ!

চোখ মুছতে মুছতে সৈনিকেরা বিদায় হয়ে গেল। তাদের গমন পথের দিকে চেয়ে দু'হাতে চোখ মুছতে লাগলো সেলিম মালিক, ফয়েজউদ্দীন বেগ এবং তাদের পরিবারের সকলেই। নিমেষ কয়েক সংবিতহীনের মতো সেখানেই সকলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হারিয়ে ফেললেন হুঁশ বুদ্ধি।

৯

হুঁশ ফিরতেই চমকে উঠলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব। তিনি শশব্যস্তে বললেন– এই, তোমরা সব করছো কি? শিগগির জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। এখান থেকে সরে পড়তে হবে চলো–

হুঁশ ফিরলো সকলের। সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– হ্যাঁ- হ্যাঁ, চলো- চলো! অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখানে আর অধিক বিলম্ব করা মোটেই সমীচীন হবে না।

সেলিম মালিক বললো– সমীচীন কি বলছেন জনাব? এখানে দেরি করা আত্মঘাতীরই সমান হবে। যা খবর তাতে শত্রুবাহিনী যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে হাজির হবে। আমাদের এই গড়িমসি মহাবিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চলুন, চলুন সবাই...!

ক্ষিপ্রহস্তে সামানাদি গুছিয়ে নিয়ে দেবকোট থেকে বেরিয়ে পড়লেন সকলে। বলাবাহুল্য, সামানাদি বহন করার বেলায় বিশেষ কাজে লাগলো দুই নওকর জাফর মিয়া ও মহব্বত আলী মিয়া। দেবকোট থেকে অল্প কিছু দূরে এসেই সকলে চমকে উঠে শুনলেন বিরাট কোলাহল। বুঝতে পারলেন, শত্রুবাহিনী দেবকোটে পৌঁছে গেছে। উচ্চকণ্ঠে উল্লাস করছে তারা আর মুহুর্মুহু দিল্লীর সুলতানের জয়ধ্বনি দিচেছ।

ছুটতে লাগলেন সকলে। প্রাণপণে ছুটে দেবকোট ছেড়ে সদর রাস্তায় নেমে এলেন। অতঃপর কখনো টাংগা যোগে কখনো পদব্রজে এবং কখনো অন্যান্য যানবাহনের মাধ্যমে পথ চলতে লাগলেন তাঁরা। দিল্লীকে দূরে রেখে ভারতবর্ষের একদম উত্তর প্রান্ত দিয়ে তাঁরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন। রাত্রি নেমে এলে নিকটবর্তী পান্থশালায় রাত্রি যাপন করতে লাগলেন আর দিনের বেলায় পথ চলতে লাগলেন।

এমনই এক পান্থশালায় মনের আবেগ বেরিয়ে এলো সেলিনা বানু ও

 বইঘর ও রোকন

ফারজানা বেগমের কণ্ঠ থেকে। প্রত্যেক পান্থশালাতেই একাধিক কামরা ভাড়া নেয়া হতো। পৃথক এক কামরায় একসাথে রাত্রি যাপন করতো সেলিনা বানু আর ফারজানা বেগম। অন্যান্য কামরায় রাত্রি যাপন করতেন দলের পুরুষ সদস্যগণ। রাত্রিকালে এক বিছানায় শুয়ে থেকে সেলিনা বানু ও ফারজানা বেগম কেবলই উটুস পুটুস করতে লাগলো। ঘুম আসছে না কারো চোখেই। আগে কথা বললো ফারজানা বেগম। বললো– কি হলো সেলিনা আপা? এমন এপাশ ওপাশ করছো কেন? ঘুম আসছে না চোখে বুঝি?

সেলিনা বানু উদাসকণ্ঠে বললো– না!

ফারজানা বেগম বললো– না কেন সখী?

উঠে বসলো সেলিনা বানু। উঠে বসে বললো– কেন, তা বুঝতে পারছো না?

উঠে বসলো ফারজানাও। বললো– না সখী।

সেলিনা বানু কিছুটা সুরেলা কণ্ঠে বললো– 'লোকে বলে ভালবাসা ভালবাসা, সখী ভালবাসা কারে কয়!'

ফারজানা বেগম সবিস্ময়ে বললো– সেকি! এই অবস্থায় তোমার মুখে ভালবাসার গান!

ভালবাসার গান নয় সখী, নসীবের গান। 'লোকে বলে বদনসীব বদনসীব, সখী বদনসীবটা কারে কয়।'

আপা!

একেই বুঝি বদনসীব বলে ফারজানা! এমন নসীবই বুঝি সত্যিকারের বদনসীব।

সেলিনা!

কি ভাবলাম আর কি হলো রে ফারজানা! কোথায় মহোৎসবে মেতে উঠবে লাখনৌতি, সুলতান বাহাদুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শাদি দেবেন আমাদের, আর কোথায় আজ প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে লাখনৌতি ছেড়ে আমাদের এই পালানো।

তা বটে!

কিছুদিন আগেও যে শাদি নিয়ে এত উল্লাস করলাম আমরা, আজ সে শাদির সম্ভাবনা একদম শূন্যের কোঠায়।

শূন্যের কোঠায়!

: বলা যায়, সে সম্ভাবনা আর নেই-ই।

নেই-ই?

: না, নেই-ই।

কেন?

কেন তা বুঝতে পারছো না?

: না।

: না?

কি করে পারবো? সুলতান বাহাদুর নেই, তাই ধুমধাম করে হবে না ঠিকই। কিন্তু এঁরা তো আছেন। সেলিম মালিক সাহেব আর ফয়েজউদ্দীন বেগ, এঁরা দু'জন তো আছেন। শাদি হবে না কেন? আড়ম্বরে না হোক, অনাড়ম্বরে হবে।

সেলিনা বানু ব্যাঙ্গ করে বললো– ওরে আমার সুখবাসিনীরে! আগে প্রাণে বাঁচো, পরে শাদির কথা ভেবো!

ফারজানা বেগম প্রত্যয়ের সাথে বললো– কেন, প্রাণে বাঁচবো না কেন? দুশমন বাহিনী তো এখানে নেই!

: কিন্তু বিপদ মসিবত তো আছে।

: মানে?

: কি অবস্থায় আছি এখন আমরা, সেটা খেয়াল করছো না? সুদূর পথের যাত্রী আমরা। সামনে কমছে কম আরো পাঁচশ' ক্রোশ দুর্গম পথ। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা আর খানাখন্দক ডিঙ্গিয়ে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে আমাদের। এই অতিক্রম করারকালে কোন পাহাড় থেকে পড়ে আর কোন নদীতে ডুবে প্রাণ দিতে হবে আমাদের, তার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে?

ফারজানা বেগম এবার শংকিতকণ্ঠে বললো– সেলিনা!

সেলিনা বেগম বললো– আর শুধুই কি তাই? এর উপর আবার বিভিন্ন স্থানে দলে দলে আছে ডাকাত-দস্যু রাহাজনরা। কোন দুর্গম স্থানে যদি তাদের কবলে পড়ি আমরা, তাহলে আমরা এই আট নয় জন লোক একজনও বাঁচবো না। সবাই খতম হয়ে যাবো। বর্বর ঐ দস্যু ডাকাতের দল অর্থকড়ি আর মালমাত্তা লুটে নেয়ার জন্যে আমাদের সবাইকে খতম করে দেবে।

: ওরে বাপরে!

শাদির স্বপন তখন তেপান্তরে লাশ হয়ে পড়ে থেকে দেখতে হবে তোমাকে।

: মরেছিরে!

তা ছাড়া, সেলিম মালিক সাহেব আর ফয়েজউদ্দীন বেগ সাহেবের মনের অবস্থা কি এখন, একবার সেটা ভেবে দেখো তো! কি করে তাঁরা নিজে বাঁচবেন আর আমাদের বাঁচাবেন– সেই চিন্তায় তাঁরা এখন মূহ্যমান। শাদির চিন্তা কি একবিন্দুও মনে আছে তাঁদের? বলো, আছে?

: নারে ভাই! এটা ঠিক। একবিন্দুও সে কথা মনে তাঁদের নেই এখন।

এ ছাড়াও ভেবে দেখো, ওঁরা আমরা, এই দুই জোড়ার একজনও যদি কোন না কোনভাবে প্রাণ হারাই, বাকি জোড়ার শাদিটা কতখানি আনন্দমুখর হবে তখন!

আনন্দ আসবে কোত্থেকে? বিষাদে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

সেই কথাই ভাবছি ফারজানা! কি ভাবলাম আর কি অবস্থার মধ্যে এসে পড়লাম। এই সেদিনও ভাবলাম, মহাধুমধামে শাদি হবে আমাদের, সপ্তাহকাল গোটা লাখনৌতি উৎসবের স্রোতে ভাসবে। সেলিম মালিক ফয়েজউদ্দীন বেগ কাউকেই আমরা লাখনৌতি থেকে ফিরতে দেবো না তাঁদের স্বদেশে। লাখনৌতিই হবে আমাদের সকলের স্বদেশ। আমাদের বাসস্থান। কবরস্থানও হবে এই লাখনৌতিই। বংশ-পরম্পরায় আপনদেশ হিসাবে এই লাখনৌতিকেই আঁকড়ে ধরে থাকবো আমরা।

ফারজানার দুই চোখ অশ্রুতে ভরে এলো। বললো– সেলিনা আপা!

সেলিনা বানুর চোখেও পানি। বললো– অথচ দেখো, দুটো মাসও গেল না। ভেল্কিবাজির মতো পরিবর্তন হয়ে গেল সবকিছু। অপর দেশ হয়ে গেল নিজ দেশ লাখনৌতি। একদল দাসদাসী আর প্রতিবেশীবৃন্দ আপন লোক থেকে অপর লোক হয়ে গেল এক পলকেই।

: আর বলো না, আর বলো না ভাই! আমি আর সইতে পারছিনে!

সইতে পারা কি যায়! প্রাণে বেঁচে যদিও আমরা সিস্তানে আর গরমশিরে ফিরে যাই, তুমি হয়তো দু'চারজন পরিচিত লোক পেতে পারো, কিন্তু আমি গরমশিরে একজনও পরিচিত লোক পাবো না। একদম বিদেশ বিভুঁই।

সেলিনা আপা, থামো!

সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠলো সেলিনা বানু। তার কণ্ঠ থেকে কান্নার আওয়াজ উচ্চ হয়ে বেরিয়ে এলো।

পাশের কামরাতেই ছিলেন ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব। তিনি এসে জানান দিয়ে কড়া নাড়লেন সেলিনা বানুদের দরজায়।

চোখ মুছে সেলিনা বানু উঠে এসে দরজা খুলে দিলে তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– কি ব্যাপার? কি হলো তোমাদের? তোমরা এত কান্নাকাটি করছো কেন?

ফারজানা বেগম বললো– কান্নাকাটি! কৈ, নাতো!

খলজি সাহেব বললেন– না তো মানে? আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

: তাহলে ভুল শুনেছেন আপনি।

এই, চেপে যাচ্ছো কেন? কিসের এত আফসোস?

তা- মানে–

ফারজানা বেগম ইতস্তত করতে লাগলো। সেলিনা বানু বলেলো– আফসোস মানে! সুলতান বাহাদুর দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের শাদি দেবেন, সেটা আর আমাদের নসীবে হলো না, এই আর কি!

খলজি সাহেব বললেন– বটে!

ফারজানা বেগম বললো– সেলিনা আপা বলছে, আমাদের নাকি আর শাদিই হবে না। সে সুযোগ আর নেই।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– নেই মানে? সুলতান বাহাদুর নেই বলে কি আমরা কেউ নেই? বিশেষ ধুমধামে না হলেও তোমাদের শাদিটা কি আমরা দিতে পারবো না?

সেলিনা বানু বললো– দাদু!

দাদু বললেন– আমরাই শাদি দেবো তোমাদের। এখনও অসুবিধার মধ্যে আছি বলেই বেগানা অবস্থায় তোমাদের সাথে নিয়ে পথ চলছি। একটু সুবিধাজনক জায়গায় পৌছলেই আর বেগানা রাখবো না তোমাদের। একটা বড়সড় পান্থশালায় উঠে তোমাদের শাদি দিয়ে দেবো।

তাই তাঁরা করলেন। অতি কষ্টে দীর্ঘ আর দুর্গম পথ পেরিয়ে একদিন সবাই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অর্থাৎ নিরাপদ স্থানে এসে পৌছলেন।

সেখানে একটা প্রশস্ত পান্থশালার অর্থাৎ সরাইয়ের বড় বড় কয়েকটা কামরা ভাড়া নিয়ে কয়েক দিনের জন্যে সবাই এসে উঠলেন সেই কামরাগুলোয়। বিশেষ ধুমধামে না হলেও কিছুটা আনযাম আয়োজন করেই সানন্দে শাদি দিলেন সেলিনা বানু ও ফারজানা বেগমের। বলা বাহুল্য, বর যথাক্রমে তাদের ভালাবাসার সেলিম মালিক ও ফয়েজউদ্দীন বেগ। সেখানে কয়েক দিন কাটিয়ে সবাই তাঁরা সীমান্তের পার্বত্য পথ পার হয়ে একদিন আফগানিস্তানে এসে উপস্থিত হলেন।

এরপরেই সৃষ্টি হলো আর এক করুণ দৃশ্য। আফগানিস্তানে এসে হিসাব-রক্ষক হাফিজ আহম্মদ সাহেব নাতনী নাতজামাই ও চাকর মহব্বত আলী মিয়াকে নিয়ে তাঁর পুরাতন আবাস সিস্তানের দিকে আর ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব তাঁর পরিবারবর্গ ও নওকর জাফর মিয়াকে নিয়ে তাঁর পুরাতন আবাস গরমশিরের দিকে রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ছাড়াছাড়ির আগে হাফিজ আহম্মদ সাহেব উজির শাহাবুদ্দীন খলজি সাহেবকে প্রশ্ন করলেন– তা দেশে গিয়ে এবার কি করবেন বাপজান? কোথাও কি আবার সৈন্য বিভাগে নকরী করার ইচ্ছা ইরাদা আছে কিছু?

তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সামরিক উজির শাহাবুদ্দীন সাহেব বললেন- জি-না জনাব, জি-না! সৈন্য বিভাগে আর নয়। আর শুধু সৈন্য বিভাগ কেন, কোন বিভাগেই নকরী করার কোন আগ্রহ আর আমাদের নেই। পরিবারের সবার সাথেই আমাদের মতবিনিময় হয়ে গেছে। অতঃপর আমরা তেজারতিতে অর্থাৎ ব্যবসায় মনোনিবেশ করবো।

: শাব্বাশ- শাব্বাশ!

: আর আপনারা?

আমরাও আমরাও। ফয়েজউদ্দীন বেগের সাথে আমারও কথা হয়ে গেছে। বাড়িতে গিয়ে আমরাও এবার তেজারতী শুরু করবো। কোন নকরীতে আর যাবো না।

সেই ভাল সেই ভাল। আমাদের সকলের কাছেই তো অঢেল না হলেও, বেশ ভাল পয়সা-কড়ি আছে। তা দিয়ে কর্মচারী রেখে আরামেই ব্যবসা করে খেতে পারবো আমরা। ঠিক নয় কি?

ঠিক ঠিক। একেবারেই আমাদের মনের কথাই বলেছেন। হাতে যখন অর্থকড়ি ভালই আছে, তখন আর পরাধীন হতে যাবো কেন? স্বাধীন জীবন

 বইঘর ও রোকন

যাপন করবো অতঃপর। ব্যবসা খুলে স্বাধীনভাবে আয়-উপার্জন করবো।

এর পরে কথা উঠলো ছাড়াছাড়ির। আর সে কথা উঠতেই ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন- এই তাহলে শেষ দেখা আমাদের। এ জীবনে আমাদের বোধ হয় আর দেখা হবে না!

ফয়েজউদ্দীন বেগ বললো- দেখা হবে না কেন দাদু? ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা তো গরমশিরের দিকে মাঝে মাঝেই যাবো। আমরা ওখানে গেলেই আপনাদের সবার সাথে দেখা করে আসবো আমরা।

সেলিম মালিক বললো- আমরাও, আমরাও। ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে সিস্তানে গেলেই আমরাও উনাদের সকলের সাথে দেখা করে আসবো। দেখা হবে না কেন? ঘন ঘন হবে না, এটা ঠিক। কিন্তু মাঝে মাঝে তো হবেই। আমার দাদু আর ফারজানার দাদু কিছুটা বৃদ্ধ হলেও এমন বৃদ্ধ তাঁরা কেউ নন যে, ব্যবসায় কেউ তাঁরা যোগ দিতে পারবেন না বা ব্যবসার কাজে তাঁরা পরিবারের অন্যান্যদের সাথে সিস্তান বা গরমশির যাতায়াত করতে পারবেন না! এই দীর্ঘ আর দুর্গম পথ অতিক্রম করেই তাঁরা সে প্রমাণ দিয়েছেন।

উভয়ের পরিবারের পুরুষ সদস্যবৃন্দ এক বাক্যে বললেন- ঠিক, ঠিক! এই দেখাই শেষ দেখা নয়। আল্লাহ চাহে তো দেখা আমাদের হবেই মাঝে মাঝে।

www.boighar.com

এবার সেলিম মালিক বললো- আর দেরি করে লাভ কি? এবার বিদায় নেই আমরা!

এ কথায় সেলিনা বানু ফারজানা বেগমের কাছে এসে ভারী গলায় বললো- কিছু বুঝতে পারলে ফারজানা?

ফারজানা বেগম বললো- কি সেলিনা আপা?

সেলিনা বানু বেগম বললো- মাঝে মাঝে আমার পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যের সাথেই দেখা হবে তোমার আর তোমার পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যের সাথেই দেখা হবে আমার। যারা যখন যেদিকে ব্যবসার কাজে যাবেন, তারাই তখন তোমার আমার পরিবারের সকলের সাথে দেখা করে আসবেন। সবাইকে দেখতে পাবে তুমিও, আর সবাইকে দেখতে পাবো আমিও। শুধু...

গলা ধরে আসায় সেলিনা বানু একটু থামলো। ফারজানা বেগম বললো- শুধু কি রে আপা?

সেলিনা বানু বললো– শুধু আমি দেখতে পাবো না তোমাকে আর তুমি দেখতে পাবে না আমাকে।

হুঁশে এসে ফারজানা বেগম কম্পিতকণ্ঠে বললো– সেলিনা আপা!

তোমার সাথে আমার আর আমার সাথে তোমার এ জীবনে আর কখনো দেখা হবে না ফারজানা! এই দেখাই শেষ দেখা তোমার আমার আর এই বিদায়ই শেষ বিদায় তোমার কাছ থেকে আমার আর আমার কাছ থেকে তোমার।

এবার ডুকরে কেঁদে উঠে ফারজানা বেগম জড়িয়ে ধরলো সেলিনা বানুকে। কেঁদে ফেললো সেলিনা বানুও। কাঁদতে কাঁদতে বললো– সবাইকে ফেলে কবরে যাওয়ার মতোই তোমাকে ফেলে আমার আর আমাকে ফেলে তোমার এই যাওয়া কবরে যাওয়ারই শামিল হয়ে গেল রে ফারজানা!

আরো জোরে কাঁদতে লাগলো দু'জন। সেলিম মালিক থামাতে গেল এদের। ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বাধা দিয়ে বললেন– কাঁদতে দাও, কাঁদতে দাও। এই দেখাই তো শেষ দেখা ওদের দু'জনের। কেঁদে ওদের বুকটা পাতলা করতে দাও।

তাঁদের কথায় কান না দিয়ে ফারজানা বেগম বললো– তোমাকে কেমন করে ভুলে থাকবো সেলিনা? কেমন করে ভুলে থাকবো আমাদের অতীত স্মৃতি? লাখনৌতির রাজধানীতে তোমাদের বাসায় আমার যাতায়াতের আর আমাদের বাসায় তোমার যাতায়াতের সেই স্মৃতি কেমন করে ভুলে থাকবো আমি?

ভোলা খুবই কঠিন ফারজানা। দীর্ঘদিনের সেই স্মৃতি কি সহজে ভুলতে পারবো আমরা কেউ? সেখানকার সেই পথঘাট– সেই পরিচিত লোকজন কি সহজেই মুছে যাবে আমাদের মন থেকে?

সেলিনা! সেলিনা আপারে!

দুঃখ করে আর কি হবে ফারজানা। বরং তোমার সাথে আমি এযাবত যে দুর্ব্যবহার করেছি, বকাবকি করেছি আর কটু কথা বলেছি, সে সবের জন্যে তুমি আমাকে মাফ করে দাও ফারজানা! মন থেকে মাফ করে দাও। পরে তো আর মাফ চাওয়ার কোন সুযোগ পাবো না।

আমিও সেলিনা, আমিও তোমাকে কত উপহাস করেছি, কত ঠেশ দিয়ে কথাবার্তা বলেছি– সেজন্যে তুমিও আমাকে মাফ করে দাও।

: ফারজানা!

অবশ্য মাফ দেয়া-নেয়ার বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, সেগুলো কোন দুঃখের ব্যাপার ছিল না সেলিনা। আমাদের সে সম্পর্কটা ছিল মধুর সম্পর্ক। বরাবরই আমাদের উভয়ের কাছে সে সম্পর্কটা ছিল আনন্দের। আমাদের ঐ আনন্দঘন সম্পর্কের স্মৃতিটাও এখন যথেষ্ট পীড়া দেবে আমাদের।

আর কথা না বলে পারলো না সেলিম মালিক। বললো– আর এত দুঃখ করে কি করবে তোমরা? ছাড়াছাড়ি তো হতেই হবে আমাদের। একদিন তো সবাই আমরা সবাইকে ছেড়ে এই দুনিয়া থেকে চলে যাবো। সেই কথা মনে করে বিদায় নিয়ে চলে এসো শিগগির। আমাদের এখনও অনেক দূরে যেতে হবে।

ইয়ারউদ্দীন খলজি সাহেব বললেন– হ্যাঁ- হ্যাঁ, গরমশির এখনও অনেক দূরে। অনেক পথ এখনও পাড়ি দিতে হবে আমাদের। এসো- এসো, চলে এসো...!

অগত্যা একে অপরকে ছাড়তে হলো তাদের। বিদায় নিয়ে সেলিনা বানু বললো– জোর তাকিদ এসেছে ফারজানা! যাই- আল্লাহ হাফেজ!

জবাবে ফারজানা বেগম বললো– আল্লাহ হাফেজ সেলিনা আপা! আল্লাহ হাফেজ!

চোখ মুছতে মুছতে উভয়ে উভয়ের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে এসে নিজ দলের সাথে সামিল হলো। অতঃপর উভয় দলই উভয় দলকে আল্লাহ হাফেজ জানিয়ে চোখ মুছতে মুছতে নিজ নিজ গন্তব্য পথে রওনা হলো।

আলহামদুলিল্লাহ!

www.boighar.com

বইঘর ও রোকন

শফীউদ্দীন সরদার রচিত গ্রন্থসমূহ

❖ ঐতিহাসিক উপন্যাস
- রূপনগরের বন্দী
- বখতিয়ারের তলোয়ার
- গৌড় থেকে সোনারগাঁ
- যায় বেলা অবেলায়
- বিদ্রোহী জাতক
- বার পাইকার দুর্গ
- রাজ বিহঙ্গ
- শেষ প্রহরী
- বারো ভূঁইয়া উপাখ্যান
- প্রেম ও পূর্ণিমা
- বিপন্ন প্রহর
- সূর্যাস্ত
- পথহারা পাখি
- বৈরী বসতি
- অন্তরে প্রান্তরে
- দাবানল
- ঠিকানা
- ঝড়মুখী ঘর
- অবৈধ অরণ্য
- দখল
- রোহিনী নদীর তীরে
- ঈমানদার
- শাহজাদী
- লাওয়ারিশ

❖ কবিতা
- সার্বজনীন কাব্য

❖ কল্পকাহিনী
- সুলতানের দেহরক্ষী

❖ ভ্রমণ কাহিনী
- সুদূর মক্কা মদীনার পথে

❖ সামাজিক উপন্যাস
- রাজনন্দিনী
- অপূর্ব অপেরা
- শীত বসন্তের গীত
- চলন বিলের পদাবলী
- পাষাণী
- দুপুরের পর
- রাজ্য ও রাজকন্যারা
- থার্ড পণ্ডিত
- মুসাফির
- গুনাহগার

❖ রম্য রচনা
- রাম ছাগলের আব্বাজান
- চার চান্দের কেচ্ছা
- অমরত্বের সন্ধানে [রকমারি রচনা]

❖ শিশু সাহিত্য
- ভূতের মেয়ে লীলাবতী
- পরীরাজ্যের রাজকন্যা
- রাজার মেয়ে কবিরাজ

❖ নাটক
- গাজী মণ্ডলের দল
- সূর্যগ্রহণ
- বন মানুষের বাসা
- রূপনগরের বন্দী
- কাকড়া কেত্তন

❖ কাব্য নাট্য
- দীপ দুর্নিবার
- রাজপুত্র

www.boighar.com
www.boighar.com
www.boighar.com